আদর্শ ফলকর

শ্রীঅমরনাথ রায়

ফেলো অফ দি রয়েল হর্টিকালচারল সোসাইটী, মেম্বর রয়েল
এগ্রিকালচারল সোসাইটী, মেম্বর ন্যাশনাল রোজ সোসাইটী,
(লণ্ডন), বণ্ডেড মেম্বর ফ্লোরিষ্ট টেলিগ্রাফ ডেলিভারী
এসোসিয়েসন (ইউ, এস, এ), ফার্ম্মার ও
কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক, গ্লোব
নার্শরীর স্বত্বাধিকারী ও বহু
কৃষিগ্রন্থ প্রণেতা।

[তিন টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীসন্তোষকুমার রায়
ঘোষ মার্শরী
২৫নং রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা—৪

১ম সংস্করণ—১৩৪২ সাল—১২০০
২য় সংস্করণ—১৩৪৬ সাল—১২০০
৩য় সংস্করণ—১৩৪৯ সাল—১২০০
৪র্থ সংস্করণ—১৩৫২ সাল—২৫০০
৫ম সংস্করণ—১৩৬০ সাল—২৫০০

প্রিণ্টার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পরম পূজ্যপাদ

স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (রায় বাহাদুর)

(ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে)

গুরুদেব।

আমার কঠোর কর্ম্মজীবনের মাঝপথে যখন পথভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে হতাশ হ'য়ে পড়েছিলুম তখন আপনার অভয়বাণীই আমাকে পথের সন্ধান বলে দিয়েছে। আপনার আশীর্ব্বাণী না পেলে হয়ত আজ ঠিক এইভাবে দাঁড়াতে পারতুম না। আমার প্রতি আপনার অসীম করুণা ও স্নেহের কথা কিছুতেই ভুলতে পারব না। তাই আমার **আদর্শ ফলকর** নামক পুস্তকখানি ভক্তি অর্ঘ্য স্বরূপ আপনার পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম।

প্রণতঃ

অমর

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

বাংলার গভর্ণর পত্নী মাননীয়া মিসেস্ কেসি; মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ মোয়াজ্জামউদ্দিন হোসেন, এম্, এল, সি; কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এম, কার্ব্বেরী; এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর মিঃ ডব্লিউ ক্লার্ক; পোল্ট্রীতত্ত্ববিদ ডাঃ সিকা এবং আরও অনেক কৃষিতত্ত্ববিদগণ আমাদের গৌরীপুরস্থিত উদ্যান পরিদর্শন করিয়া এবং ফার্মের নার্শরী বিভাগ ও কলম কাটার পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

আমার একান্ত অনুগত ও প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ রায় (কুতুর) গ্লোব নার্শরীর উদ্যানে আমার সহিত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে আমাদের নার্শরী বিভাগকে বিশেষ উন্নতির দিকে পরিচালিত করায় আমার আজীবনের উদ্দেশ্যগুলি সফলতার দিকে অগ্রসর হওয়ায় আমি জগদীশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল ও কর্ম্মশক্তিকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করি। সে ক্রমশঃ ইহার ভার নিজের আয়ত্তে আনিয়া সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য আমি তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছি এবং নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ এইরূপে অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্য্য করায় তাহারই তত্ত্বাবধানে বনগাঁয় প্রায় চারি হাজার বিঘা জমিতে নার্শরী বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

বিনীত—গ্রন্থকার

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

সহৃদয় গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছি যে এই সংস্করণে তাঁহাদের অনেকের নিকট হইতে প্রাপ্ত নানা রকম প্রশ্নের উত্তর যথাযথ-ভাবে দেওয়া আছে। ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকপাঠে গ্রাহকবর্গের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। কারণ অনেকে জানাইয়াছেন যে আদর্শ ফলকর পুস্তকখানি বর্ত্তমানে খুবই ফলপ্রসূ হইয়াছে।

বিনীত

গ্রন্থকার

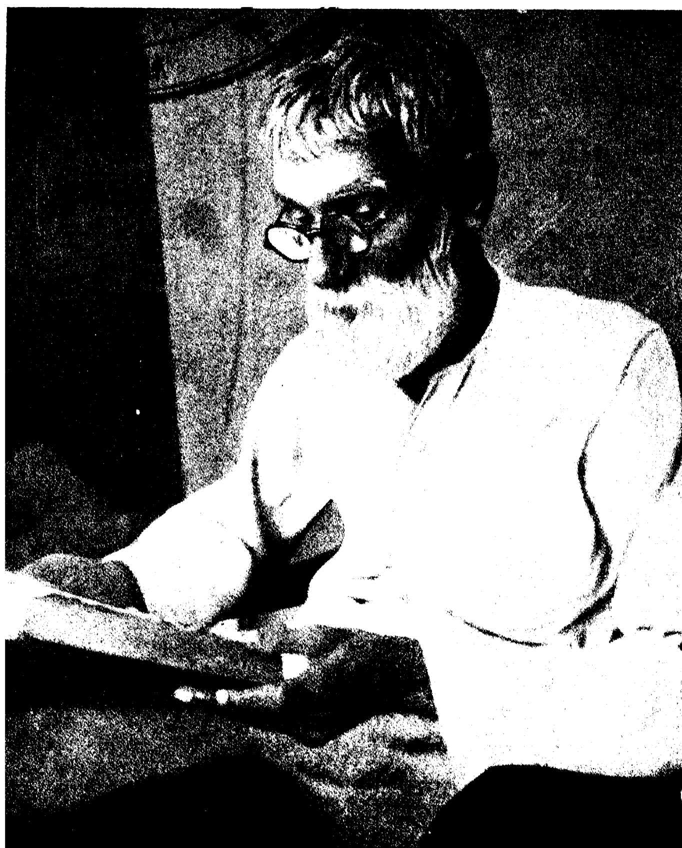
ভূমিকা

সুফলা বাংলাদেশে ফলের অভাব ছিল না; পল্লীগ্রামের সকলেই প্রায় বার মাস কোন না কোন রকমের ফল খাইতে পাইতেন; ফল খাওয়ার উপকারিতাও অনেকে বুঝিতেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাগানে বাগানে ঘুরিয়া "ফল কুড়ানো" (চুরি করা আর বলিব না) একটি প্রধান আনন্দের বিষয় ছিল; এই কথা লিখিবার সময় আমার নিজের ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িতেছে এবং তখন ফল কুড়াইতে (বা চুরি করিতে) যে আনন্দ পাইতাম তাহা এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে করিয়া গভীর আনন্দ পাইতেছি।

"সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম।
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি, আম কুড়াবার ধূম ॥"

বাড়ীর মহিলারাও বাগানে যাইয়া নিজেদের হাতে ফল কুড়াইয়া বা পাড়িয়া আনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। সাধারণ ফল উৎপাদন সম্বন্ধে ছেলে বুড়ো, এমন কি মেয়েদেরও সাধারণ রকমের অভিজ্ঞতা ছিল। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, বোঁচ, জামরুল, গোলাপজাম ইত্যাদি ফলের গাছ কি রকম, কোন্ সময়ে পাকে এ সব সম্বন্ধে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরও জ্ঞান ছিল; কিন্তু এখন বই মুখস্থ করিয়া আমাদের ছেলেদের এই সকল বিষয় শিখিতে হয়।

আজ আমাদের দেশে ফলের অভাব ঘটিয়াছে, এখন আমাদিগকে ফল উৎপাদন সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে হইবে। ফল খাওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধেও আমাদের দেশের লোককে



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সচেতন করিয়া দিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে "One apple a day keeps your doctors away"

বিলাতের "ফ্রুটারের" (ফল-উৎপাদক) দোকানের আপেল, পীচ, গুজবেরী, রাসবেরী, চেরী ষ্ট্রবেরী ইত্যাদির পরিমাণ দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়; এ ছাড়া শুকনো ফল যেমন বাদাম, কিস্‌মিস, পেস্তা, প্রূণ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়; তিন চাকার গাড়ী করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলার কাঁদি সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের ছেলেরা যেন চাকরীর উমেদারী করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; অনেকবার বলিয়াছি যে, কোনও জাত কেবল চাকরী করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা কেবল বলিয়া থাকেন "জমি জায়গা নাই, মূলধন নাই। চাকরী ছাড়া আর কি করিব?" সেদিন একটী শিক্ষিত কর্ম্মী যুবক আমার ঘরে ঢুকিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া 'বেঙ্গল কেমিক্যালে' তাহাকে একটি চাকরি দিবার জন্য কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। চাকরী ছাড়া যেন তাহার জীবনের মুক্তি বা অন্য কোনও পথ নাই। কিন্তু লুথার বারবাঙ্ক, চার্লস সিক্রক প্রভৃতি মণীষীদিগের জীবন হইতে আমাদের দেশের যুবকদের কি কিছুই শিখিবার নাই?

মার্কিনদেশে লুথার বারবাঙ্ক একজন গরীব গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষা বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। মূলধনের কোন বালাই ছিল না, সর্ব্বোপরি তিনি

স্বাস্থ্যহীন ছিলেন। তিনি নিজেকে কখনও একটা মস্ত বড় পণ্ডিত ভাবিতেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাকে প্রথম-জীবনে অতি কঠোরভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল—লাঙ্গল প্রস্তুতের কারখানায়। আসবাব পত্রের দোকান ইত্যাদিতে অতি অল্প বেতনের (দৈনিক দুই শিলিং হারে) চাকরী করিয়া কোনও মতে তিনি বাঁচিয়াছিলেন। এই সকল কাজে তাঁহার মন মোটেই বসিত না। তিনি এই চাকরী ছাড়িয়া দেন এবং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বন্ধুহীন অবস্থায় 'কালিফোর্ণিয়া' যাত্রা করেন।

তাঁহার কোনই কর্মদক্ষতা ছিল না এবং কোনও প্রকারের ব্যবসা বুদ্ধিও ছিল না। তিনি কেবল কৃষি-ক্ষেত্রের একজন শ্রমিক মাত্র ছিলেন। প্রথমে তিনি কাহারও নিকট হইতে কোনও কাজ বা সাহায্য পান নাই, কেননা কেহই তাঁহাকে কোনও রকমের কাজের উপযুক্ত মনে করেন নাই। এই সময়ে তিনি মুরগীর ঘর (Chicken houses) পরিষ্কার করিয়া যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তদ্দারা কোন রকমে নিজেকে অনশন হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তিনি একটি নার্শরীতে সাহায্যকারী (helper) হিসাবে গৃহীত হন, কিন্তু তাঁহার বেতন এতই অল্প ছিল যে তিনি গরম ঘরে (hot house) রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইতেন; এইরূপ অবস্থায় থাকিবার ফলে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন এবং একটি দরিদ্রা দয়াবতী মহিলার করুণার জন্য তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই মহিলাটি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যেক দিন তাঁহাকে

এক পাইণ্ট করিয়া দুগ্ধ খাইতে দিতেন। এই অসুখ হইতে আরোগ্য হইবার পরই তিনি অপেক্ষাকৃত ভাল একটী চাকরী পান। এই চাকরীতে তিনি যাহা মাহিনা পাইতেন তাহার অধিকাংশ বাঁচাইয়া তাহার দ্বারা একটী "নার্শরী" ক্রয় করেন। এখন তাঁহার জীবনের প্রথম সুযোগ আসিল। একটী ধনী ফল উৎপাদক ঘোষণা করেন যে দশ মাসের মধ্যে যিনি তাঁহাকে ২০ হাজার প্রূণ (কুল জাতীয়) গাছের চারা সরবরাহ করিতে পারিবেন তাঁহাকে একটা মোটা টাকা দেওয়া হইবে; সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অভিজ্ঞ নার্শরীর পরিচালকগণ একবাক্যে বলিলেন—"ইহা অসম্ভব"; কেহই এই কাজে অগ্রসর হইলেন না, কিন্তু বারবাঙ্ক এই সুযোগ আঁকড়াইয়া ধরিলেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই তিনি ১৯০২৫ চারা সরবরাহ করিয়া প্রতিশ্রুত টাকা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কোন নার্শরী পরিচালক এত অধিক পরিমাণ চারা সরবরাহ করিতে পারে নাই। এখন হইতে তিনি কালিফোর্ণিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ নার্শরী পরিচালক বলিয়া গণ্য হইলেন।

বারবাঙ্ক চিরকালই ভগ্নস্বাস্থ্য ছিলেন; একবার চিকিৎসকেরা তাঁহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার আর আঠারো মাস মাত্র পরমায়ু আছে, তিনি ইহা শুনিয়া কেবলমাত্র একটু হাসিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ৩ সপ্তাহের জন্য পাহাড়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যান। এই দরিদ্র, ভগ্নস্বাস্থ্য শিক্ষাহীন বারবাঙ্কই পরে গাছের "যাদুকর" (Plant Wizard)

আখ্যা পাইয়াছিলেন; তিনি ৪০ বৎসরের বেশী দৈনিক ১০ ঘণ্টা হইতে ১৪ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এই জন্যই "যাদুকর" হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি দৈব অদৃষ্টকে বিশ্বাস করিতেন না, তিনি বলিতেন কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই তাঁহার কৃতকার্য্যের গুপ্ত কারণ। আমাদের শাস্ত্রে আছে "উদ্‌যোগীনাং হি পুরুষোসিংহ" কিন্তু সে কথা শোনে কে? তাঁহাকে বাগানের "এডিসন" বলা হইত, মাটি এবং মাটি হইতে উৎপন্ন জিনিষ সম্বন্ধে তিনিই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। কৃশকায় তুষারশুভ্র কেশ ও করুণা বিগলিত নয়নযুক্ত লোকটিকে দেখিলেই শ্রদ্ধায় সকলের মাথা অবনত হইয়া যাইত। তিনি সঙ্কর জাতীয় যত অধিক রকমের ফল ও ফুলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহার সমসাময়িক আর কোনও বৈজ্ঞানিক তত সৃষ্টি করিতে পারেন নাই; সেইজন্য তাঁহাকে বাগানের রাজা (King of Gardener) বলা হইত। তিনি এক গাছ সম্বন্ধে ৬ হাজার রকমের গবেষণা এবং প্রত্যেক বৎসর গবেষণার জন্য এক কোটী চারা গাছ উৎপাদন করিতেন যদিও তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা কিছুই ছিল না তথাপি তিনি লেলাণ্ড ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা ও উৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিতেন। ১২ খণ্ডে তিনি তাঁহার প্রণালী ও আবিষ্কার সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর এক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নার্শরীর কাজে চিরজীবন এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে ৬৭ বৎসরের আগে বিবাহের কথা ভাবিতেই পারেন নাই। বাস্তবিক বারবাঙ্ক গাছ পাইলেই

তন্ময় হইয়া যাইতেন—তিনি একটী ছোট আগাছা কিম্বা সাধারণ কোন গাছ পাইলেই উহাকে উন্নত করিতে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যাইতেন। তিনি গাছের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক গুপ্তরহস্যের সমাধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন গাছ ঠিক মানুষেরই মত—কোন কোন গাছকে শিক্ষা দেওয়া যায়, কোন কোন গাছকে শিক্ষা দেওয়া যায় না তারা এতই একগুঁয়ে।

বারবাঙ্ক কেবল কৃষিকাজ করিতেন না, শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার নিজের মত ছিল; তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের (Kiddies) বই পড়াইবার ও কোন বিষয়ে মুখস্থ করিয়া পড়িতে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বলিতেন ১০ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ছেলে—মেয়েকে বই পড়াইয়া জ্বালাতন করা উচিত নয়। ১০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নার্শরীতে, বাগানে, মাঠে ও খেলার মাঠে শিক্ষা দেওয়াই দরকার। তিনি আরও বলিতেন ছোট ছেলে ঠিক চারা গাছের মত; তাহাকে গরম ঘর সদৃশ বিদ্যালয়ের (Hot house) ভিতরে রাখিয়া তাহার মানসিক প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক সময়ের পূর্ব্বে বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নায়।

বারবাঙ্ক মোটেই ভ্রমণশীল ছিলেন না, দেশে বিদেশে বেড়াইতে যাইবার তাঁহার সময় ছিল না, কিন্তু পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্যাণ্টারোসে (Santa Rosa) আসিতেন। তাঁহারা স্যাণ্টা-রোসকে একটী তীর্থস্থান মনে করিতেন।

সর্ব্বোচ্চ কৃতকার্য্যতার জীবন তাঁহার ছিল। তিনি দারিদ্র্য ও ব্যাধির কবলে জীবন আরম্ভ করিয়া ধন, যশ, সম্মান ও জাতীয় হিতসাধনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে কেবলমাত্র একটী দরিদ্রা মহিলা ছাড়া আর কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকারের সাহায্যে তিনি পান নাই। এই দরিদ্রা মহিলাটী ঈশ্বরের নাম করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন।

চার্লস সিক্রুকের জীবনীও ঠিক বারবাঙ্কের জীবনীর মত রোমাঞ্চকর। ইংলণ্ডে কোন একটী ছোট কৃষি-ক্ষেত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কৃষিকার্য্যে তাঁহার পিতা বিশেষ কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে চার্লি তাঁহার পিতার কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৪ বৎসর বয়সের সময় তিনি একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের মত পরিশ্রম করিতে পারিতেন। তিনি খুব গুরুতর পরিশ্রম করিতেন। কখন সেইজন্য তিনি ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করেন নাই। তিনি পরিশ্রম করিতেন—কেননা তিনি মনে করিতেন তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে। তিনি নানাবিধ পুস্তক ও মাসিকপত্রের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার মধ্যে হইলে তিনি কৃষি সম্বন্ধে নূতন নূতন প্রকাশিত প্রত্যেক বইখানি কিনিতেন। তিনি কেবল পড়িয়া যাইতেন না গভীর ভাবে চিন্তা করিতেন; ইহাই তাঁহার কৃতকার্য্যতার আরম্ভ। ২০ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, কৃষি-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে তিনটি

জিনিষের দরকার :—(১) কৃষি-ক্ষেত্রে অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন, (২) কৃষি-ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগ করা আবশ্যক ও (৩) বৎসরে কেবলমাত্র একটী ফসল যথেষ্ট নহে। তিনি এমন ভাবে জলসেচনের ব্যবস্থা করিলেন যাহার দ্বারা বৃষ্টির অভাব দূর হইয়া গেল—বলিতে গেলে তিনি তাঁহার প্রয়োজন মত কৃত্রিম (artificial) বৃষ্টি সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া তিনি যে গাছে পূর্ব্বে একটী ডাঁটা (Stem) পাইতেন সেই গাছ হইতে দশটী ডাঁটা উৎপন্ন করিতে পারিলেন।

পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চার্লি সিক্রুক তাঁহার বাপের জন্য তাঁহার বাপেরই উপদেশ মত কাজ করিতেন কিন্তু ইহার পর চার্লির বাবা চার্লির জন্য চার্লিরই পরামর্শ মত কাজ করিতে লাগিলেন—১৯১১ সালে চার্লি ও চার্লির বাবার ৫ হাজার পাউণ্ড লাভ হইল। চার্লির বাবা বলিলেন "এই টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা রাখা যাক্ কিন্তু চার্লি বলিলেন—"না আমরা এই টাকাটা মাটিতেই আবার ফিরাইয়া রাখিব, মাটিই আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ক।" তাহাই হইল। অর্থাৎ মাটির উন্নতির জন্যই এই টাকাটা তাঁহারা খরচ করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া অন্যান্য কৃষি-ক্ষেত্রের পরিচালকগণ তাঁহাদিগকে উন্মাদ ভাবিলেন। চার্লি বই পড়িয়া ইহাই শিখিয়াছিলেন যে প্রথমে মাটি হইতে এক শিলিং উপার্জ্জন কর, পরে ঐ এক শিলিং জমিতে নিক্ষেপ করিয়া আরও অনেক শিলিং জমি হইতে ফিরাইয়া আন।

মাটিতে সার প্রয়োগের মূল্য যে কত বেশী তাহা তিনি

বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি ইহাই আবিষ্কার করিলেন যে প্রকৃতি মাটি অর্দ্ধেক ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বাকীটা মানুষকে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিতেন সাধারণ মাটি "মাটিই" নয়। মোটরের ৪ খানা চাকা ও গিয়ার-বক্স হইলেই যেমন মোটর গাড়ী হয় না, তেমনি সাধারণ মাটিকে তৈয়ারী করিয়া না নিলে মাটিই হয় না—সাধারণ মাটিতে কেবল গাছ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে মাত্র।

চার্লি যখন এইরূপভাবে সারের ও জলসেচনের জন্য অসম্ভব অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন তখন তিনি সকল কৃষি-ক্ষেত্রের পরিচালকগণের "বিদ্রূপের পাত্র" হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন "বই পড়া বিদ্যার জন্যই চার্লি এইরূপ পাগলের মত অকাতরে খরচ করিতেন।" কিন্তু কিছুদিন পরে সকলে যখন দেখিতেন যে চার্লি এক একর (তিন বিঘা) জমি হইতে ৪০০ পাউণ্ড পাইলেন তখন তাঁহাদের হাসি, ঠাট্টা ও মসকরা ত চলিয়া গেল—তাহাদের চমক লাগিয়া গেল।

চার্লি সিক্রকের এক বৎসরের বিক্রয়ের তালিকা ঃ—

লেটুস	...	...	২২৪১০	পাউণ্ড
বাঁধাকপি	...	...	৭৮৫৯	"
মুলা	...	...	৭৩৬০	"
স্পাইনাক	...	...	৬৩৯৪	"
পিঁয়াজ	...	...	৪৯৫৪	"
আলু	...	...	৪৯৫২	"
ষ্ট্রবেরী	...	...	৩৭৮১	"
শশা জাতীয়	...	...	৩৫০৯	"

চার্লির কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ১২০০ একর কিন্তু ২০০ একর হইতে তাঁহার উপরোক্ত ফসল উৎপন্ন হইয়াছে।

চার্লির কৃষি-ক্ষেত্রকে কেহ কৃষি-ক্ষেত্র বলিত না, সকলে ইহার নাম দিয়াছিল—"খাদ্য প্রস্তুতের কারখানা"।

আমাদের সুজলা সুফলা বাংলাদেশে একজন লুথার বার-বাঙ্ক বা একজন চর্লিও কি জন্মগ্রহণ করিবেন না!

যাহা হউক খুবই আশার কথা যে, এখন কৃষি-কার্য্যের প্রতি শিক্ষিত ভদ্রযুবকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীমান অমরনাথ রায় অন্যতম। তিনি অতিশয় দরিদ্র। আমাদের Laboratoryতে Laboratory boy হিসাবে কাজ করিতেন। কিছুমাত্র মূলধন না লইয়া ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নার্শরী স্থাপন করিয়াছেন। এই ২০।২১ বৎসর তিনি মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় তিনি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নার্শরীতে মাটি খোঁড়েন, গাছ লাগান। তাঁহাকে দেখিলে চাষাই মনে হয়—জামা জুতা তাঁর নাই। তিনি নিজহাতে মাটি খুঁড়ে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাহা তাঁর "আদর্শ ফলকরে" সন্নিবিষ্ট করেছেন। পোড়া বাংলাদেশে এই বই কত জন কিনবেন ও যাঁরা কিনবেন তাদের মধ্যে কতজন আগ্রহ সহকারে প'ড়ে হাতে-হেতেড়ে কাজ আরম্ভ করবেন জানি না।

১লা আষাঢ়
১৩৪২ সাল

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

নিবেদন

মানবের জীবন ধারণ ও শরীর পুষ্টির জন্য যে সকল খাদ্য অত্যাবশ্যক, ফল তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাংলা এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে। অথচ এই ভারতেই বহু লক্ষ লক্ষ টাকার ফল আমদানি করিয়া বিদেশীরা এদেশের বহু অর্থ লইয়া যাইতেছে। (প্রতি বৎসর কালি-ফোর্ণিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, কাবুল প্রভৃতি দেশ হইতে বহু টাকার ফল এদেশে আমদানি হয়। এ দেশের জল-বায়ু, মৃত্তিকা ও আবহাওয়া বিবিধ ফল চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী ও অনুকূল থাকা সত্ত্বেও আমরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছি। আমাদের দেশে ফলের যথেষ্ট চাহিদা ও অভাব আছে। যে পরিমাণ ফল আমাদের দেশ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা সমগ্র ভারতের অভাব মিটাইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমানে বিস্তৃতভাবে ফলের চাষ ও ব্যবসা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া আছে।

আজ ভারতে বেকার-সমস্যা মূর্ত্তরূপে অতি ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দিয়াছে। সহস্র সহস্র শিক্ষিত ভদ্রযুবক কর্ম্মাভাবে বেকার বসিয়া আছে। অর্থ উপার্জ্জনের কোন প্রশস্ত পথ তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিতে পারিলে হয়ত এই বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। আজ যদি তাঁহারা বৃথা শিক্ষাভিমান ত্যাগ করিয়া চাকরীর পশ্চাতে না ঘুরিয়া কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দেন তাহা হইলে এদেশের কৃষি হয়ত

নূতন ভাবে পরিচালিত হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। কৃষির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে। অন্যগুলির বিষয় ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিস্তৃত ভাবে ফলের চাষ, ব্যবসা ও সংরক্ষণ শিল্প আরম্ভ করেন তাহা হইলে ফল-কৃষি অনেক উন্নতি লাভ করে, তাঁহারাও ইহা দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হইতে পারেন এবং দেশের অর্থ-শোষণ বন্ধ হয়।

যে কোন চাষের কাজে অবতীর্ণ হইতে হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত কিছু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার, নতুবা সুফল লাভ করা যায় না। ব্যবহারিক জ্ঞানই (practical knowledge) এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযোগী ও কার্য্যকরী, কিন্তু ইহার সঙ্গে কিছু কেতাবী জ্ঞানও (theoretical knowledge) থাকা আবশ্যক, নতুবা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। দুঃখের বিষয় ফলের চাষ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তকের বড়ই অভাব। এই অভাব উপলব্ধি করিয়া **আদর্শ ফলকর** নামক পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ কয় বৎসর ধরিয়া গ্লোব নার্শরীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া যে কয় প্রকার ফল সম্বন্ধে আমি পরিচিত হইতে পারিয়াছি সেই কয় প্রকার ফলের চাষই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছি। এই পুস্তকখানি দেশবাসীর নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করিবে জানিনা, কিন্তু যাঁহারা ফল চাষ সম্বন্ধে উদ্যোগী এবং ফলের পরিচয়, চাষ ও পরিচর্য্যার বিষয় জানিতে বিশেষ উৎসুক, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের কোন উপকারে আসিলে শ্রম সফল হইবে। ইতি—

বিনীত—গ্রন্থকার

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়			পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আদর্শ ফলকর

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

কৃষিকার্য্যের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় আর কিছুই নাই। এই কার্য্যে যাঁহার যেরূপ যোগ্যতা ও বুদ্ধি তিনি ততদূর সুফল লাভের আশা করিতে পারেন। ইহাতে একজন নিরক্ষর সাধারণ চাষীর মোটাবুদ্ধি খেলাইবার যতটুকু ক্ষেত্র আছে, একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি খেলাইবার ক্ষেত্রও ততদূর বিস্তৃত আছে।

কৃষিদ্রব্য স্থূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন প্রকার সব্জী, ফল মূল ও শস্যাদি যাহা জীবের খাদ্য হিসাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা খাদ্য-কৃষি এবং পাট, কার্পাস, রবার, চা, লাক্ষা ও বাহাদুরী কাষ্ঠ প্রভৃতি শিল্পের উপাদানের নিমিত্ত যাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা ব্যবহারিক কৃষির অন্তর্ভুক্ত। যে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির উপর দেশের

ও জাতির উন্নতি নির্ভর করে সেই শিল্প ও বাণিজ্যের মূল-ভিত্তি কৃষি ; এজন্য কৃষির উন্নতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

কৃষির মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিভাগ আছে। ধান, গম, ডাউল, শস্য ও কার্পাস প্রভৃতি হইতে আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় খাদ্য এবং পরিচ্ছদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের মধ্যে ইহা অধিক লাভজনক না হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। বিবিধ সব্জী বা তরিতরকারী, বেনেতি মশলা এবং ফলের চাষ অল্প পরিশ্রম-সাধ্য ; ইহাতে লাভের সম্ভাবনা বেশী আছে। ইহাদের মধ্যে তরিতরকারী বা মশলা জাতীয় ফসল প্রতিবৎসরই চাষ করিতে হয় কিন্তু ফলের গাছ একবার লাগাইয়া যত্ন ও পরিচর্য্যা করিলে সারা জীবন ধরিয়া ফল প্রদান করতঃ মানবের বহু উপকার সাধন করিয়া থাকে। প্রথম প্রকার ফসলের চাষ সাধারণতঃ কৃষক শ্রেণীর উপর এবং দ্বিতীয় প্রকার ফসলের চাষ চাষী ও উদ্যানকের মধ্যে নিবদ্ধ। রৌদ্র ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ধান, গম প্রভৃতি শস্যাদির চাষ ভদ্র চাষীদের পক্ষে কষ্টকর ; কারণ জন্মগত অভ্যাসই ইহার প্রধান অন্তরায়। শাক-সব্জী বা তরি-তরকারী ও ফলের চাষ ভদ্র চাষীদের পক্ষে কম কষ্টকর।

ফল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারক এবং ইহার চাষ বেশ লাভজনক। ভারতের বাজারে এবং বাহিরেও ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। ফল মুখরোচক, কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারক এবং শোণিত বর্দ্ধক। ফলের মধ্যে ভাইটামিন বা জীবনীশক্তি পূর্ণ থাকে।

ইহা তরিতরকারীর মত সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয় না বলিয়া ভাইটামিনের গুণ নষ্ট হয় না। প্রাচীনকালে মুনি ঋষিগণ ফলাহারী ছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাঁহারা দীর্ঘায়ু ছিলেন। যে প্রকারে আজকাল ফলের চাহিদা ও ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে সেইভাবে ইহার চাষ বর্ত্তমানে সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্য আমাদিগকে উহার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইতে হইবে।

আমরা আজ দেখিতে পাই বনভূমি ঊষর ভূমিতে পরিণত। ইহার প্রধান কারণ দেশের জলবায়ুর পরিবর্তন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও ভূমিক্ষয়। বনভূমির ক্ষয় যেমন হইতেছে তেমনই আবার উহার পুনর্গঠনের আবশ্যক। সরকার যাহাই করুক না কেন আমাদের সাধারণের সাধ্যমত দেশকে বিপর্য্যয়ের কবল হ'তে রক্ষ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শস্য চাষের জমি ভিন্ন যার যতটুকু জমি আছে তাহাতে কিছু কিছু বৃক্ষ রোপণ করা উচিত।

মোট কথা ফল-বৃক্ষ রোপণ অধিক পরিমাণে করা দরকার। ইহাতে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, ফল-বৃক্ষের উৎকর্ষ সাধন করিলে প্রভূত ফল রপ্তানী করিয়া দেশের ও বিদেশের ফলের চাহিদা মিটান যাইবে। এককথায় বলা যায় ফলের দ্বারাই স্বাস্থ্য ও সম্পদ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে অনেক শিক্ষিত যুবক এই ফল চাষের দিকে নজর দিয়াছেন। মনে হয় ইহার দ্বারা সকলের নিকট ফল-বৃক্ষ রোপণের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি পরিস্ফুট হইবে।

ফলকর বা কৃষি অনুন্নত কেন ও ইহার প্রতিকার কি ?

যদিও এই দ্বিবিধ প্রশ্নের যথাযথ সমালোচনা এই পুস্তকের ২।১ পৃষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় তথাপি এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত লোকই চাকুরীর জন্য লালায়িত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কম লোককেই কৃষিকার্য্যে নামিতে দেখা যায়। কৃষিকার্য্যে বিশেষ স্পৃহা লইয়া যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদেশ হইতে কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা কৃষিকার্য্যে ব্রতী হন নাই। এজন্য দেখা যায় বৈদেশিক কৃষি-বিদ্যা আমাদের দেশীয় অবস্থার সহিত ঠিক খাপ খায় না। এমন ভাবে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে যাহা আমাদের দেশের জল হাওয়ার উপযোগী হইতে পারে। ইহার জন্য বিলাত, আমেরিকায় ছুটাছুটি করিবার আবশ্যক হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি চাকুরীর মোহ ত্যাগ করিয়া কৃষি বিষয়ে নিবদ্ধ হন এবং তাঁহাদের যাবতীয় মৌলিকত্ব অন্য দিকে অপব্যয় না করিয়া কৃষিতে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষেত্রার্জ্জিত জ্ঞানে কৃষি আবার উন্নত হইতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোক যদি স্বদেশে থাকিয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ ও সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের

দেশের লোক তাহা পারিবেন না কেন? আমাদের দেশে কি উর্ব্বরমস্তিষ্ক লোকের অভাব আছে? না তাহা নয়, তবে আমাদের দেশের সকলেই চাকুরী বা দাসত্বকে যেমন জীবন-ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, অন্যান্য স্বাধীন দেশের লোকেরা সেরূপ ভাবে জীবন ধারণ করা আদৌ স্পৃহণীয় মনে করেন না। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মনে সাধারণতঃ যেরূপ গরিমার উদয় হইয়া থাকে এবং কৃষিকার্য্য প্রভৃতিকে তাঁহারা নীচকার্য্য মনে করেন ও অবহেলার চক্ষে দেখেন অন্য কোন স্বাধীন দেশে এরূপ ঘটে না। আমাদের দেশের চাকুরীজীবী সাধারণ যুবকেরা অল্প পরিশ্রমেই কাতর ও অধ্যবসায়হীন এবং যত্ন ও উদ্যমে উদাসীন হইয়া থাকেন। মানসিক পরিশ্রমের সহিত কায়িক বা শারীরিক পরিশ্রম না করায় তাঁহারা স্বাস্থ্যহীন ও রুগ্ন হইয়া পড়েন।

কৃষি বিষয়ে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে, কৃষি-কার্য্যে উন্নত হইতে হইলে আগ্রহ, সাধারণ শিক্ষা এবং জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এদেশের কৃষকের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ের যথেষ্ট অভাব থাকায় এদেশের কৃষি-উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। ভারতের প্রাকৃতিক আবহাওয়া বা অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু সেই পুরাতন কৃষি প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এদেশের কৃষক শ্রেণীর দৃষ্টিও এবিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই। সাধারণ কৃষকেরা এখানে কর্ষণের বিধিটাই জানিয়া রাখিয়াছে কিন্তু ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও তাহাদের অজ্ঞাত। নিয়ত

চাষের দ্বারা বৃক্ষাদির খাদ্য উপযোগী উপাদান কি পরিমাণে জমি হইতে হ্রাস হইতেছে এবং কি উপায়ে প্রাকৃতিক উর্ব্বর ক্রিয়া বা জমির এই অভাব দূর করা যাইতে পারে এদেশের কোন কৃষক তাহার চিন্তা করে কি ? অধিকন্তু এদেশের জমি খণ্ড খণ্ড বিভক্ত থাকায় জমির পরিচর্য্যা বা দেখাশুনায় বিশেষ অসুবিধা হয়। উৎকৃষ্ট বীজ বা চারা নির্ব্বাচন, সার প্রয়োগ, জল নিষ্কাষণ ও জলসেচন এবং জমির পাট ও বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা করিতে এদেশের কৃষকদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এই সমস্ত কারণে অপকৃষ্ট বীজ বা চারার জন্য ফসলের নিকৃষ্টতা, জমি হইতে জল নিকাশের ব্যবস্থা না করায়, মাটি উপযুক্তরূপে কর্ষণ না করায় এবং বৃক্ষাদির পরিচর্য্যার অবহেলা হেতু জীবাণু ও পোকা মাকড়ের উপদ্রব হওয়ায় ফসল রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশের কৃষকেরা জলের জন্য ভগবানের উপর দোহাই দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে। কোন বৎসর সুবৃষ্টি না হইলে ফসল জন্মাইতে পারা যায় না কিন্তু একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ও একতাবদ্ধ হইয়া পুষ্করিণী, কূপ ও টিউবওয়েল দ্বারা এই অভাব অনেকাংশে মোচন করা যাইতে পারে। একের পক্ষে কোন কাজ আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষকের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে কিন্তু পাঁচজনের সমবায় শক্তি দ্বারা তাহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। চাষের কাজে কোন না কোন বিষয়ে পাঁচজনের সাহায্যে ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক।

ফল সম্পদ উন্নয়ন

বাজারে বারমাসই নানারকম সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কলা, নারিকেল প্রভৃতি কয়েকটী ফল ব্যতীত বাকী ফলগুলি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। আমাদের দেশের গ্রামের পার্শ্বে উর্ব্বর জমিতে আম বাগান দেখা যায় কিন্তু এত আম বাগান থাকিতেও দেশের আমের চাহিদা অন্য দেশ হইতে আমদানী হইয়াই মিটায়। ইহার কারণ হইতেছে যে (১) স্থানীয় জল বায়ু ও মৃত্তিকার প্রকৃতি বিচার না করিয়াই উদ্যান রচনা (২) সুফলা, চালান যোগ্য ফলের পরিবর্ত্তে অভিজাত উচ্চ শ্রেণীর স্বল্প কলা গাছের চাষ (৩) ঘন ঘন গাছ রোপণ (৪) কোপান, নিড়ান ও সার দেওয়া প্রভৃতি কাজে অবহেলা।

সর্ব্বদা মাটীর ও জল বায়ুর প্রকৃতি বুঝিয়া গাছ রোপণ করা উচিত। বিখ্যাত গাছ বিক্রেতার নিকট হইতে খাঁটী জিনিষ ক্রয় করিয়া তাহা ভাল ভাবে রোপণ করা উচিত। ঘন ভাবে গাছ লাগাইলে গাছ বেশী হয় বটে কিন্তু ফল হয় না। কেবল গাছ বসাইলেই গাছ ফল দেয় না, ঐ জমিতে রীতিমত কোপান, নিড়ান ও সার দেওয়া দরকার। তাই বর্ত্তমানে আমাদের ফলের বাগানের দিকে গভীর মনোনিবেশ করিলে একদিন দেখা যাইবে আমরা ফল চাষ সম্বন্ধে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিয়াছি।

ভারতবর্ষে ফলের চাষ সম্বন্ধে নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল।

নারিকেল	১৬,০০,০০০	একর
আম	৯,৬৭,৩৭০	"
কলা	৪,০৪,৫৪০	"
লেবু জাতীয়	১,৩০,০০০	"
পেয়ারা	৬৩,১০০	"
আনারস	১১,১৯০	"
আপেল	৯,৯৩০	"
ন্যাশপাতী	৬,০৬০	"
আঙ্গুর	৪,১৮০	"

উপরি উক্ত হিসাব মতে দেখা যায় যে সারা ভারতে নারিকেল বাদে ১৬ লক্ষ একরেরও অধিক জমিতে ফলের চাষ হইত। এই হিসাবে কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল ধরা হয় নাই।

স্থান বা জমি নির্ব্বাচন

বিস্তৃতভাবে ফল-চাষ করিতে হইলে স্থান বা জমি নির্ব্বাচন এবং জল সরবরাহের প্রতি লক্ষ রাখিয়া কাজ করিতে হয়। চাষের জমি যেন জঙ্গলময় না হয়। জঙ্গল বা আগাছা থাকিলে উহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া দরকার। উচ্চ জমি ফল চাষের প্রধান অবলম্বন, নিম্ন জমিতে যেখানে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় সে জমি ফল-চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। নিম্ন জমি হইলে মাটি ফেলিয়া উঁচু করিয়া চাষের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। জমি ঈষৎ ঢালু রাখিলে ভাল হয় কিন্তু জমিতে জল নিকাশের বা জল প্রবেশের জন্য জুলি বা ছোট নালা রাখিলে জমি ঢালু না করাই ভাল। ফলকরের জমি যদি চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি অপেক্ষা অধিক উঁচু হয় তাহা হইলে অনাবৃষ্টির সময় ইহাতে গাছের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আবার এই জমি চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি হইতে নীচু হইলে অত্যধিক রসে বা জলে গাছ নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

দোআঁশ জমি প্রায় সর্ব্বপ্রকার ফল-চাষের পক্ষে উপযোগী। যে জমির মৃত্তিকার উপরের স্তর ভাল' এবং তন্নিম্ন স্তর খারাপ তথায় গাছ প্রথমে খুব স্বাস্থ্যবান থাকিলেও পরে রুগ্ন, দুর্ব্বল এবং ফলধারণে অশক্ত হইয়া পড়ে। গভীর কর্ষণ ও সার-প্রয়োগ

দ্বারা এরূপ জমির স্বভাব পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এরূপ জমির চারি পাশে নালা রাখিলে ভাল হয়।

ফলকরের জমি ছায়াশূন্য হওয়া দরকার। ছায়াযুক্ত স্থান বা আওতার গাছ শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে পারে না। গাছের স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি এবং ফলনের সহিত আলোক ও সূর্য্যকিরণের যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ফলকরের জমিতে নাইট্রোজেনাস্ সারের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে ফস্ফরাস, পটাশ ও চূণ থাকা আবশ্যক। নাইট্রোজেন সারে গাছের তেজ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু পটাস ও ফস্ফরাস সার না থাকায় উপযুক্ত ফলন পাওয়া যায় না। এজন্য জমিতে উপরোক্ত সারের অভাব ঘটিলে উহা প্রয়োগ দ্বারা সারের অভাব পূরণ করিতে হয়।

ফলকরের জমিতে জলের বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে। উপযুক্ত পরিমাণে জল প্রয়োগ না করিলে সুফল লাভ করা যায় না। ফলকরের জমিতে এরূপভাবে জল দেওয়া দরকার, যাহাতে জমির সমস্ত স্থান সিক্ত হয়। কারণ সাধারণতঃ গাছের শাখা প্রশাখা যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে ততদূর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শিকড় গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

ফলকরের জমির চতুষ্পার্শ্ব উন্মুক্ত না রাখিয়া উহা ঘিরিয়া দেওয়া উচিত। উহা কাঁটা তাঁর, বেড়ার গাছ, করমচা, লেবু প্রভৃতি কাঁটাযুক্ত ফলের গাছ, জায়গেন্সিয়া বা এলা গোলাপের গাছ অথবা মৃত্তিকা বা ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা ঘিরিয়া দিতে হয়।

ফলকরে নানাবিধ ফলগাছ রোপণ করিতে হয় সেজন্য প্রথমতঃ রোপিত বৃক্ষের স্বভাব ইত্যাদি দেখিয়া বড় রাস্তা ও পথ দ্বারা বিভিন্ন অংশসমূহ ভাগ করিয়া লইতে হয়। রাস্তা ও পথঘাট নির্ম্মাণের সময় জমিগুলি নানাবিধ আকারের হইলেও চতুষ্কোণাকারের করিয়া লইতে হয়। নানারূপ আকারে জমিকে চতুষ্কোণ করিলে সামান্য সামান্য জমি প্রকৃত চতুষ্কের বাহিরে পড়িয়া থাকে। সেগুলিতে আকারানুযায়ী ছোট ছোট ফলগাছ ও জলকর, মালীর ঘর প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাগানের প্রধান রাস্তা ছয় ফুট চওড়া ও জমিতল হইতে ১ ফুট উচ্চ হইলে ভাল হয়। জমির মধ্যে সমস্ত স্থানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বড় প্রশস্ত রাস্তার সহিত ক্ষুদ্র-পরিসর রাস্তার সংযোগ রাখা দরকার।

ফলকরের জমিতে বেড়ার ধারে ধারে বৃদ্ধিশীল ও ঘন পল্লব-বিশিষ্ট গাছ রোপণ করিলে ভাল হয়। ইহাকে Wind Breake বা ঝড় নিয়ন্ত্রণকারী বৃক্ষ কহে। বাগানে যাতায়াতের প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে গাছের জাতি ও আকার অনুযায়ী পরস্পর উপযুক্ত ব্যবধানে গাছ লাগাইলে বড় সুন্দর দেখায়। যাতায়াতের পথ প্রশস্ত অথবা সঙ্কীর্ণ করিতে হইলে সেইরূপ হিসাব অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতীয় গাছ লাগাইতে হয়। ফলের বাগানের আয়তন অনুযায়ী আবশ্যক মত পুষ্করিণী বা ঝিল থাকা দরকার এবং এই জলা-শয়ের কিনারা হইতে ৮।১০ হাত দূরে শ্রেণীবদ্ধভাবে তাল,

নারিকেল, খেজুর, সুপারি প্রভৃতি গাছ লাগাইলে ভাল হয়। ক্ষেত্রের সমুদয় অংশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রতি অংশে এক একটী নির্দ্দিষ্ট জাতীয় গাছ লাগান দরকার। খুব বৃহৎ জমি না হইলে বাগান এরূপভাবে সাজান যায় না। কিন্তু যাঁহার এরূপ বৃহৎ জমি লইয়া বৃহৎভাবে কার্য্য পরিচালনা করিবার মত শক্তি ও অভিজ্ঞতা নাই তাঁহার এরূপভাবে কাজে অবতীর্ণ হওয়া অনুচিত। ব্যবসা হিসাবে ফলচাষে প্রবৃত্ত হইতে হইলে বৃহত্তম জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। অল্প জমিতে চাষের খরচ সঙ্কুলান করা যায় কিন্তু লাভের আশা কম।

এতদ্ভিন্ন বড় সহরের সহিত রেল বা ষ্টীমার যোগে যাহাতে ফল রপ্তানি করা যায় ও বাগানের সহিত ভাল রাস্তা যদ্দ্বারা দ্রুত ষ্টেশনে মাল রপ্তানি করা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়। বিভিন্ন জল বায়ুতে বিভিন্ন ফল জন্মাইয়া থাকে। সে জন্য যে স্থানে বাগান তৈরি করা হইবে, সে স্থানের উপযোগী গাছ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। তাহা না হইলে কখনই ফলচাষে লাভবান হওয়া যায় না।

মৃত্তিকার গুণাগুণ ও পরীক্ষা

মোটামুটি ভাবে ধরিতে গেলে মাটির গুণাগুণের উপরেই চাষের ফলাফল নির্ভর করে, এজন্য চাষের জমি ভাল হওয়া দরকার। মৃত্তিকান্তর্গত উপাদানের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুসারে মৃত্তিকার প্রকারভেদ দৃষ্ট হয় এবং তখন উহা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃষ্টির জলে, বন্যা বা প্লাবনে পর্ব্বতগাত্র বা উচ্চ ভূভাগ চূর্ণ বা বিধৌত হইয়া সেই জলরাশি নিম্ন ভূমিতে আসিয়া পড়ে। উক্ত জলের সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহ নানাবিধ পদার্থ সংযোজিত হইয়া জলের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা দূর করে এবং উহা নিম্ন ভূমিতে আসিয়া স্থিতিলাভ করিয়া ক্রমে স্তরে পরিণত হয়, এইরূপে প্রতিনিয়ত বারিবাহিত পরমাণু হইতে স্তরের সৃষ্টি হইতেছে। এই ঘোলা জলের মধ্যে যে যে জাতীয় পদার্থ থাকে স্তরও সেই অনুযায়ী হয়। ঘোলা জলে যে বর্ণের প্রাধান্য থাকে স্তরও সেই বর্ণের মত হয়। ধোয়াটে জলে বালির ভাগ অধিক থাকিলে স্তর বেলে হয় এবং উহার বর্ণ বালির বর্ণের মত হয়। জলের সহিত লৌহসঙ্কুল বা পার্ব্বত্য লাল মৃত্তিকা বাহিত হইলে ঐ স্তর লাল বর্ণের হয়। অরণ্যের ধোয়াটে উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা আসিলে স্তর মসিবর্ণের এবং এঁটেল মাটির স্তর কৃষ্ণাভ হইয়া থকে।

যে মাটি নিজের জন্মস্থানেই থাকিয়া যায় তাহাকে

Sedentary soil বলে এবং যাহা জল, বাতাস বা বন্যায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বাহিত হয় বা অন্যস্থানে গিয়া পড়ে তাহাকে Transported soil বলে। এই পলি-পড়া বা চর মৃত্তিকার ভাল ও মন্দ উভয়বিধি গুণই থাকিতে পারে। যে স্তরে বালির ভাগ অধিক থাকে তাহাকে বেলে মাটি এবং যে স্তরে এঁটেল মাটির ভাগ অধিক দৃষ্ট হয় তাহাকে এঁটেল মাটি বলে। এরূপ উভয়বিধ জমিই ফল চাষের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এজন্য ফলের জমি নির্ব্বাচন করিবার সময় জমির মৃত্তিকা পরীক্ষা করা দরকার। সাধারণ কৃষিকার্য্যে অথবা শস্য বা সব্জী চাষে জমি দুই হাত গভীর খনন করিয়া দেখিলে চলিতে পারে কিন্তু ফল বা কোন দীর্ঘমূল উদ্ভিদের চাষে জমি অধিকতর গভীর ভাবে খনন করিয়া না দেখিলে চলে না। অনেক জমিতে হয়ত এরূপ দেখা যায় যে উপরের দুই স্তরের মৃত্তিকা খুব ভাল কিন্তু তন্নিম্ন স্তরের মৃত্তিকা খারাপ। হয়'ত উহা বেলে অথবা এঁটেল প্রধান, এইজন্য মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুযায়ী ফসল নির্ব্বাচন করা ভাল। আবশ্যক হইলে এরূপ মৃত্তিকার প্রকৃতি বা স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়, কিন্তু উহা অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

মৃত্তিকায় প্রধানতঃ দুই জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়। (১) জৈব (organic) ও (২) অজৈব (inorganic)। খাঁটি পাথরের গুঁড়াকে অজৈব পদার্থ বলে। এই অজৈব পদার্থের সহিত জৈব পদার্থ (নানাবিধ জন্তু জানোয়ার, লতা পাতা, গাছ পালার গলিত পচা অংশ) মিশ্রিত না হইলে গাছপালা উৎপন্ন হয় না।

এই অজৈব পদার্থের সহিত জৈব পদার্থের সংমিশ্রণেই মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকা-মধ্যে সাধারণতঃ চারিটী স্থূল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা, (১) কৰ্দ্দম (clay), (২) বালুকা (sand), (৩) চূণ (lime) এবং (৪) দাহ্য পদার্থ (humus)। এই কৰ্দ্দম ও বালুকা অজৈব পদার্থের সমষ্টি।

চূর্ণীকৃত প্রস্তরের সূক্ষ্ম কণাই বালি নামে অভিহিত। যে মাটিতে বালির ভাগ অধিক তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহাতে বালিকণার সংযোজক শক্তি নাই, উহার প্রত্যেক কণাই পৃথক্। এই বালুকণা সমূহের উত্তাপ ও পোষকতা শক্তি না থাকায় উহা উত্তাপ বা জল সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার শোষকতা শক্তি আছে কিন্তু ধারকতা শক্তি নাই। এজন্য রৌদ্রে ইহা শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং বৃষ্টি হইলেই অতি শীঘ্র জল শোষিত হইয়া যায়, সেজন্য জল সেচন করিলেও ঐ মৃত্তিকা বেশীক্ষণ সিক্ত থাকে না অতএব ইহাতে ভাল ফসল হয় না।

ধাতব সূক্ষ্ম পদার্থের নাম কৰ্দ্দম। ইহা বেলে মাটির ঠিক বিপরীত ভাবাপন্ন। যে মৃত্তিকায় কৰ্দ্দমের ভাগ অধিক থাকে তাহাকে এঁটেল মাটি বলা হয়। এঁটেল মাটি পরমাণু সমূহের সূক্ষ্মতা ও আঁটালতা নিবন্ধন হেতু উহা পরস্পরের সহিত অতি ঘন-ভাবে সংলগ্ন থাকে। ইহার শোষকতা শক্তি কম এবং ধারকতা শক্তি বেশী। ইহাও অধিকাংশ ফল চাষের পক্ষে অনুপযোগী।

চূণ মৃত্তিকার একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সকল মৃত্তিকাতেই ইহা কম বা বেশী পরিমাণে থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে

চুণের ভাগ অধিক থাকিলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু যে জমিতে চূণের অভাব অথবা যে জমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়াছে তাহাতে চুণ প্রয়োগ করিলে মাটির দোষ কাটিয়া গিয়া উহা উর্ব্বর হইয়া থাকে।

মাটিতে উপরোক্ত তিন প্রকার পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও উদ্ভিজ্জ বা জৈব পদার্থ না থাকিলে মৃত্তিকার একটী অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকে। যাবতীয় জীবজন্তু গাছপালা উদ্ভিদ প্রভৃতি বিগলিত হইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকা মধ্যে সম্মিলিত হয়। এইরূপে দাহ্য পদার্থের সমাবেশ হইলে মাটির উর্ব্বরতা সাধিত হইয়া থাকে। এই দাহ্য পদার্থ বা হিউমাস্ই জমির প্রাণস্বরূপ।

মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিলে মাটির মধ্যে কয়েক জাতীয় আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ জীবাণু (Bacteria)। দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া উদ্ভিদের বিশেষ উপকার করে। ইহারা মৃত্তিকার বন্ধু সন্দেহ নাই কিন্তু কোন কোন জাতি ক্ষতিসাধন করে। ইহারা অধিকাংশ জমির জৈব (organic) অংশকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারা জমির বেশী নিচে থাকিতে পারে না এবং বেলে বা স্যাঁতা জমিতে ইহাদের প্রাচুর্ভাব খুব কম। চূণযুক্ত মাটিতে ইহারা ভাল কাজ করে আবার অধিক চূণযুক্ত মাটিতে ইহারা থাকিতে পারে না। এক নাইট্রোজেন ব্যতীত অন্য কোন উপাদানই গাছ অপরের সাহায্য ব্যতীত একাকী লইতে পারে না। এই সমস্ত জীবাণু

মৃত্তিকাস্থিত কোন জীবজন্তু বা উদ্ভিদকে পচাইয়া গলাইয়া গাছপালার আহারোপযোগী করিয়া থাকে। বাতাসের মধ্যে নাইট্রোজেন নামক গাছের একপ্রকার খাদ্য থাকে। এই সমস্ত জীবাণু নাইট্রোজেন নামক খাদ্যকে বাতাস হইতে গ্রহণ করিয়া গাছপালাকে জোগাইয়া থাকে। মাটির যে আকস্মিক ও অদ্ভুত রূপান্তর আমরা দেখিতে পাই, তাহার মূলে অনেক স্থলেই এই জীবাণুদের সমবেত কর্ম্মশক্তি বর্ত্তমান। মৃত্তিকা-বাসী জীবাণুদের মধ্যে তিন প্রকার জীবাণু আছে; খনিজ জীবাণু, অঙ্গার জীবাণু ও নাইট্রোজেন জীবাণু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কর্দ্দম, বালুকা, চূণ ও দাহ্য পদার্থ এই চারিটি স্থূল পদার্থ সমাবেশে মৃত্তিকা গঠিত। ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ অনুসারে মৃত্তিকার গুণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মৃত্তিকারই একটি নির্দ্দিষ্ট ওজন (Specific gravity) আছে, আর এই ওজনের উপর মাটির ফসল ফলাইবার শক্তি নির্ভর করে। বেলে মাটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভারী, তাহা অপেক্ষা হালকা এঁটেল এবং সর্ব্বাপেক্ষা হালকা বোদমাটি বা উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা।

প্রত্যেক মাটিরই কম বেশী জল ধারণের শক্তি আছে। যে জমির জল উপরে না জমিয়া মৃত্তিকাস্থ প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে মিশাইয়া থাকে, তাহাই উৎকৃষ্ট। জমির জৈব অংশের উপরেই জলধারণের ক্ষমতা অনেকটা নির্ভর করে।

প্রত্যেক মাটিরই একটা তাপ (heat) আছে আর এই

২

তাপ না থাকিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। এই তাপ বীজের অঙ্কুরোৎপাদন কার্য্যে সহায়তা করে। অধিক তাপও আবার খারাপ, ইহাতে গাছ বা বীজ নষ্ট হইয়া যায়।

কৈশিকাকর্ষণের দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যস্থ রস উপরে উঠিয়া আসে। এই রস বা জল উপরে টানিয়া তুলিবার একটা ক্ষমতা (Capillarity) প্রায় প্রত্যেক মাটিরই আছে। তবে বেলে মাটির এই ক্ষমতা খুব কম এবং এঁটেল বা দোআঁশ মাটির বেশী। মাটির প্রতি পরমাণুর মধ্যে যে পরিসর বা ফাঁক থাকে কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা মাটির নীচে হইতে রস ঐ ফাঁক বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসে, এজন্য অধিক রৌদ্রে, কর্ষিত ও চূর্ণীকৃত জমির উপরিভাগ শুষ্ক হইলেও উহার নীচে রস সঞ্চিত থাকে এবং এই জন্যই অধিক এঁটেল জমি কর্ষিত না থাকার জন্য শীত ও গ্রীষ্মকালে ফাটিয়া যায়।

মাটিকে প্রধানতঃ দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ—

১। **এঁটেল মাটি**—এই মাটি অত্যন্ত আঠাল ও চটচটে। ইহাতে শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক এ্যালুমিনা নামক শ্বেত ধাতব পদার্থের চূর্ণ, ২০ ভাগের কম বালি এবং একভাগের অর্দ্ধ-ভাগ উদ্ভিজ্জ মাটি থাকে। এই মাটির সহিত এ্যামোনিয়া, পটাস, ফস্ফরিক এ্যাসিড, লৌহ এবং শতকরা ১ হইতে ৫ ভাগ পর্য্যন্ত চূর্ণ সম্মিলিত থাকে। চূণের পরিমাণ ভেদে এঁটেল মাটি উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট, এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া

থাকে। যাহাতে শতকরা ৫ ভাগ চূণ থাকে তাহা উত্তম, যাহাতে ২॥০ হইতে ৫ ভাগের কম চূণ মিশ্রিত থাকে তাহা মধ্যম এবং যাহাতে ইহারও কম বা নাম মাত্র চূণ থাকে তাহা অপকৃষ্ট এঁটেল মৃত্তিকা। এঁটেল মাটির ঘনতার জন্য বৃষ্টির জল সহসা উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, পরে ধীরে ধীরে উহা মাটিতে প্রবেশ করে। এজন্য এঁটেল মাটিতে অধিক পরিমাণে জল সঞ্চিত থাকে, কিন্তু ভূমি কর্ষণ করিয়া না রাখিলে অভ্যন্তরস্থ জল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়া যায়। কর্ষিত হয় না বলিয়া শীত ও গ্রীষ্মকালে এঁটেল মাটি ফাটিয়া উঠে।

২। **বেলে মাটি** ঃ—এই মাটি অত্যন্ত ভারী। ইহাতে শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক বালি এবং ১০ ভাগ পর্য্যন্ত চিক্কণ বা এঁটেল, মাটি থাকে। এই প্রকার মাটি চাষ আবাদের পক্ষে উপযোগী নহে। বেলে মাটির মধ্যেও আবার বহু প্রকার ভেদ আছে (১) বড় বা স্থূল দানাযুক্ত (২) মাঝারি দানাযুক্ত (৩) সূক্ষ্ম দানাযূক্ত। স্থূল বা বড় দানাযুক্ত বেলে মাটি কৃষি কার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ইহা ঘর বাড়ী নির্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় প্রকার মাঝারি দানাযুক্ত বেলে মাটিতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ হইলে আবাদের উপযোগী হয় বটে, কিন্তু ইহাকে ভাল মৃত্তিকা বলা চলে না। তৃতীয় প্রকার সূক্ষ্ম দানাযুক্ত বেলে মাটিতে ফুটী, তরমুজ, পটল, প্রভৃতি ফসল জন্মিলেও সর্ব্বপ্রকার শস্য, ফসল বা ফলের জমি হিসাবে এই মাটিও

উপযোগী নহে। এই মাটির স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণে গোবর, আবর্জনা ও উদ্ভিজ্জ সার প্রয়োগ করিতে হয়।

৩। **দোআঁশ মাটী** :—উদ্যানের কার্য্যে এই মাটি বিশেষ উপযোগী। ইহাতে প্রায় ৪০।৫০ ভাগ বালি, ৩০ হইতে ৫০ ভাগ কর্দ্দম, ৫ ভাগ চূণ ও ৫ ভাগ উদ্ভিজ্জ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। সর্ব্বপ্রকার ফল, মূল, শাক-সব্জী, তরিতরকারী বা ফসল এই মাটিতে অতি উত্তম জন্মে।

৪। **বেলে দোআঁশ** :—ইহাতে ৫০ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত বালি এবং ২০ হইতে ৩০ ভাগ এঁটেল মাটি থাকে। দোআঁশ মাটি অপেক্ষা ইহার রস ধারণের শক্তি কম এবং ইহা উত্তাপ বিক্ষেপক অর্থাৎ মাটি শীঘ্র তাতিয়া উঠে। কয়েক জাতীয় শস্য ইহাতে ভাল জন্মিলেও কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইহা সমধিক উপযোগী নহে।

৫। **দুধে এঁটেল** :—ইহাতে শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত বালি থাকে এবং ৫০ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত এঁটেল মাটি থাকে। ইহাতে বালি অপেক্ষা এঁটেল বা চিক্কণ মাটির প্রাধান্য অধিক। এই মাটিতে নানাপ্রকার ফসল ও ফলমূল জন্মান চলে।

৬। **চূণ মধ্যম** :—ইহাতে শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত চূণ থাকে। মাটিতে পরিমাণ অনুযায়ী চূণ থাকা আবশ্যক, অধিক চূণ থাকিলে জমির ক্ষতি করে। জমিতে শতকরা ৫ ভাগ চূণ থাকা দরকার। কর্দ্দম ও বালুকা ইহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে

যে বৈষম্য আছে চূণ তাহা দূর করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করে। চুণ নিজে রস শোষণ ও ধারণ করিতে পারে। চূণ মাটিকে জমাট বাঁধিতে না দিয়া পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে সক্ষম হয়। ইহা মাটির ঘনতা বা আঠালতা দূর করিয়া উহাকে লঘু করে ও জমির মধ্যস্থ অম্লজ পদার্থ বিনষ্ট করিয়া উহাকে ব্যবহারোপযোগী করে।

৭। **কষা মাটি** :—ইহা অত্যন্ত চূণ সঙ্কুল, এই মাটিতে শতকরা ২০ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত চূণ থাকে। চূণ সঙ্কুল প্রস্তরময় পাহাড় বা তৎসন্নিহিত স্থানে এই প্রকার জমি দৃষ্ট হয়। ঈদৃশ জমিতে কোন ফসলই উৎপন্ন হয় না। ঘুটিং, মার্ল, জিপসান, শম্বুক, ঝিনুক এবং সমস্ত প্রকার জীবজন্তুর অস্থি প্রভৃতি হইতেও অল্পাধিক চূণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করিলে চূণ উৎপন্ন হয়।

৮। **জৈব বা উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা** :—সাধারণ মৃত্তিকায় যে পরিমাণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে ইহাতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে থাকে। উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও হিউমাস দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। যেখানে উদ্ভিজ্জ পদার্থ সেখানে হিউমাস, কিন্তু যেখানে হিউমাস সেখানে উদ্ভিজ্জ পদার্থ ইহা নাও হইতে পারে। অম্লজান (oxygen), জলজান (Hydrogen) ও যবক্ষার জান (Nitrogen) এই তিনটি বাষ্পের সংযোগে হিউমাস নামক পদার্থের উৎপত্তি। এই হিউমাস উদ্ভিদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তদন্তর্গত স্থূল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। হিউমাসের

কতক অংশ দ্রবণীয় আবার কতক অংশ অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে। ইহার দ্রবণীয় অংশের নাম উদ্ভিজ্জাম্ল (humic) এবং অদ্রবণীয় অংশের নাম অঙ্গার বা হিউমিন (humin)। উদ্ভিদের মূল সমূহ এই দ্রবণীয় অংশ সাধারণতঃ গ্রহণ করিয়া থাকে। অঙ্গারজান বা কার্ব্বণ উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। এই হিউমাস হইতে মৃত্তিকায় কার্ব্বণ সংস্থিত হয় এবং বায়ুমণ্ডল হইতেও বৃক্ষাদি ইহা গ্রহণ করে। মৃত্তিকায় উক্ত পদার্থের অভাব ঘটিলে গাছ জন্মিতে পারে না।

৯। **বোদ মাটি** ঃ—ইহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ এত অধিক বিদ্যমান থাকে যে ইহাকে সম্পূর্ণ মৃত্তিকা বলা যায় না। মৌলিক বা আসল অবস্থায় ইহাতে কোন উদ্ভিদ জন্মে না। শুষ্ক অবস্থায় ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত হালকা এবং মসিবৎ। হিমচা, কলমী, শেওলা, পানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের দ্বারা পুষ্করিণী বা জলাশয়ে দাম জন্মে এবং উহা পচিয়া পুষ্করিণীতে এঁদো পড়ে। এইরূপে জলাশয় ক্রমে মজিয়া যায়। এই এঁদো পড়া মাটিকেই বোদ মাটি বলে। দোআঁশ, বেলে বা এঁটেল মৃত্তিকার সহিত ইহা মিশ্রিত করিলে মাটির খুব তেজ হয় এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সার হিসাবে ইহা ব্যবহার করা চলে।

১০। **লোণা ও উষর মাটি** ঃ—সমুদ্র এবং তৎসংযুক্ত নদী, খাল, বিল প্রভৃতি সন্নিহিত স্থানের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ লোণা হইয়া থাকে। লবণাক্ত জমি চাষ-আবাদের পক্ষে উপযোগী

নহে। অল্প লোণা জমিতে আমন ধান, পাট, তূলা, আক প্রভৃতির চাষ করা চলে, কিন্তু অধিক লোণা জমিতে কোন জিনিষ আবাদ করা চলে না। জমি অল্প লোণা হইলে সার ও বিভিন্ন মৃত্তিকাদি প্রয়োগ দ্বারা উহার সংস্কার সাধন করা চলে। কিন্তু অধিক লোণা জমি একেবারে ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থানে বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে জমির উপরিভাগে লোণা ফুটিতে বা সাদা সরের মত একপ্রকার স্তর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এইরূপ জমিকে উষর জমি বলে। কেহ কেহ ঐ শ্বেতবর্ণ পদার্থ চাঁচিয়া উহা হইতে লবণ, সোডা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে, চাষের পক্ষে এই জমি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়ে ইহাতে চাষ আবাদ করা চলে না।

জমি নির্ব্বাচন ও মৃত্তিকা পরীক্ষা কৃষিকার্য্যের একটি আবশ্যকীয় বিষয় মধ্যে গণ্য ; কারণ জমি ভাল না হইলে ফসল ভাল হয় না। জমির প্রকৃতি বা মাটির স্বাভাবিক গুণ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, কিন্তু উহা বিশেষ কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কতকগুলি ফসল আছে যাহা এঁটেল মাটিতে জন্মিতে পারে, কতকগুলি ফসল বেলে জমিতে ভাল জন্মে, আবার কতকগুলি ফসল দোআঁশ মৃত্তিকা ব্যতাত ভাল জন্মে না। প্রায় সর্ব্বপ্রকার ফসলই দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। ফলোদ্যানের পক্ষে চূর্ণ মিশ্রিত দোআঁশ মাটিই বিশেষ উপযোগী। রাসায়নিক

বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে অধিকাংশ ফল-বৃক্ষই মৃত্তিকা হইতে ফস্ফরিক এ্যাসিড ও পটাশ বহুল পরিমাণে গ্রহণ করে। সেজন্য যে স্থানের মৃত্তিকায় এই দুইটি দ্রব্য বহুল পরিমাণে আছে, সেইরূপ মৃত্তিকাযুক্ত জমি ফলোদ্যানের বিশেষ উপযোগী।

আবহাওয়া

ফলচাষে মৃত্তিকা অপেক্ষা আবহাওয়ার প্রাধান্য অধিক। ইচ্ছা করিলে মৃত্তিকার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করা চলে না। ভারতের বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া সমান নয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্ত-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানেই আবহাওয়ার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। গাছপালায় স্বাস্থ্য এবং মরণ-বাঁচন অনেকটা জলবায়ু বা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। যে কোন উদ্ভিদ বা গাছপালা কোন স্বতন্ত্র স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে জন্মাইবার ইচ্ছা করিলে উহা সেই স্থানের আবহাওয়ার উপযোগী হইবে কিনা তাহা জানা দরকার। যে কোন স্থানের আবহাওয়া—সেই স্থানের বৃষ্টিপাত এবং শীতলতা ও উষ্ণতার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যে কোন স্থানের উষ্ণতা বা আর্দ্রতার (temperature) পরিমাণ—সেই স্থানের উচ্চতার উপর নির্ভর করে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অনেকটা আব-হাওয়ার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ পর্ব্বতমালা বেষ্টিত এবং অরণ্যময় স্থানে ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ স্বভাবতঃ অধিক হইয়া থাকে। যেখানেই কোন চাষ আবাদ আরম্ভ করা যাউক না কেন সেই স্থানের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বা উষ্ণতার পরিমাণ সম্বন্ধে একটু মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার।

যে কোন স্থানের উদ্ভিদ বা গাছপালা অন্য কোন স্বতন্ত্র স্থানে জন্মাইতে পারা যাইবে কি না তাহা তাহার আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়। যদি সেই স্থানের আবহাওয়া তাহার স্বাভাবিক জন্মস্থানের আবহাওয়ার অনুরূপ হয় তাহা হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য লাভের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ভিন্ন দেশের মাটি ও জলবায়ুর উপযোগী হওয়ার জন্য উদ্ভিদগণ নিজেদের দেহে নানা পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া লয়। তবে একই গাছ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে জন্মিলে বিভিন্ন আকার ও গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বীজোৎপন্ন গাছের পক্ষে এইটি বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দেহাংশজ বংশ বিস্তারে এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা না গেলেও ফুল ফল প্রসব করে না—বাঁচিয়া থাকে মাত্র।

ভুমি কর্ষণ ও জমি প্রস্তুত

জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি বা উহা বজায় রাখিবার জন্য কর্ষণের আবশ্যক। জমি সুকর্ষিত হইলে মৃত্তিকাস্থ মৌলিক উপাদান সমূহ সূর্য্যকিরণে আকর্ষিত ও নষ্ট হইতে পারে না। সুকর্ষণ দ্বারা জমির অনেক দোষ বিদূরিত হইয়া প্রাকৃতিক গুণ সমূহের উন্নতি হইয়া থাকে। যে জমিতে যে কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে সেই জমি সেই কৃষির প্রকৃতি অনুসারে কর্ষণ করা আবশ্যক, ফলচাষ বা বৃহৎ জাতীয় উদ্ভিদের জন্য জমি খুব গভীর করিয়া কর্ষণ করা দরকার। সুবিধা না থাকিলে জমির সমস্ত স্থান কর্ষণ না করিয়া যে স্থানে চারা বা কলম রোপণ করা হইবে সেইস্থানে কিছু গভীর ও প্রশস্ত করিয়া কর্ষণ করা যাইতে পারে। যে স্থানে গাছ বসান হইবে সে স্থানের মাটি গাছের আকার অনুযায়ী খুঁড়িতে হইবে।

চারাগাছের কচি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড়গুলি শক্ত মাটি ভেদ করিয়া রস গ্রহণ করিতে পারে না, এজন্য মাটি এরূপ আলগা ও ঝুরা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় যেন শিকড় অনায়াসে রস গ্রহণার্থ মাটির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। জমি প্রস্তুত করিবার সময় নালা বা পগার রাখা ফলের জমির সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় বিষয়। ড্রেন বা নালা রাখিবার কারণ, জমি হইতে অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া এবং আবশ্যক মত জল ক্ষেত্রে আনয়ন

করা। যেখানে এইরূপ নালার সুবন্দোবস্ত নাই তথায় জমি হইতে জল বাহির হইতে না পারায় জল বসিয়া মাটিতে অম্লরসের সঞ্চার করে। জমি প্রস্তুত করিবার সময় লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া, সার দেওয়া, নালা ও জলের বন্দোবস্ত রাখা বিশেষ আবশ্যক।

সাররে কথা *

মাটির মধ্যে এমন কোন দ্রব্য মিশ্রিত আছে যাহা উদ্ভিদগণ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যবান, পুষ্ট ও ফলবান হইয়া থাকে এবং সে জিনিষ না পাইলে গাছ উপযুক্তরূপে বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। উদ্ভিদের এই খাদ্যের নামই সার। উদ্ভিদগণ মাটি হইতে ক্রমাগত উহা গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে, এজন্য যে কোন জমিতে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী খাদ্য চিরকাল বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। মাটিতে উদ্ভিদের এই খাদ্যাংশ কমিয়া গেলে কৃত্রিমভাবে উহা প্রয়োগ দ্বারা সারের অভাব পূরণ করিতে হয়।

উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য তিনটী যথা ঃ—(নাইট্রোজেন, (২) ফস্ফরাস, (৩) পটাশ। ইহা ব্যতীত উহারা আরও অনেক পদার্থ মাটি ও বায়ু হইতে গ্রহণ করে; সেগুলি উদ্ভিদের গৌণ খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইলেও অপরিহার্য্যরূপেই প্রয়োজন। এই গৌণ খাদ্যের মধ্যে চৌদ্দটি অন্যতম। (১) ক্যালসিয়াম, (২) ম্যাগনেসিয়াম, (৩) গন্ধক, (৪) ম্যাঙ্গানীজ, (৫) দস্তা, (৬) বোরণ, (৭) তাম্র, (৮) লৌহ, (৯) কার্ব্বণ, (১০) ক্লোরিণ, (১১) অক্সিজেন, (১২) হাইড্রোজেন, (১৩) এলুমিনিয়াম, (১৪) সোডিয়াম। এই

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে গ্রন্থকার প্রণীত **"সারের ব্যবহার"** নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

উপাদানগুলি বায়ুমণ্ডল ও মাটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এগুলির অভাব উদ্ভিদের প্রায় ঘটে না। উদ্ভিদের বায়ুমণ্ডল হইতে কার্ব্বনিক এ্যাসিড, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন, এবং মাটি হইতে ফস্ফরাস, পটাশ, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, জিপসাম, ম্যাগ্নেসিয়াম, সালফার, লৌহ, ক্লোরিণ প্রভৃতি উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রধান খাদ্যের মধ্যে নাইট্রোজেনই ইহাদের অধিক আবশ্যক হয় এবং এই তিনটি খাদ্যই ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে।

নাইট্রোজেন সার গাছের শারীরিক গঠন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পটাশ— গাছের খাদ্যাংশ বা রস উদ্ভিদের শরীরের চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া থাকে, ফস্ফরাস—গাছের ফুল-ফল ধরিবার পক্ষে সহায়তা করে। মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের ভাগ কম থাকিলে গাছ শাখা-প্রশাখা ও পত্র পল্লব বিরল এবং রুগ্ন হইয়া থাকে; পটাশের ভাগ কম থাকিলে গাছের অস্থিমজ্জা পুষ্ট না হওয়ায় বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতে পারে না; ফস্ফরাসের ভাগ কম থাকিলে গাছে ফুল, ফল আসে না এবং ফল যাহাও ধরে তাহা ক্ষুদ্র ও রুগ্ন হয় এবং পাকিতে বিলম্ব হয়।

বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন দ্রব্য হইতে আমরা সার পাইয়া থাকি। উহাকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। (১) উদ্ভিজ্জ সার, (২) প্রাণিজ সার, (৩) খনিজ সার, (৪) মৃত্তিকা সার, (৫) মিশ্রিত সার (হিউমাস, কম্পোষ্ট বা স্লাজ) ও (৬) রাসায়নিক সার।

উদ্ভিজ্জ সার—আম, জাম, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা, পল্লব ও পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া কোন গর্ত্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাতে জল ও অল্প চূণ ছড়াইয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। ইহা প্রয়োগে মাটি আল্গা ও হাল্কা হয়। হাপোরে কোন বীজ অঙ্কুরিত করিতে এরূপ সারযুক্ত মাটির বিশেষ আবশ্যক হয়।

শণ, ধঞ্চে, বরবটী, অড়হর প্রভৃতি শুঁটি জাতীয় গাছের চাষ দ্বারা জমি উর্ব্বর করা চলে। জমিতে ইহাদের বীজ ছড়াইয়া চারা বড় হইলে ফুল ধরিবার পূর্ব্বে গাছ সমেত জমিতে লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি প্রস্তুত করিলে উহা পচিয়া বৃক্ষের সাররূপে পরিণত হয়। এই সমস্ত গাছের শিকড়ে গাঁইটের মত স্ফীত অবস্থায় একপ্রকার নাইট্রোজেন জীবাণু বাস করে; উহারা বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উহাতে সঞ্চিত রাখে।

উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে খইল অন্যতম। সরিষা, রেড়ি, তিল, তিসি, তূলা, মহুয়া ও নিম্ব প্রভৃতি বিভিন্ন তৈল বীজ হইতে খইল পাওয়া যায়। এই খইল চূর্ণ করিয়া উহার সহিত সমপরিমাণে শুষ্ক গোবর মিশ্রিত করিয়া জমি প্রস্তুত করিবার সময় ছড়াইয়া দিতে হয়। খইল পচাইয়া ইহার তরল সার প্রয়োগ করিলে, বৃক্ষাদি উহা শীঘ্র গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফস্ফরাস বিদ্যমান আছে।

কাঠের ছাই বেশ উৎকৃষ্ট সার, ইহাতে পটাশের ভাগ বিদ্যমান আছে। ইহা প্রয়োগে মাটির যৌগিকাকর্ষণ অতি

সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ইহা ভিজা অপেক্ষা শুষ্ক অবস্থায়, জমি প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রত্যেক গাছেরই পটাশ সার আবশ্যক হয়। তবে কতকগুলি বিশিষ্ট ফসলের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক।

প্রাণিজ সার—সমুদয় প্রাণিগণের অস্থি, চর্ম্ম, মাংস প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সার। কোন জীবজন্তু মরিয়া গেলে তাহা বৃথা নষ্ট না করিয়া কোন গর্ত্তের মধ্যে পুতিয়া রাখিলে উহা উত্তম সাররূপে পরিণত হয়। গর্ত্তের মধ্যে উহাদের দেহ ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর অল্প চূণ ছড়াইয়া মাটি চাপা দিতে হয়।

কোন মৃত জীবজন্তুর অস্থি জমিতে প্রয়োগ করিলে ইহা অধিককাল জমিতে বর্ত্তমান থাকিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। অস্থি অধিক চূর্ণ করিয়া জমিতে দিলে উহা অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে বৃক্ষাদি গ্রহণ করিতে পারে; অস্থি অল্প চূর্ণ বা আস্তভাবে প্রয়োগ করিলে উহা বৃক্ষাদির উপকারে আসিতে বহু সময় লাগে। ফল গাছে ধূলায় ন্যায় চূর্ণ অস্থি (Bone dust) প্রয়োগ না করিয়া অস্থিখণ্ড (Bone meal) প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। ইহার মধ্যে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস এবং অল্প চূণ বিদ্যমান থাকে। যে মাটিতে কার্ব্বন বা অঙ্গারক পদার্থ কম থাকে তাহাতে অস্থি সার প্রয়োগে কোন সুফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। কার্ব্বন বা কার্ব্বনিক এ্যাসিডের অভাবে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট না গলিয়া জমাট বাঁধিয়া যায়, ইহাতে বৃক্ষাদির বিশেষ ক্ষতি হয়।

পোড়া অস্থিচূর্ণ সালফিউরিক এ্যাসিড বা গন্ধক দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সুপার ফস্ফেট অফ লাইম প্রস্তুত করা হয়। ইহা জলের সহিত মিশাইতে পারা যায় এবং শীঘ্র ফসলের উপকারে আসে।

কোন জীবজন্তুর মাংস, শৃঙ্গ প্রভৃতি পাইলে উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। যে মৃত্তিকা স্বভাবতঃ অধিক আল্‌গা এবং যাহার তাপ বেশী, তাহাতে শৃঙ্গচূর্ণ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

রক্ত অতি উত্তম সার, ইহা শুষ্ক এবং কাঁচা বা তরল অবস্থায় জমিতে প্রয়োগ করা চলে, ফল-বৃক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক। কাঁচা রক্তের সহিত চূণ মিশাইয়া রাখিলে তাহা জলে গুলিয়া আবশ্যক মত ব্যবহার করা চলে। কোন পাত্রে কাঁচা রক্ত ধরিয়া তাহাতে চূণ প্রয়োগ করিয়া পাত্র মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। কাঁচা রক্তের সহিত ১০ গুণ জল মিশাইয়া ফলের জমিতে ব্যবহার করিলে উহা বৃক্ষাদির সত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস প্রভৃতি সার বিদ্যমান আছে। বেলে জমিতে ইহা অধিক কার্য্যকরী।

পচা বা শুঁটকী মাছে নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফস্ফরাস সার থাকে। ইহা পচাইয়া বা মাটিতে পুতিয়া সাররূপে ব্যবহার করা চলে। ফল-বৃক্ষে মৎস্য সার বেশ কার্য্যকরী।

প্রাণী বা জীবজন্তুগণের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই প্রাণিজ-সার। গোবর ইহাদের মধ্যে অন্যতম। গোবরে

উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী যথেষ্ট পদার্থ বিদ্যমান আছে। গোবর পচাইয়া শুষ্ক করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া উহা সাররূপে পরিণত হইলে জমিতে ব্যবহার করা চলে। গোবর সার প্রয়োগে কেবল সারের কাজ হয় না, ইহা মাটির অনেক দোষ নষ্ট করিয়া থাকে, ইহা পচাইলে শীঘ্রই বৃক্ষাদির গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে। গরুর ন্যায় মহিষ, মেষ, ঘোটক, ছাগল, পায়রা প্রভৃতি পশু পক্ষীর নাদি এবং মানুষের বিষ্ঠা পচাইয়া বা মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া সাররূপে ব্যবহার করা চলে।

পশু বা পক্ষাদি ও মনুষ্য মূত্রও সাররূপে ব্যবহার করা চলে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট সার। দশগুণ জলের সহিত ইহা মিশাইয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

খনিজসার :—খনিজসারের মধ্যে সোরা, লবণ ও চূণ প্রধান।

সোরা আমাদের দেশে অনেক স্থানে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সোরা ছাইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। সোরা জমিতে প্রয়োগ করিবার পরই জল সেচন করিতে হয়। সর্ব্বপ্রকার সারের মধ্যে ইহা শীঘ্র কার্য্যকরী। ইহা অধিক প্রয়োগ করিলে জমির স্বভাব খারাপ হয়।

সমুদ্রের জল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। সমুদ্র বা তৎসংযুক্ত নদ নদী প্রভৃতির সন্নিহিত স্থান সমূহে অনেক সময়ে মাটির উপর লবণ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়।

বীট পালম প্রভৃতি শাকে এবং লেবু, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছে লবণ উপকারী।

লবণ নিজে ঠিক সার না হইলেও ইহা মাটির অনেক দোষ নষ্ট করে। ইহা মাটিকে আলগা করে, মাটিকে জল শোষণে সহায়তা ও যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা রসাকর্ষণে মাটিকে সরস রাখে এবং মৃত্তিকামধ্যস্থ অদ্রবণীয় খাদ্যসমূহকে গলাইয়া সত্বর বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী করিয়া থাকে। ইহা অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে জমি খারাপ হইয়া যায়।

মৃত্তিকা সার ঃ—বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকাও সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। পাঁক মাটি, পলি মাটি ও পোড়া মাটি সার হিসাবে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

হিমচা, কলমী, কাঁচড়া প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ এবং মৎস্যাদি জলজন্তুগণের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পুষ্করিণীতে পাঁক জন্মে; ফলের জমিতে এই পাঁক সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। পাঁকের সহিত কিছু অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সদ্য পাঁক মাটি প্রয়োগ না করিয়া উহা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় জমিতে প্রয়োগ করা উচিত।

নদীর চর বা পলি মাটি সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। সব্জীচাষে এই মাটি বেশ উপযোগী। পোড়া মাটিও সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে, পুরাতন দেওয়ালের ভিটামাটি বা পোড়া মাটি সব্জীক্ষেত্রের উত্তম সার।

মিশ্রিত সার :—ইহা কৃষিক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার। ইহাকে Complete manure বলা চলে। ইহাতে ঘর ঝাঁটান ওচলা, গোশালার আবর্জ্জনা, গৃহপালিত পশু পক্ষীর মৃতদেহ, বিষ্ঠা এবং মানুষের পরিত্যক্ত যত কিছু দ্রব্য আছে সমস্তই ইহার মধ্যে থাকে। কলিকাতার প্রতি গৃহস্থবাটীর যাবতীয় আবর্জনা গলির মোড়ে প্রতিদিন জমা হয় এবং তথা হইতে ঘোড়া বা মোষের গাড়ী বা লরী বোঝাই করিয়া ধাপার মাঠে চলিয়া যাইতেছে। এই আবর্জনার মধ্যে সারের যাবতীয় উপাদান পাওয়া যায়। এগুলি পচিয়া শ্রেষ্ঠ সারে পরিণত হইয়া থাকে ও তথায় ইহা কাজে লাগান হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে ইহা বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। এই আবর্জনা কাজে লাগাইতে হইলে কোন গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে এগুলি প্রোথিত করিতে হয়। ২।১ বৎসরের মধ্যে ইহা পচিয়া মাটির আকারে পরিণত হয়। ইহা গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিলে গাছের খুব তেজ হয় এবং গাছ অধিক ফল-ফুল প্রসব করিতে সমর্থ হয়।

সালফেট অফ এমোনিয়া :—ইহার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। ইহাতে শতকরা ১৯।২০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। জমিতে চূণের অংশ না থাকিলে ইহার ক্রিয়া সুবিধাজনক হয় না। সদ্য চূণের সহিত ইহার প্রয়োগে এমোনিয়ার গুণ নষ্ট হয় এজন্য এই সার জমিতে প্রয়োগ করিবার প্রায় একমাস পূর্ব্বে মাটিতে চূণ মিশাইতে হয়। ইহা দ্রুত কার্য্যকরী নয়। মাটির মধ্যে থাকিয়া ইহা ধীরে ধীরে

কার্য্য করে, এজন্য গাছ লাগাইবার কিছু পূর্ব্বে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

নাইট্রেট্ অফ সোডা :—ইহারও উপাদান নাইট্রোজেন। ইহাতে শতকরা ১৫।১৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। ইহা অতি দ্রুত কার্য্যকরী। কোন ফসল লাগাইবার পর ইহা প্রয়োগ করা চলে, বর্ষাকালে ইহা প্রয়োগ করা অনুচিত।

নাইট্রেট্ অফ পটাস :—ইহার উপাদান নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম। ইহাতে শতকরা ১০ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩০ ভাগ পটাস থাকে, ইহা জমিতে প্রয়োগ করিবার সময় জল-সেচন করিতে হয়। ইহা গাছের গায়ে লাগিলে গাছ জ্বলিয়া যায়।

সালফেট্ অফ পটাস :—ইহাতে শতকরা ২৫।২৬ ভাগ পটাস থাকে।

অস্থিচূর্ণ :—ইহাতে শতকরা ২১ ভাগ ফস্ফরাস ও ৪-৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। মূলজাতীয় ফসলে বা সব্জীতে ও ফলের জমিতে ইহা অধিক কার্য্যকরী।

রক ফস্ফেট :—ইহাতে ৩০ ভাগ ফস্ফরাস থাকে। এজন্য জমি প্রস্তুত করিবার সময় ইহা প্রয়োগ করা উচিত।

সুপার ফস্ফেট :—ইহাতে শতকরা ২০।২১ ভাগ ফস্ফরাস থাকে। ইহা দ্রুত কার্য্যকরী, এজন্য গাছ লাগাইবার পর ইহা প্রয়োগ করা চলে।

চারা গাছের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্য প্রথমে নাইট্রোজেন সার বেশী ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু গাছ বড় হইলে নাইট্রোজেন সারের অপেক্ষা পটাস্ ও ফস্ফরাস সারই গাছের অধিক প্রয়োজন হয়। কারণ নাইট্রোজেন সারে গাছের কাষ্ঠভাগ ও পত্রাদির বৃদ্ধি ঘটায় কিন্তু ফল ধরিতে সাহায্য করে না। সাধারণতঃ একই সময়ে গাছের উক্ত তিনটি বা দুইটি বা একটিরও অভাব হইতে পারে। ইহার মধ্যে নাইট্রোজেন ও পটাসের অভাব হইলে সহজেই গাছের চেহারা দেখিয়া ধরা যায়। কারণ এই দুইটি জিনিষের অভাব হইলে পাতার সবুজ বর্ণের অভাব হয় এবং গাছের বৃদ্ধি কমিয়া যায়। এমোনিয়াম সালফেট ও সালফেট অব পটাস প্রদান করিয়া সহজেই এই দ্রব্য দুইটির অভাব পুরণ করা যায়। কিন্তু ফস্ফেটের অভাব হইলে অত সহজে ধরা পড়ে না এবং ধরা পড়িবার পূর্ব্বে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকে, কারণ ফল ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া যায় কিন্তু কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন ধরা পড়ে তখন হয়তো সংশোধন করিতে অত্যন্ত দেরী হইয়া যায়; সেজন্য ফল চাষে এই সারের দিকে এরূপ নজর রাখিতে হয়, যাহাতে গাছ যেন কোন দিনই এই সারের অভাব অনুভব করিতে না পারে।

সাধারণতঃ ফসফেট্ অভাবে গাছের নিম্নলিখিত অবস্থা বিপর্য্যয় হইয়া থাকে।

(ক) নব পত্র মুকুল প্রসবে বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে।

পার্শ্বমুকুল সকল মরিয়া যাওয়ায় অত্যন্ত কম সংখ্যায় মুকুল জন্মায় ও মুকুল যাহা হয় তাহাও বড় দুর্ব্বল ও ছোট হয়।

(খ) পাতাগুলি বিশেষ প্রকারের বৈশিষ্ট যুক্ত দেখা যায়। পাতার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হয় এবং মাত্র শাখার প্রান্তভাগে ক্ষুদ্রাকৃতি পত্র দেখা যায়।

(গ) পাতার গায়ে বর্ণবৈশিষ্টও হইয়া থাকে। পার্পল ও ব্রঞ্জ আভাযুক্ত দাগ সকল পাতার উপর প্রকাশ পায় ও পাতাগুলির উক্ত অংশ সকল শেষ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়।

(ঘ) যে সমস্ত গাছে ফস্‌ফেট্‌ সার কম পড়ে প্রথম বৎসর তাহাদের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইলেও পরবর্ত্তী বৎসর হইতে বৃদ্ধি অত্যন্ত কমিয়া যায়।

(ঙ) স্বাভাবিক অবস্থায় পাতা ঝরার অনেক পূর্ব্বে গাছের অধিকাংশ পাতা ঝরিয়া পড়ে ও সময় মত নূতন পত্রের উদ্ভবও হয় না।

(চ) গাছের ফল সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং সুগন্ধ, বর্ণ ও আকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

এই জন্য ফল বাগানে ফস্‌ফেট্‌ ভাগ কম হওয়া খারাপ ও শোচনীয় ঘটনা।

বহু পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বোনমিল ও সুপার ফস্‌ফেটের একত্র মিশ্র ব্যবহারে গাছের খুবই উপকার হয়। উক্ত দুই প্রকার সার সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া গাছের

ডালপালার প্রয়োজন অনুয়ায়ী ৭—১০ পাঃ গাছ প্রতি ব্যবহার করিতে হয়। যে মৃত্তিকা অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির, শুষ্ক, কঠিন ও প্রস্তরবৎ হইয়া উঠে তাহাতে সমান অংশে দুই সার মিশ্রিত না করিয়া বোনমিল ২ ভাগ উক্ত অংশে ব্যবহার করিতে হয়, কারণ সুপার ফস্‌ফেট্‌ মৃত্তিকাকে কঠিন করিয়া তোলে।

বীজ নির্বাচন ও চারা প্রস্তুত

বীজ নির্ব্বাচনের উপরেই গাছের ফলাফলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কোন নিকৃষ্ট বীজের গাছের ফল নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট বীজের গাছের ফল উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ক্রমোন্নতি বা উৎকর্ষ সাধনের প্রধান উপায় বীজ নির্ব্বাচন। কোন একটি উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও নীরোগ বীজ বপন করিয়া যত্ন ও পরিচর্য্যা দ্বারা তাহা পোষণ পূর্ব্বক তজ্জাত উৎকৃষ্ট বীজ বপনে যে ফল পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে বীজ নির্ব্বাচন ও পৃথকীকরণ দ্বারা চারা জন্মাইলে তাহা হইতে নূতন জাতির সৃষ্টি হইতে পারে। দীর্ঘজীবী উদ্ভিদে এরূপ পরীক্ষার ফল শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অল্পজীবী উদ্ভিদে উহার ফলাফল শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

বংশানুক্রম বা বংশধারা বজায় রাখিবার জন্যই বীজের জন্ম। এই বীজের মধ্যেই ভাবী উদ্ভিদ ভ্রূণ অবস্থায় অতি সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে এবং অনুকূল অবস্থা পাইলেই উহা অঙ্কুরিত হইয়া উদ্ভিদ আকারে প্রকাশ পায়। এইভাবে উৎপন্ন চারাই স্বভাবিক, অন্য যে কোন উপায়ে বা কৌশলে বৃক্ষের বংশরক্ষা বা চারা উৎপাদিত হইলে তাহা কৃত্রিম, এজন্য কলমের দ্বারা উৎপাদিত চারা কৃত্রিম।

বীজ ও কলমের গাছের পার্থক্য ও গুণাগুণ

কলমের গাছ ও বীজের গাছের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আজকাল সকলেই কলমের গাছেরই অধিক পক্ষপাতী, ইহার কারণ কলমের গাছ অধিক দীর্ঘ হয় না এবং ইহার গাছে শীঘ্র ফল ধরে, অধিকন্তু ইহার ফল সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়তা থাকে। কিন্তু বীজের গাছের ফল তাহার মাতৃবৃক্ষের অনুরূপ হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে। অধিকাংশ ফলবান বৃক্ষের বীজের চারা সকল সময়ে বা সকল স্থানে স্বীয় জাতিগত প্রকৃতি বা গুণ রক্ষা করিতে না পারিয়া প্রকারান্তর প্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক জন্মভুমিতে আঁটির গাছের ফল সাধারণতঃ মাতৃবৃক্ষের ফলের অনুরূপ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্থানান্তরে নীত হইলে স্থানীয় মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া ফলের গুণেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়, যেমন— মালদহের কোন উৎকৃষ্ট আমের আঁটি লইয়া গিয়া মাদ্রাজে রোপণ করিলে কিংবা বোম্বাইএর কোন উৎকৃষ্ট আমের আঁটি আনিয়া এখানে রোপণ করিলে জলবায়ু ও মৃত্তিকার পরিবর্ত্তন ঘটার জন্য ফলের গুণেও তারতম্য ঘটা সম্ভব। আবার পরাগ সঙ্গম ক্রিয়া দ্বারাও উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল নিকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জাতীয় ফল উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। কোন উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র বৃক্ষের বাগানে যেমন একটি নিকৃষ্ট জাতীয় বৃক্ষ রোপণ

করিলে সংসর্গ ও পুষ্প পরাগ সঙ্গম দ্বারা তাহার বীজের উৎকর্ষতা লাভ ঘটা স্বাভাবিক। সেইরূপ নিকৃষ্ট জাতীয় বৃক্ষের সংসর্গে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের আম্র বীজও নিকৃষ্ট গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে।

আঁটির গাছ পার্শ্বদেশ অপেক্ষা ঊর্দ্ধভাগে বৃদ্ধি পাইবার প্রয়াস পায়, কিন্তু কলমের গাছ ঊর্দ্ধে অপেক্ষা পার্শ্বভাগেই অধিক বিস্তৃত হইয়া থাকে। কলমের গাছের ২৫।৩০ বৎসরের অধিক কাল পূর্ণোদ্যমে ফল দিবার শক্তি থাকে না, কিন্তু আঁটির গাছের দীর্ঘপরমায়ুর জন্য উদ্যানকের ২।৩ পুরুষকে পূর্ণ তেজে ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কলমের গাছ অল্পেই রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং যথেষ্ট যত্ন ও পরিচর্য্যা না করিলে গাছের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কলমের গাছ অপেক্ষাকৃত অল্পস্থান এবং আঁটির গাছ অধিক স্থান অধিকার করিয়া থাকে।

কলমের উদ্দেশ্য ও প্রকার ভেদ

যে কোন এক দেশের আবহাওয়ায় পরিবর্ত্তিত উদ্ভিদ্ অন্য কোন স্বতন্ত্র দেশে স্থানান্তরিত হইলে উহাদের প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। বীজ বা বীজের গাছের প্রকৃতি অতি পরিবর্ত্তনশীল। যে কোন স্বভাব বা গুণ সম্পন্ন কোন বীজ বা উহার চারা কোন ভিন্ন আবহাওয়াযুক্ত স্থানে নীত হইলে উহা পূর্ব্বের প্রকৃতি বা জাতিগত গুণ বজায় রাখিতে পারে না। বীজের গুণ উহা যে মাটিতে রোপিত হইবে সেই স্থানের আবহাওয়া বা প্রকৃতির উপযোগী হইবে। এজন্য বীজের গাছের ফলাফল সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না, কিন্তু কলমের গাছ সাধারণতঃ তাহার জাতিগত গুণ বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। হয়ত উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্য্যার অভাবে উহার আকৃতির একটু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইলেও উহার ভাবী ফলের মধ্যে সেই জাতিগত গুণ বিদ্যমান থাকে। এজন্য কোন ফল বা ফুলের গাছ স্বতন্ত্র স্থান হইতে আমদানি করিতে হইলে কলমের গাছ আনাই শ্রেয়ঃ।

আজকাল বহু বিভিন্ন উপায়ে কলম প্রণালী বা কলম প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই কলম প্রস্তুত প্রণালী দুইটী বিশিষ্ট নিয়মের অন্তর্গত। (.) বীজোৎপন্ন চারার সহিত অন্য কোন উৎকৃষ্ট গাছের শাখা ও তাহার কোন অংশের সংযোজন দ্বারা ও (২) দেহাংশজ—যে কোন নির্ব্বাচিত গাছের কোন অংশ দ্বারা। জোড় কলম, চোখ কলম বা জিব

কলম প্রথম প্রণালীর অন্তর্গত এবং ডাল কলম, দাবা কলম ও গুল কলম দ্বিতীয় প্রণালীর অন্তর্গত।

সকল গাছের কলম হয় না। উদ্ভিদ্ মাত্রেই কেহ না কেহ একবীজদল বা দ্বিবীজদলের অন্তর্ভুক্ত। একবীজদল উদ্ভিদ্ মাত্রেই অন্তর্ব্বর্দ্ধক এবং দ্বিবীজদল উদ্ভিদ্ মাত্রেই বহির্ব্বর্দ্ধক হইয়া থাকে। অন্তর্ব্বর্দ্ধক শ্রেণীর বৃক্ষাদির পত্র লম্বমান ও উহার অগ্রভাগ সরু। এই শ্রেণীর পত্র শুষ্কাবস্থায় গাছ হইতে সহজে খসিয়া পড়ে না। তাল, নারিকেল, সুপারী, খেজুর, কলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। ইহাদের কলম হয় না।

বহির্ব্বর্দ্ধক শ্রেণীর উদ্ভিদের পত্র অন্তর্ব্বর্দ্ধক শ্রেণীর উদ্ভিদের ন্যায় সরু ও লম্বা নহে এবং ইহাদের পত্র ও কাণ্ডের শিরা সকল অন্তর্ব্বর্দ্ধক শ্রেণীর পত্রের ন্যায় সরল নহে। ইহাদের পত্রস্থ শিরা সমূহ অসরল এবং পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। আম, জাম, লিচু, সপেটা, কাঁটাল, বেল প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সাধারণতঃ অধিকাংশ বহির্ব্বর্দ্ধক শ্রেণীর উদ্ভিদের কলম হইয়া থাকে।

কলম প্রস্তুত

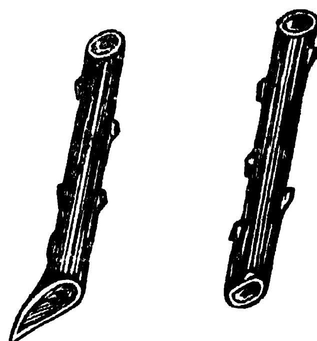
প্রায় ২০০০ হাজার বৎসরের অধিক কাল হইতে কলম প্রস্তুত প্রণালী চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রথমে কোথায় বা কাহারা প্রচলিত করে তাহা এখনও রহস্যাবৃত। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা কোন এক অসাধারণ পুরুষের দ্বারাই সম্ভব, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে মাতৃ অংশ ও মূলজ অংশ সম্পূর্ণ পৃথক অথচ তাহাদের মিলনে এক একটি সুস্বাদু মনোমত ফলের কলম সৃষ্টি হইয়াছে, যথা, ক্ষিরণীর (মূলজ) সহিত সপেটার (মাতৃজ) মিলনে সপেটার কলম উদ্ভব ইত্যাদি এবং এই মিলন সংঘটন মনুষ্য দ্বারাই সম্ভব, যাহা হউক বর্ত্তমানে কলম প্রস্তুত প্রণালী সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

কতকগুলি কলম প্রস্তুত-প্রণালী দেওয়া হইল :—

শাখা বা ডাল কলম (Cutting)—বৃক্ষের শাখা হইতে উৎপন্ন কলমকে শাখা-কলম বলা হয়। কোমল ও সরল শাখা বিশিষ্ট গাছে ডাল-কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সমস্ত গাছের শাখা কঠিন এবং যে সমস্ত গাছ হইতে ঘন রস বা আটা নির্গত হয় তাহাতে শাখা-কলম উৎপন্ন হয় না।

শাখা-কলম প্রস্তুত করিতে হইলে কোন ছায়া বিশিষ্ট শীতল স্থানে হাপোর বা চৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে। কোন বৃক্ষের ছায়ায় বা রৌদ্রযুক্ত স্থানে হাপোর করিলে বর্ষায় টোপা জল ও রৌদ্র হইতে হাপোরের গাছগুলিকে বাঁচাইবার জন্য উহার উপর ছই বা দরমা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং ঠাণ্ডার সময় উহা উন্মুক্ত

রাখা দরকার। এই চৌকা দৈর্ঘ্যে ৪।৫ হাত করা যাইতে পারে কিন্তু প্রস্থে ৩ হাতের বেশী রাখা উচিত নয়। প্রথমে উপর্য্যুক্ত আকারের সমস্ত জমির মাটি প্রায় দেড় হাত গভীর করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। চৌকার নীচে সমস্ত ঝামা, ইট প্রভৃতি প্রায়



আধ হাত উচ্চ করিয়া বিছাইয়া তাহার উপর ৪।৫ অঙ্গুলি আন্দাজ পুরু করিয়া এঁটেল মাটি প্রয়োগ করিয়া বাকী সমস্ত স্থান

২ ভাগ	সূক্ষ্ম বালি
১ ভাগ	পাতাসার
১ ভাগ	দোআঁশ মাটি

দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। কিছু পুরাতন গোবর ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। এই মাটি যেন ধূলার ন্যায় চূর্ণ হয় এবং ইহাতে কোন ঢেলা বা কাঁকর না থাকে। হাপোরের জমি যাহাতে সর্ব্বদা সরস থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

দাবাকলম (Layering)

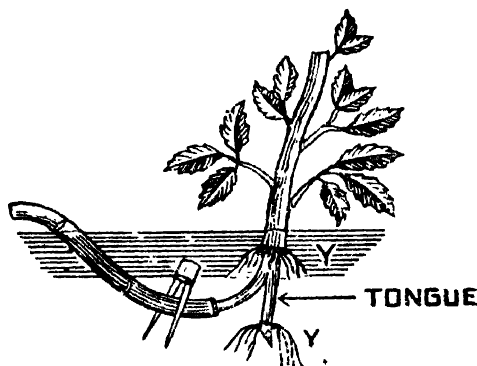
আষাঢ় শ্রাবণ মাসই দাবাকলম প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। দাবা কলম প্রস্তুত করিতে গেলে নির্ব্বাচিত শাখার ত্বকের চতুষ্পার্শ্বে ছুরি দ্বারা গোল ভাবে দাগ দিয়া তাহার ২ ইঞ্চি পরিমাণ উপরেও এইভাবে দাগ দিয়া সেই স্থানের ছাল আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, পরে সেই ডালটী শায়িত করিয়া উহার উপর ৩।৪ ইঞ্চি পুরু করিয়া মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে। যে গাছের দাবা কলম প্রস্তুত করা হইবে উহার শাখা যদি শক্ত হয় তাহা হইলে মাটি চাপা দিলেও উহা উপরে



উঠিয়া আসিবার প্রয়াস পাইবে। এজন্য শাখার মাটিচাপা দেওয়া স্থানের উপর বড় ইষ্টক চাপাইয়া রাখিলে উহা আর উঠিতে পারিবে না। বাঁশের কঞ্চি ২।৩টী পর্ব্ব বা গাঁট সমেত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উহার মধ্যস্থলে চিরিয়া শায়িত দাবার ডালে উহা প্রবেশ করাইয়া মাটিতে পুতিয়া দিলেও উহা আর

উপরে ঠেলিয়া উঠিতে পারিবে না। শাখা মাটি হইতে অধিক উচ্চে থাকিলে উহা মাটিতে হেলাইবার সুবিধা হয় না, উহাতে গাছে চাড় পড়ে।

এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্তিকা-পূর্ণ টব যথাস্থানে রাখিয়া কলম করা যাইতে পারে। সচরাচর ২।৩ সপ্তাহ মধ্যে দাবা কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে গুচ্ছভাবে শিকড় বহির্গত হয়। কলম প্রস্তুত হইলে শিকড়ের নীচে হইতে কাটিতে হয়। প্রথমে



উহা একেবারে না কাটিয়া একটা 'ছে' দিয়া বা সিকি অংশ কাটিয়া রাখিতে হয়। ২।১ সপ্তাহ পরে সমুদয় অংশ কাটিয়া শাখাটীকে পৃথক করিয়া কোন ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোরে লাগাইতে হয়। দাবা কলম যে যে প্রকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহা চিত্রে দেখান হইল।

গুল বা গুটী কলম

(Gootee or Ball Grafting)

কঠিন কাষ্ঠ বিশিষ্ট গাছের গুটী কলম বাঁধা যাইতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত গাছের আটা অতিরিক্ত ঘন তাহাদের গুটী কলমে সহজে চারা জন্মাইতে পারা যায় না।

অত্যন্ত সরু, রুগ্ন নূতন বা অধিক পুরাতন শাখায় কলম বাঁধা উচিত নয়। অর্দ্ধপরিপক্ক সুস্থ শাখাই গুল কলম বাঁধিবার



উপযুক্ত। মূল কাণ্ডের সবল ও ঈষৎ নতমুখী শাখা প্রশাখাতেই এই কলম ভাল হয়। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যেই শিকড় জন্মে এবং শীঘ্র ফল ধরে। গুল কলম প্রস্তুত করিতে হইলে নির্ব্বাচিত বৃক্ষের একটি সতেজ শাখা মনোনীত করিয়া কোন ধারাল ছুরির

দ্বারা ঐ শাখার উপযুক্ত কোন স্থানের ত্বকের চারি দিকে বেড় দিয়া দাগ দিয়া সেই দাগের দেড় বা দুই ইঞ্চি উপরে সেইরূপ ভাবে শাখাটিকে বেষ্টন করিয়া পত্র-গ্রন্থাদির নিম্নে আর একটি দাগ দিতে হইবে। পরে উভয় চিহ্নিত স্থানের মধ্যবর্ত্তী ত্বকখণ্ডকে আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিতে হইবে যেন কাষ্ঠে আঘাত না লাগে ও উভয় পার্শ্বস্থ পত্র-গ্রন্থি ছাড়াইয়া না উঠে। পরে ত্বকহীন স্থানটিতে দোআঁশ মাটি সমানভাবে চাপাইতে হইবে, যেন ফাঁক না থাকে। মাটি প্রায় একইঞ্চি পুরু করিয়া চাপাইয়া তাহার উপর নারিকেলের ছোবড়া বা মস (moss) দিয়া আচ্ছাদন করিরা উহা নারিকেলের দড়ি বা কলার পেটো দিয়া উত্তমরূপে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। বর্ষাকালেই এই কাজ করা দরকার, কারণ গুল কলম বাঁধিবার পক্ষে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কলম বাঁধিলে ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই কলম হইতে শিকড় বহির্গত হইয়া থাকে। গুলবাঁধা স্থানটি সর্ব্বদা সিক্ত রাখিতে হয় নতুবা শিকড় বহির্গত হইতে বাধা জন্মে। শিকড় বহির্গত হইলেই উহা না কাটিয়া আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা দরকার। বেশ ভালরূপে শিকড় বাহির হইলে গুটির নিম্ন হইতে কাটিয়া লইতে হয়। এই কাটিয়া লওয়া ক্ষত গুটি সহ্য করিতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য প্রথমবারে সম্পূর্ণরূপে না কাটিয়া তাহাতে একটা 'ছে' দিয়া সিকি অংশ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া রাখিতে হয়। যেন কলম বাঁধা স্থানে কোনরূপ আঘাত না লাগে। কয়েকদিন পরে দ্বিতীয় বারে কলম সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া

লইতে হইবে। উহা গাছ হইতে নামাইয়া আনিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোরে রাখিয়া উহাকে লালনপালন করিতে হয়। হাপোরে রাখিবার কালীন উহাদের পাতা অনেক সময় ঝরিয়া যায়, আবার নূতন পাতা উদ্গত হয়। অনেক কঠিন কাণ্ড-বিশিষ্ট ফলগাছের কলম গুল কলম দ্বারা উৎপন্ন করা চলে।

জোড় কলম (Inarching)

আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জোড় বাঁধিবার উপযুক্ত সময়। কোন বীজের চারার সহিত কোন উৎকৃষ্ট জাতীয় নির্ব্বাচিত গাছের শাখা পরস্পর সম্মিলন করতঃ চারা প্রস্তুত করাকে জোড় কলম বলে। জোড় কলম শীঘ্র শীঘ্র ফলবতী হইয়া থাকে। জোড় কলম প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে সেই জাতীয় গাছের বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া উহাকে টবে পালন করিতে হয়। চারা দুই বৎসরের বড় হইলে সতেজ চারার সহিত শাখার জোড় বাঁধা উচিত। শাখার যে স্থানে জোড় বাঁধা হইবে তাহা যেন চারার কাণ্ড অপেক্ষা মোটা না হয়। চারা অপেক্ষা শাখা মোটা হইলেও উহার জোড় লাগে বটে, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে রস জোগাইতে না পারায় উহা শীঘ্র শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মারা যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। চারার কাণ্ড শাখা অপেক্ষা অল্প মোটা হইলে কোন ক্ষতি হয় না। কোন বড় গাছে জোড় কলম বাঁধিতে হইলে টব সমেত চারাকে যেখানে কলম বাঁধিতে হইবে তথায়

ভালরূপে সংস্থাপন করা দরকার। আবশ্যক হইলে মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর উপযুক্ত স্থানে চারাটিকে বসাইয়া জোড় বাঁধা উচিত। টব ঠিক ভাবে না বসাইলে অথবা উহা নাড়া



পাইলে জোড় বাঁধা স্থানে চাড় পড়ে, ইহাতে কলম খারাপ হয়। চারার শেষ অংশে বা মস্তকের দিকে জোড় বাঁধা উচিত নয়। কারণ গাছের গোড়ার দিক সরু এবং মস্তক ভাগ মোটা ও ভারী হইলে অল্প ঝড়েও গাছ জখম হইবার সম্ভাবনা। জোড় বাঁধিবার সময় শাখা ও পোষক চারা দুইটি একত্র করিয়া কোন অংশ কাটিলে উহা পরস্পর ভালরূপে সম্মিলিত হইতে পারে তাহা দেখিয়া লইতে হয়। পরে শাখা ও চারার গাত্রে

৩।৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং (চারার) কাণ্ডের স্থূলতার সিকি হইতে এক তৃতীয়াংশ গভীর ভাবে কাষ্ঠের সহিত ছাল তুলিয়া ফেলিয়া উভয়ের অংশদ্বয়কে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া পাট, শণ বা কলার



ছোটা দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যেন সম্মিলিত কোন স্থানে কোন ফাঁক না থাকে এবং বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে না পারে। ইহার জন্য রজন ও তার্পিন তৈল একত্র মিশাইয়া অগ্নিতে গলাইয়া জোড় বাঁধা স্থানে ঘন ভাবে প্রলেপ দিতে হয়। প্রায় ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই ইহাদের জোড় লাগিয়া যায়। ভালরূপে জোড় বাঁধিবার বা উহা সম্মিলিত হইলে পর জোড় বাঁধা স্থানের উপরিভাগস্থ চারা গাছের মস্তক কাটিয়া ফেলিতে হয় এবং ২।১ সপ্তাহ পরে জোড় বাঁধা স্থানের নিম্নভাগস্থ শাখার এক চতুর্থাংশ স্থান কর্ত্তন করিতে হয় এবং ইহার ২।১ সপ্তাহ পরে উক্ত শাখাটীকে সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া দিতে হয়। এইরূপ ভাবে কর্ত্তন করায় বিশেষ সুবিধা আছে, ইহাতে গাছটী সহজে দুর্ব্বল হইয়া

পড়িতে পারে না। এইরূপে কলমটীকে স্বতন্ত্র করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে কিছুদিন পালন করিলে উহা জমিতে লাগাইবার উপযোগী হইয়া থাকে।

আজকাল সাধারণতঃ অধিক জোড় কলম বাঁধিবার জন্য অন্য ভাবে জোড় বাঁধা হইয়া থাকে। প্রথমে কোন ফলন্ত গাছের গোড়ায় বীজের চারা জন্মাইয়া চারাগুলি প্রায় এক বৎসরের বড় হইলে ফলন্ত বড় গাছের গোড়ায় চারিদিক হইতে একটু গভীর করিয়া মাটি তুলিয়া ফেলিয়া জল ঢালিয়া দিতে হয়, পরে উক্ত গাছটিকে হেলাইয়া চারার সহিত উহার জোঁড় বাঁধিয়া লওয়া হয়। জোড় লাগিয়া গেলে বা কলম বাঁধার কাজ শেষ হইয়া গেলে গাছটীকে পূর্ব্বের ন্যায় সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া গোড়ায় সার মাটি প্রয়োগ করা হয়। ২।৩ বৎসর ঐ গাছকে জিরান বা বিশ্রাম দিয়া পুনরায় উহার কলম বাঁধা হইয়া থাকে। এইভাবে প্রস্তুত কলমের গাছ সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় না।

চোক কলম (Budding)

ফাল্গুন-চৈত্র এবং আষাঢ় হইতে আশ্বিন এই কয় মাসই চোক কলম প্রস্তুত করিবার পক্ষে উপযুক্ত সময়। উদ্ভিদের প্রত্যেক পত্র গ্রন্থির ক্রোড়ে একপ্রকার পত্রকলিকা থাকে। এই পত্রকলিকা বা ভাবী শাখাই চোক নামে অভিহিত।

বড় গাছের শাখা এবং বীজের গাছেও চোক লাগান চলে, তবে বীজের গাছ যেন এক বৎসরের ছোট না হয়, বড় হইলে কোন ক্ষতি নাই। প্রথমে নির্ব্বাচিত ভাল জাতীয় গাছের শাখার পরিপুষ্ট চোক কিছু কাষ্ঠ ও ছাল সমেত ঈষৎ হেল্যাইয়া কলম কাটার মত করিয়া সাবধানে কাটিয়া তুলিয়া আনিয়া কোন পাত্রের উপর রাখিয়া জলের ছিটা দিয়া ভিজা কাপড় দিয়া



ঢাকিয়া দিতে হয়। পরে চারা গাছের শাখায় যেখানে চোক বসাইতে হইবে তথায় চোক কলম প্রস্তুতের ছুরি দিয়া ইংরাজী T অক্ষরের ন্যায় আঁক দিতে হইবে এবং ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা সাবধানে অতি ধীরে চিহ্নিত স্থানের শাখার ছাল তুলিয়া অল্প ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে চোকটিকে আস্তে আস্তে বসাইয়া দিতে হইবে, অনেক স্থানে T অক্ষরের ন্যায় দাগ না দিয়া শাখার যে স্থানে চোক লাগাইতে হইবে তথায় মাত্র দুই ইঞ্চি পরিমাণে একটী সোজা দাগ টানিয়া ছালটিকে চিরিয়া

এবং ছুরিদ্বারা উভয় পার্শ্বের ছাল ঈষৎ ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে চোকটীকে লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং অল্প কাষ্ঠ ও ছাল সমেত চোক না তুলিয়া কেবল ছাল সমেত চোক তোলা হয়। চারার বা গাছের শাখায় চোক প্রবিষ্ট করাইবার পর সেইস্থানে পাট, কলার ছিটা বা নরম সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। বন্ধনকালে চোকটী না ঢাকা পড়ে এবং ঐ স্থানে আলো ও হাওয়া প্রবেশ না করে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। রজন ও তার্পিণ তৈল অগ্নিতে গলাইয়া উহা ভালভাবে মিশাইয়া লইয়া উহা চোক বসান স্থানে প্রলেপ দিলে আলোক ও বাতাস উক্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ভালরূপে চোক লাগাইতে পারিলে এক সপ্তাহ কি দেড় সপ্তাহের মধ্যে চোক মুখাইয়া বা ফুটিয়া শাখা পল্লব বাহির হইবার উপক্রম হইয়া থাকে, বাংলা দেশে সাধারণতঃ ফল গাছের চোক কলম করিবার রীতি প্রচলিত নাই।

চোঙ কলম (Tube or Ring budding)

মাঘ হইতে বৈশাখ মাস চোঙ কলম করিবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। কোন উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছের শাখা হইতে মাত্র চোক-সমেত ছাল তুলিয়া লইয়া অন্য গাছের কোন স্থানে সেই পরিমাণ ত্বক ছাড়াইয়া ফেলিয়া তথায় ইহা বসাইয়া দিতে হয়। শাখা হইতে ছাল তুলিবার সময় চোঙ বা নলের আকারে ছাল

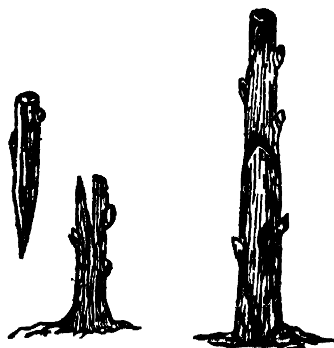
উঠিয়া আসে বলিয়া উহাকে চোঙ বলে। চোঙ কলম প্রস্তুত করিতে হইলে কোন ভাল জাতীয় গাছের শাখার উপরিভাগ বা মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া উহার প্রতি পত্র ক্রোড়ে বা গ্রন্থির উপরে ও নীচে এক অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান বাদ দিয়া গোলাকার ভাবে বেষ্টন করিয়া ছুরি দ্বারা জোরে দাগ দিয়া উহা অঙ্গুলি দ্বারা দুই চারিবার ঘুরাইয়া নীচের দিকে টানিলেই উক্ত চিহ্নিত স্থানের ছালটী কাষ্ঠ হইতে খুলিয়া বাহির হইয়া আসিবে। পরে যে গাছের বা যে চারার শাখায় উহা লাগাইতে হইবে তাহার যে কোন নির্দ্দিষ্ট শাখার ত্বক বা ছাল পরিমাণ মত, যেন কাষ্ঠ বা হাড় না কাটে এরূপ সাবধানে কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া উক্ত চোঙটী তথায় প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। দুইটী শাখার স্থূলতা একরূপ হইলে চোঙটী ঠিক খাপ খাইয়া লাগিয়া যাইবে। শাখা প্রশাখার যে কোন অংশে চোঙ লাগান যাইতে পারে। চোঙটি যে শাখায় বসাইতে হইবে তাহার কাণ্ড যদি চোঙ অপেক্ষা সরু হয় তাহা হইলে চোঙটী লম্বা-ভাবে চিরিয়া কাণ্ডের গাত্রে বসাইয়া অতিরিক্ত অংশ ছালের উপরে রাখিয়া বা কাটিয়া দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। চোঙ যদি কাণ্ড অপেক্ষা সরু হয় তাহা হইলেও উহা পূর্ব্বের ন্যায় লম্বাভাবে কাটিতে হইবে এবং কাণ্ডের কতটুকু অংশে উহা সঙ্কুলান হয় দেখিতে হইবে। যদি একটু কম হয় তাহা হইলে কাণ্ডের গাত্রের ঐ পরিমাণ ছাল রাখিয়া বাকীটুকু তুলিয়া ফেলিয়া ঐ স্থানে চোঙটী লাগাইয়া দিতে হইবে।

চোঙ নরম সূতা বা ঐরূপ কোন পদার্থ দিয়া ভালভাবে বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। অল্পদিনের মধ্যেই চোক কলাইয়া শাখা বাহির হইবার উপক্রম হইবে।

জিহ্বা কলম (Cleft Budding)

বসন্তকালেই জিহ্বা কলম প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। জিহ্বা কলম প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে বীজ হইতে চারা কোন টবে জন্মাইতে হয়। উক্ত চারা প্রায় এক বৎসরের বড় হইলে উহার মস্তক বা উপরিভাগস্থ কাণ্ড শাখা কাটিয়া ফেলিয়া তাহার উপরিভাগ ইংরাজী (V) অক্ষরের ন্যায় কাটিতে হইবে, পরে উহার সমজাতীয় কোন বৃক্ষশাখা যাহা উহাতে বসাইতে হইবে তাহার মস্তকের উপরিভাগস্থ শাখা ৫।৬ অঙ্গুলি পরিমাণ লইয়া উহার নিম্নভাগ এরূপ ভাবে কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে যেন উক্ত V অক্ষরের ন্যায় কর্ত্তিত স্থানে ভালরূপে খাপ খায়। কাটিবার সময় যেন চারার মুখ অধিক কাটা না হয় বা কাটিয়া না যায়। যে শাখা চারায় সংলগ্ন করিতে হইবে তাহাতে যেন অন্ততঃ ২।৩টী চোখ থাকে। পরে জোড় কলমের ন্যায় খাঁজ কাটা স্থানে উত্তমরূপে কোন নরম সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হয় যেন উহার মধ্যে ফাঁক না থাকে এবং আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। প্রথমে চারাতে ইংরাজী V অক্ষরের

ন্যায় কাটিয়া কলম প্রস্তুতের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত ভাবেও কলম প্রস্তুত করিতে পারা যায়, অর্থাৎ চারা ইংরাজী V অক্ষরের ন্যায় না কাটিয়া শাখা ঐরূপ ভাবে (Λ)



কাটিয়া চারা উহার উপযোগী করিয়া অর্থাৎ যাহাতে উহার সহিত খাপ খাইয়া বেশ মিলিয়া যায় ঐরূপভাবে কাটা যাইতে পারে। জিহ্বা কলম প্রস্তুতের পর টবে প্রস্তুত চারাকে কোন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা উচিত। অত্যধিক গ্রীষ্ম পড়িলে চারার উপর কোন সছিদ্র জলপূর্ণ পাত্র রাখা উচিত।

হাপোরে চারা রক্ষণ

কলম প্রস্তুত হইলেই উহা একেবারে জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করা উচিত নয়। বীজ বা কলমের চারা জমিতে স্থায়ীভাবে লাগাইবার পূর্ব্বে কিছুদিন হাপোরে রাখিয়া পালন করা উচিত। আমদানি চারা বা কলমের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। হাপোরে রোপণ করিলে গাছগুলি শীঘ্র সতেজ ও সবল হইয়া উঠে। জমিতে স্থায়ীভাবে গাছ রোপণ করিতে যে দূরত্বে গাছ লাগাইতে হয় হাপোরে তাহা অপেক্ষা ঘনভাবে গাছ লাগান হয় বলিয়া অল্প স্থানে অনেক গাছের সঙ্কুলান হয় এবং এজন্য ইহাদের দেখাশুনা বা পরিচর্য্যা করিবার সুবিধা হয়। প্রত্যেকটী গাছ স্বতন্ত্রভাবে ও অনেক দূরে দূরে রোপিত হইলে তাহাদের জলসেচন, নিড়ানি প্রভৃতির জন্য বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে।

হাপোরের জমি ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে হইলে ভাল হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক রৌদ্রের সময় হাপোরের উপর হোগলা বা দরমা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া দরকার। রৌদ্রের তেজ কম থাকিলে আচ্ছাদন খুলিয়া রাখা ভাল।

হাপোরের মাটি যেন অধিক বেলে বা এঁটেল না হয়। হাপোরের মাটি খুব হালকা, আল্‌গা ও ঝুরা হওয়া দরকার। বালি, ঘেঁস, এঁটেল, পাতাপচা, শুষ্ক গোবর প্রভৃতির সংমিশ্রণে হাপোরের মাটি প্রস্তুত করা চলে। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন জমিতে

জল সেচন করা দরকার। অন্য সময়ে ২।৩ দিন অন্তর জল সেচন করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ণ সময়ে পিচকারী দ্বারা গাছের পাতা ধুইয়া দিলে বা গাছকে স্নান করাইলে উহা খুব প্রফুল্ল থাকে। ছাপোরে ৫।৬ মাস কাল চারাকে পালন করিবার পর উহা জমিতে স্থায়ীভাবে লাগাইতে পারা যায়।

কলমের চারা নির্ব্বাচন করিতে হইলে ২।১ বৎসর বয়সের চারাই নির্ব্বাচন করা ভাল; কারণ চারা বড় হইয়া গেলে তাহার শিকড়ও বড় হয় এবং শিকড় কাটিয়া গেলে চারা কম তেজী হয়।

চারা রোপণের সময় ও রোপণের প্রণালী

চারা বা কলম রোপণের একটা সময় আছে। অতিরিক্ত শীত, বর্ষা বা গ্রীষ্মের সময় চারা রোপণ করা উচিত নহে। অতিরিক্ত শীতে গাছের শিরা সকল কুঞ্চিত হইয়া থাকে। এ সময় গাছের রস ঘন হয় এবং রসের প্রবাহ অতি ধীরে সম্পন্ন হয়, এজন্য এসময়ে গাছের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে, প্রকৃত পক্ষে এই সময়টী উদ্ভিদের বিশ্রামকাল। এ সময় চারা রোপণ করিলে উহা নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত্যধিক বর্ষায় মৃত্তিকা রসে পূর্ণ থাকে এবং এসময়ে মাটিতে উত্তাপ থাকে না, এজন্য এসময়ে চারা রোপণ করিলে মাটি আঁটিয়া যায় বলিয়া চারা শিকড় ছাড়িতে পারে না এবং অধিক সিক্ত থাকায় ও উত্তাপ না পাওয়ায় শিকড় পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এসময়েও চারা গাছ রোপণ করিলে উপযুক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। গ্রীষ্ম-কালে উদ্ভিদের শিরাসমূহ আলগা এবং রস তরল থাকে কিন্তু অতিরিক্ত গ্রীষ্মবশতঃ মাটি শুকাইয়া যায় এবং গাছের সমস্ত অংশ হইতে যে পরিমাণ রস বাষ্পাকারে চলিয়া যায়, উহাদের শিকড় সে পরিমাণ রস মাটি হইতে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য এ সময়ে চারা লাগাইলে উহা মারা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। জৈষ্ঠ্যের মধ্যভাগ হইতে আষাঢ়ের শেষ এবং আশ্বিন কাত্তিক মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। এ সময় উদ্ভিদের শিরা সমুদয় সরস ও রসপূর্ণ থাকে, রস তরল থাকে এবং রসের প্রবাহ খুব দ্রুত হয় এজন্য এ সময়ে চারা রোপণ করিলে খুব

শীঘ্রই লাগিয়া যায়। মোট কথা, গাছের প্রকৃতি এবং জমির অবস্থা বুঝিয়া চারা রোপণ করা চলে।

বৎসরে দুইবার গাছ লাগান যাইতে পারে; একবার বর্ষাকালে, একবার শীতের প্রারম্ভে। বর্ষাকালে প্রায় সকল জাতীয় ফলের গাছ রোপণ করা চলে। যে সমস্ত গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে সেই সমস্ত গাছ শীতের প্রারম্ভে লাগাইতে পারা যায়। জলের সুবন্দোবস্ত থাকিলে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার গাছই এ সময়ে লাগান চলে। যে কোন সময়েই গাছ লাগান হউক না কেন সে সময় জমির অবস্থা যদি খুব কঠিন থাকে এবং আবহাওয়া বেশ গরম এবং টান (dry) হয় তাহা হইলে গাছ লাগাইবার পূর্ব্বে জমিতে সেচ দিয়া বা সিঞ্চন দ্বারা জমির মাটি ভিজাইয়া নরম করিয়া দিতে হয়। আবার জমির অবস্থা যদি খুব ভিজা বা স্যাঁতা হয় তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিয়া মাটি ঝুরা করিয়া ফেলিতে হয় এবং জমি হইতে ইট, পাটকেল, শিকড় ও আগাছা বাছিয়া ফেলিতে হয়। বর্ষাকালে যে জমিতে চারা লাগান হইবে, গ্রীষ্মকালে সেই জমির পাট সমাধা করিয়া রাখা দরকার এবং যে জমিতে শীতকালে গাছ লাগাইতে হইবে তাহার পাট বর্ষার শেষে করিয়া রাখিতে হয়। জমির মাটি যদি অত্যন্ত এঁটেল বা বালি যুক্ত হয় তাহা হইলে উহার সহিত আবশ্যক মত কাঠের ছাই, আবর্জ্জনা, উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা, গোবর প্রভৃতি মিশাইয়া লইতে হয়। বিভিন্ন জাতীয় ফল গাছের জন্য জমিতে স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা দরকার, কারণ

সব ফলের গাছ একই সময়ে ফলপ্রসূ হয় না। ফল প্রদানের বিভিন্ন সময় অনুসারে উহাদের সেই ভাবে পরিচর্য্যার আবশ্যক হইয়া থাকে। আবার একই জাতীয় ফলগাছের মধ্যেও উহাদের প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন আম বৈশাখে, কোন আম জ্যৈষ্ঠ মাসে, কোন আম আষাঢ়-শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে এবং কোন গাছ বৎসরে দুইবার বা তিনবার ফল দেয়। এজন্য জমিতে সুসজ্জিত ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক চারা না লাগাইলে পরিচর্য্যার বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ গাছের বৃদ্ধি ও প্রসার অনুসারে সজ্জিত ও পৃথক ভাবে গাছ লাগান আবশ্যক। গাছ ঘন বসাইলে এবং বড় জাতীয় গাছের পাশে কোন ছোট জাতীয় গাছ লাগাইলে বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় জমি আবৃত হইয়া পড়ে; তাহার ফলে ছোট জাতীয় গাছ সমধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না, জমিতে উপযুক্তরূপে রৌদ্রালোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে না পারিলে ফলনের ব্যাঘাত ঘটে এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়। গাছ ঘন ভাবে সন্নিবেশিত থাকিলে উহাদের শাখা-প্রশাখা এবং শিকড় অবাধে প্রসারিত হইতে না পারায় উহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ইহাতে গাছ শীর্ণ, অল্প পত্রবিশিষ্ট এবং উর্দ্ধদিকে অধিক বর্দ্ধিত হয় এবং পাংশুবর্ণ ধারণ করে। এজন্য উদ্ভিদগণের পরস্পর দূরত্ব অনুযায়ী স্বতন্ত্র ভাবে এবং জাতি অনুসারে পৃথক ভাবে জমিতে বিভিন্নস্থানে লাগান উচিত।

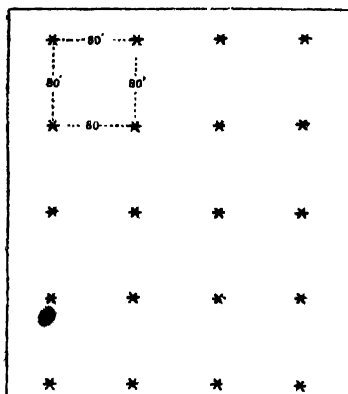
জমিতে ৩ ফিট গভীর এবং চারার শিকড় যে পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া থাকে সেই অনুযায়ী প্রশস্ত গর্ত্ত করিতে হয়। মোটের উপর গর্ত্তের প্রসার ৩ ফিট অপেক্ষা কম না হয়। জমি উর্ব্বর হইলে চারা লাগাইবার সময় সার দিবার আবশ্যক করে না। জমি শুষ্ক হইলে চারা লাগাইবার ২।১ দিন পূর্ব্বে প্রতি গর্ত্তে জল ঢালিয়া মাটি ভিজাইয়া নরম করিয়া রাখিতে হয়। চারা লাগাইবার সময় উহাদের শিকড় যেন গর্ত্তের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া না থাকে এরূপ ভাবে দাঁড় করাইয়া গোড়ায় মাটি দিতে হয়। গর্ত্তের ঠিক মধ্যস্থলে চারা লাগাইতে হয়। গাছের গোড়ায় মাটি দিবার পর উহা যেন আল্গা না থাকে তাহা দেখা দরকার, উহা অল্প চাপিয়া দিতে হয়। চারা, অপরাহ্ণ কালে অর্থাৎ রৌদ্রের তেজ পড়িয়া গেলে লাগান উচিত। রৌদ্রের সময় কোন চারা বা গাছ লাগাইলে রৌদ্রের তেজ সহ্য করিতে না পরিয়া গাছ ঝামরাইয়া পড়ে। চারা বা কলম, জমিতে লাগাইবার পর জলের ঝারি দ্বারা (Spray) জল প্রয়োগে গাছকে স্নান করাইতে হয়। চারা বা কলম লাগাইবার পর মাটি যেন সর্ব্বদা সরস থাকে এবং এসময় যেন আদৌ উহাদের জলের অভাব না ঘটে। চারা মাটিতে লাগিয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জলসেচন ও আগাছা নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন বিশেষ কিছু পরিচর্য্যার আবশ্যক করে না।

———

ফলকর রচনা

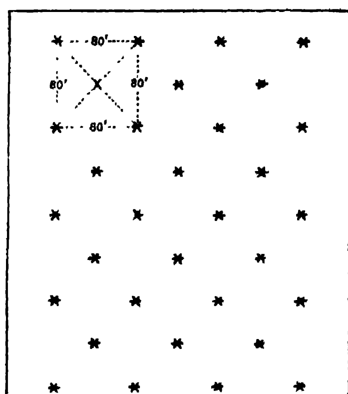
আমরা সচরাচর চতুষ্কোণ প্রথাতেই বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া থাকি। কিন্তু আজকাল আরও কয়েক প্রকার প্রথার আশ্রয় লওয়া হয় ও প্রত্যেক প্রথারই সুবিধা বা অসুবিধা আছে। যাহা হউক আমরা এখানে সর্ব্বপ্রকার প্রথারই সূত্র এবং বর্ণনা প্রদান করিতেছি। এই সূত্র অনুযায়ী জমিতে গাছের সংখ্যার হিসাব বাহির হইবে।

(ক)



ক চিত্র—চতুর্ভুজাকার প্রথার নমুনা প্রত্যেক তারকা চিহ্নিত স্থানে একটী গাছ কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক বাহু ৪০ ফিট।

(খ)



খ চিত্র—আয়তক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটি × গাছ রোপিত। ইহাকে পঞ্চক সংস্থান কহে। ভবিষ্যতে × চিহ্নিত গাছ কাটিয়া ফেলা হয়।

(১) চতুষ্কোণ বা চতুর্ভুজাকার ক্ষেত্রে গাছ রোপণ প্রায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হয়। এই প্রথায় ক্ষেত্রকে গাছের দূরত্ব অনুসারে সমবাহু সমকোণী চতুষ্কে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক কোণের বিন্দুর উপর বৃক্ষ রোপিত হয়। (ক চিত্র দ্রষ্টব্য)

সূত্র—

(ক) $\frac{\text{৪৩৫৬০}}{\text{গাছের দূরত্বের বর্গ পরিমাপ (ফিটে)}} = \text{একর প্রতি গাছের সংখ্যা}$

(খ) $\frac{\text{জমির বর্গ পরিমাপ}}{\text{গাছের দূরত্বের বর্গ পরিমাপ}} = \text{গাছের সংখ্যা}$

(২) পঞ্চক সংস্থান (Quincunx) প্রথায় বৃক্ষ রোপণ করিলে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের প্রতি কোণে এক একটী করিয়া চারিটী ও মধ্যস্থলে একটি অতিরিক্ত গাছ স্থাপিত হয় (খ চিত্র দ্রষ্টব্য)

ইহাতে গাছের সংখ্যা কোন সরল সূত্র দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু চতুষ্কোণ প্রথায় যত গাছ হয় তাহার উপর শতকরা ৭৫টি গাছ অতিরিক্ত হয়। কিন্তু গাছগুলি কয়েক বৎসর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবার পর ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া থাকে এবং ফল ছোট ও কম হয় কিন্তু যদি এক একটি সারিতে বড় গাছ যথা—আম, জাম, লিচু প্রভৃতি ও পরবর্ত্তী সারিতে ছোট গাছ যথা—আতা, কুল, করমচা প্রভৃতি রোপণ করা হয় তাহা হইলে কোন গাছেরই ক্ষতি হয় না।

(৩) সমদ্বিবাহু-ত্রিভুজাকারে বৃক্ষ রোপণের পূর্ব্বে জমিকে অনেকগুলি অনুক্রমিক সমদ্বিবাহু-ত্রিভুজের দ্বারায় বিভক্ত

করিয়া ত্রিভুজের প্রত্যেক কোণে গাছ রোপণ করা হয়। (গ চিত্র দ্রষ্টব্য) গাছের সংখ্যা বাহির করিতে হইলে সূত্র যথা—

(ক) $$\frac{৪৩৫৬০}{\text{ত্রিভুজের বাহুর বর্গ পরিমাপ} \times ১'১৫৫ \text{ (ফিটে)}} = \text{একর প্রতি গাছের সংখ্যা}$$

(খ) $$\frac{\text{জমির বর্গ পরিমাপ} \times ২৩১}{\text{দূরত্বের বর্গ পরিমাপ} \times ২০০} = \text{গাছের সংখ্যা}$$

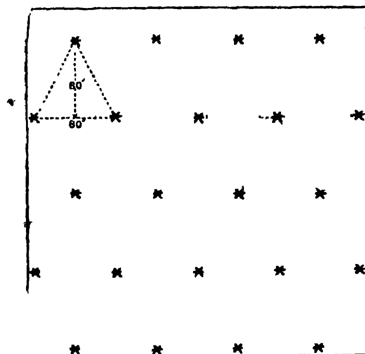
(৪) ষট কৌণিক প্রথা ত্রিভুজাকার প্রথারই উন্নততর সংস্করণ বলা যাইতে পারে। এই প্রথাতে গাছগুলি সর্ব্বদিকেই সমান দূরত্বে রহিলেও জমি কম লাগে। পর পৃষ্ঠায় (ঘ) চিত্র দেখিলেই দেখা যাইবে (গ) অপেক্ষা ইহাতে অনেকখানি জমি উদ্বৃত্ত আছে।

চতুর্ভুজ প্রথায় বৃক্ষ রোপণ করিলে জমিতে যে পরিমাণ বৃক্ষ ধরে ত্রিভুজাকারে বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহা অপেক্ষা গাছের সংখ্যা বেশী হয়। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক গাছ সর্ব্বদিকেই বাড়িবার জন্য সমান স্থান পাইয়া থাকে। গাছগুলি এরূপভাবে রোপিত হয় যে কোন গাছ অন্য গাছকে ছায়া করে না। এখানে চতুর্ভুজাকার ও ত্রিভুজাকার প্রথায় রোপিত বৃক্ষের তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হইল। (ক, গ, ঘ চিত্র দ্রষ্টব্য)

ত্রিভুজাকারে রোপিত। (ক) পাশাপাশি চারিটি বৃক্ষকে সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিলে একটি সমবাহু অসমকোণী চতুর্ভুজের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ দুইটি সমবাহু ত্রিভুজ হয়। (খ) কোনও মধ্যবর্ত্তী একটি গাছ হইতে বৃত্ত টানিলে বৃত্তের মধ্য বিন্দু

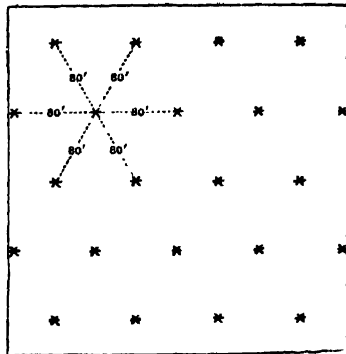
হইতে প্রত্যেক ব্যাসটি (ঘ চিত্র) সমান হইবে অর্থাৎ গাছগুলি সমদূরত্বে রোপিত হইয়াছে বুঝা যাইবে।

(গ)



গ চিত্র—সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকার প্রথা। প্রত্যেক সারির ও সা'রর গাছের দূরত্ব ৪০ ফিট্।

(ঘ)



ঘ চিত্র—ষট্‌কৌণিক প্রথা, অথবা সমবাহু ত্রিভুজাকার প্রত্যেক গাছটি সর্ব্ব দিকেই ৪০ ফিট্

চতুর্ভুজ প্রথায় রোপিত। গাছের পার্শ্ববর্ত্তী যে কোন চারিটি বৃক্ষের সহিত রেখা টানিলে একটি সমকোণী সমবাহু চতুর্ভুজ হয়। গাছগুলি একই রেখায় থাকায় পরস্পর পরস্পরকে ছায়া করিয়া থাকে।

(৫) অন্য একটি প্রথায় গাছ রোপিত হয় তাহাকে আয়তক্ষেত্র বলে। এই প্রথাটিও প্রায় চতুর্ভুজ প্রথার মত। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেক কোণগুলি সমান হইলেও বাহুগুলি সমান

নয় অর্থাৎ উভয়দিকের বৃক্ষের দূরত্ব সমান নহে। এই প্রথায় রোপিত বৃক্ষের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নোক্ত সূত্র অনুসারে বাহির করা যায়।

৪৩৫৬০ ÷ দুই দিকের গাছের দূরত্বের গুণফল = একর প্রতি গাছের সংখ্যা।

গাছের পরিচর্য্যা

জমিতে চারা লাগাইবার পর উহার বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বিভিন্নরূপ পাট বা পরিচর্য্যার আবশ্যক হইয়া থাকে। চারা অবস্থায় গাছে জল দেওয়া, গাছের গোড়া নিড়ান দেওয়া ও জমি হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা, জোড় কলমের আঁটির গাছ যাহাতে ডালপালা ছাড়িয়া না উঠে তাহা দেখা ভিন্ন ইহার অন্য কোন পাট আবশ্যক করে না। কারণ আঁটির চারার ডালপালা বাড়িয়া উঠিলে কলমের আসল গাছ মরিয়া যায়। জলের সহিত খইল পচাইয়া উহার তরল সার প্রয়োগ করিলে চারা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, জমি সারবান থাকিলে উহা দিবার আবশ্যক করে না। কি চারা অবস্থায় কি পূর্ণ বয়সে সকল সময়েই পোকা মাকড় এবং কীট পতঙ্গের হাত হইতে বৃক্ষ রক্ষা করা আবশ্যক। অনেক সময় কীট পতঙ্গ গাছের পাতা খাইয়া উহাকে শ্রীহীন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। ছাগল, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুও গাছ মুড়াইয়া খাইয়া উহার সমধিক অনিষ্ট করে। এসকলের উপদ্রব নিবারণের জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে হয়। ফলন্ত গাছ মুকুলিত হইবার ২।১ মাস পূর্ব্বে গাছের বৃদ্ধি স্থগিত রাখিবার জন্য জল দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। এসময় গাছের গোড়া খুঁড়িয়া, গাছের ডাল ও শিকড় ছাঁটিয়া দেওয়া, সার দেওয়া এবং পরে জলসেচন আরম্ভ প্রভৃতি পাট আবশ্যক হইয়া থাকে।

গাছ মুকুলিত হইবার ঠিক পূর্ব্বে ডাল ও শিকড় ছাঁটিয়া দিলে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং গাছ জখম হইয়া পড়ে, এ অবস্থা সংশোধন করিতে করিতে গাছের মুকুলিত হইবার সময় চলিয়া যায়। আবার অনেক সময় গাছের ডাল কিছু পূর্ব্বে ছাঁটার জন্য কচি কচি পত্র-পল্লব বাহির হইয়া গাছ বর্দ্ধনশীল হওয়ায় ফলনের সমস্ত শক্তি পত্র-পল্লবে চলিয়া যায় ইহাতে অনেক সময় ফল আসে না এবং যদিও আসে তাহা অতি অল্প হয়।

জলসেচন

ফলের গাছের বিভিন্ন জাতি, বয়স, অবস্থান এবং বিভিন্ন অবস্থায় ও ঋতু অনুসারে কম বেশী জলের আবশ্যক হইয়া থাকে। অতিরিক্ত জল এবং কম জল উভয়ই গাছের ও ফসলের পক্ষে অহিতকর ; ইহাতে ফলের আকার ও স্বাদের তারতম্য ঘটায়। চারা গাছের সুপুষ্ট পাতা যদি হলদে রং হইয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে ইহাতে জল সেচ উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া হয় নাই আর যদি কচি পাতা হলদে রং ধারণ করে তবে বুঝিতে হইবে যে জল বেশী দেওয়া হইয়াছে। তাই উপযুক্ত পরিমাণে জল দেওয়া দরকার। যাহাতে গাছের কোন ক্ষতি না হয় সেদিকেও লক্ষ রাখিতে হইবে। যে সময়ে গাছের কচি কচি পাতা বহির্গত হয় অথবা ছোট ছোট ফল ধরে সে সময়ে ইহাদের প্রচুর জলের আবশ্যক হয়। ফল পক্ক হইবার পূর্ব্বে জলসেচেন বন্ধ করা উচিত। এই সময়ে মাটিতে অধিক রস থাকিলে কেবল যে ফলের আস্বাদনের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা নহে, ইহাতে স্যাঁতা লাগিয়া ফল ফাটিয়াও যায়।

জলসেচনের সুবিধার জন্য জমি প্রস্তুত করিবার সময় জমির মধ্যে একটী বড় নালা রাখিতে হয় এবং উহা হইতে ছোট ছোট নালা বাহির করিয়া প্রতি গাছের গোড়ার চারিদিক বেড় দিয়া ঘুরাইয়া আনিতে হয়। ছোট ছোট চারা গাছের জন্য জল এইভাবে সেচন করিতে হয়। কারণ ছোট গাছের শিকড় অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে না, এজন্য ছোট ছোট গাছে জল দিতে হইলে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া উচিত। বড়

গাছে জল দিতে হইলে জমির মধ্যস্থিত বড় নালা হইতে ছোট ছোট নালা বাহির করিয়া শ্রেণীবদ্ধ গাছের দুইটী লাইনের মধ্য দিয়া উহার পথ করিয়া দেওয়া দরকার। কারণ বড় গাছের রস আকর্ষণকারী শিকড় সমূহ প্রায় গাছের গোড়ায় থাকে না, উহারা রস গ্রহণার্থ মৃত্তিকামধ্যে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় জলসেচন করিলে উহারা জল পায় না এবং উহারা জল না পাইলে গাছে প্রকৃত জল দেওয়ার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। এজন্য বড় গাছে জল দিতে হইলে গাছের গোড়া হইতে একটু দূরে জল দেওয়া আবশ্যক। গাছে ফল ধরিবার ২।১ মাস পূর্ব্বে যে সময় গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া হয় সে সময় কিছু দিনের জন্য জলসেচন বন্ধ রাখিতে হয়। এসময় জমি ভিজা থাকিলে মাটির রস যাহাতে শীঘ্র টানিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। গাছের ডাল ছাঁটাই ও গোড়ায় সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে জলসেচন আবশ্যক হয় এবং গাছের ফল ধরিতে আরম্ভ হইবার উপক্রম হইলে জল প্রদানে বিরত হওয়া দরকার। জমি অতিরিক্ত শুষ্ক থাকিলে এসময় একবার মাত্র জল দেওয়া যাইতে পারে। গাছে ছোট ছোট ফল দেখা দিলে পুনরায় জলসেচনের আবশ্যক হইয়া থাকে। এ সময় জলসেচনে বিরত হইলে এবং মৃত্তিকায় রসাভাব হইলে ফল ঝরিয়া পড়ে। এ সময় যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে বৈকালে পিচকারী দ্বারা সমগ্র গাছটিকে ভিজাইয়া দিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়।

মাটি খোঁড়া বা নিড়ান

জমির মাটি পুনঃ পুনঃ উলট্ পালট্ করিয়া দেওয়া ফলগাছের পক্ষে বিশেষ উপকারক। সমস্ত ফলকরের জমি বৎসরে দুইবার কোপাইয়া দেওয়া দরকার। গাছের গোড়ায় কোন গাছ বা আগাছা জন্মিতে না দেওয়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্য কোন বাজে গা:ছের শিকড় মাটি কর্ষণেব সময় সম্মুখে পাইলে উহা তুলিয়া ফেলা দরকার। বারংবার জমিকে কুন্দোলন করিলে রস সঞ্চিত হইয়া জমিকে নরম ও আলগা রাখে। ফল আসিবার মাস দুই পূর্ব্বে গাছের বয়স ও আকার অনুসারে উহার গোড়ার চতুর্দিকের ২ হইতে ২॥ হাত পরিধি মত স্থান বাদ দিয়া খুঁড়িয়া মাটি তুলিয়া ফেলিয়া উহাদের শিকড় বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। গাছের শাখা প্রশাখা যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, উহাদের শিকড়ও মাটির মধ্যে ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। গাছের গোড়া খুঁ ড়িয়া দিবার সময় গাছের প্রান্ত শাখা সমূহের সমান্তরালে মাটি কোদালি দ্বারা গভীর করিয়া কোপাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ১০।১২ দিন এইভাবে রাখিয়া গাছের গোড়ার শিকড়ে রৌদ্র এবং বাতাস খাওয়াইয়া গোড়ায় সার মাটি প্রয়োগ করা দরকার।

সার প্রয়োগ

চারা লাগাইবার পর .গাছ যে পর্য্যন্ত ফলবতী না হয় সে পর্য্যন্ত জমিতে সার দিবার বিশেষ আবশ্যক করে না বিশেষতঃ জমি যদি সারবান্ হয়। জমি অনুর্ব্বর বা সারহীন হইলে চারা অবস্থায় গাছে গোবর, খইল প্রভৃতি জলে মিশাইয়া তরল আকারে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র গাছের উপকারে আসে। গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে প্রতিবৎসর নিয়মিত ভাবে সার প্রয়োগ করা আবশ্যক, ইহাতে গাছের ফলনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। গাছের শাখা-প্রশাখা বা পত্র যতদূর পর্য্যন্ত পার্শ্বদেশে প্রসারিত হয়, উহাদের শিকড়ও মাটির মধ্যে ততদূর পার্শ্বদেশে প্রসারিত হইয়া থাকে, গাছে সার দিবার পূর্ব্বে—গাছের শাখা-প্রশাখার সমান্তরালে চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মাটির সহিত সার মিশাইয়া প্রয়োগ করা উচিত এবং তরল সার ঝারীর সাহায্যে গাছের চতুর্দিকে দিতে হয়। জমিতে উদ্ভিজ্জপদার্থের ভাগ কম থাকিলে গোয়ালের আবর্জ্জনা বিঘাপ্রতি ৫০।৬০ মণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ফলের জমিতে চূণ থাকা বিশেষ দরকার। জমিতে চূণ না থাকিলে অথবা চূণের ভাগ কম থাকিলে বিঘাপ্রতি ৮।১০ সের চূণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। চূণ, জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করিতে হয়, কারণ চূণের সহিত অনেক সারের বিরোধ আছে। চূণের তীব্রতা নষ্ট হইয়া গেলে কোন সার প্রয়োগে অপকার হয় না। ফলন্ত গাছে প্রতি বৎসর কিছু

ফস্ফরাস সার প্রয়োগ করা উচিত। অস্থিচূর্ণ এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধূলার আকারে চূর্ণ অস্থি খুব শীঘ্র পচিয়া সার হইয়া থাকে কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। অস্থিখণ্ড খুব শীঘ্র পচিয়া কার্য্যকরী হয় না বটে, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ীভাবে থাকিয়া কার্য্য করে। সুপার ফস্ফেট অফ লাইম প্রয়োগেও এই একই কাজ হয় এবং ইহা খুব শীঘ্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে। জলের সহিত ইহা সহজে মিশিয়া যায় এজন্য গাছ খুব শীঘ্রই উহা গ্রহণ করিতে পারে। জমির ও গাছের অবস্থা বুঝিয়া ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী প্রয়োগ করা চলে। গোয়ালের পরিত্যক্ত গোবর, চোনা, ছাই ও আবর্জ্জনাদি ৫ সের হইতে ১০ সের এবং অস্থিচূর্ণ /২॥০ সের হইতে /৪ সের প্রতি-বৎসর গাছের বয়স বৃদ্ধি অনুয়ায়ী প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যে সমস্ত গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে না সেই সমস্ত গাছে ফলনের দুই মাস পূর্ব্বে বা গাছের ফল দেওয়া শেষ হইবার ১॥০ মাস ২ মাস পরে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে তাহাদের সুপ্তাবস্থায় গোড়া খুঁড়িয়া সার প্রয়োগ করা চলে।

শিকড় ছাঁটাই

(Root Prunning)

যে সমস্ত ফল গাছের খুব বৃদ্ধি ও তেজ এবং ফল খুব কম দেয় অথবা যাহার ফল হয় না সেই সমস্ত গাছের শিকড় ছাঁটাই করা দরকার। গাছের শিকড় ছাঁটিবার উদ্দেশ্য উহার তেজ ও বর্দ্ধনশক্তিকে কিয়ৎপরিমাণে সংযত করিয়া উহার প্রসবিনী শক্তিকে সাহায্য করা। গাছ মুকুলিত হইবার ২।১ মাস পূর্ব্বে যে সময়ে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হয় সেই সময় উহাদের শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছের গোড়া খুঁড়িবার সময়ও আপনা হইতে অনেক শিকড় কাটিয়া যায়। গাছের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড়ের এবং অল্পসংখ্যক মোটা শিকড়ের অগ্রভাগ ঈষৎ কাটিয়া দিলে ভাল হয়। গাছের শিকড় ছাঁটাই শেষ হইলে কিছু সার মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ফল গাছকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কাল বিশ্রাম দেওয়া দরকার। অধিকাংশ স্থলে গাছের ফসল শেষ হইবার পরই ইহার বিশ্রামের কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। গাছে জল দেওয়া বন্ধ করিলেই প্রাকৃতিক ভাবে বিশ্রামের কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। শিকড়গুলিতে বায়ু ও আলোকের প্রভাব না পাইলে গাছও বিশেষ সতেজ হইতে পারে না ও ফলপ্রদান-শক্তি অত্যন্ত কমিয়া যায়। শিকড়সমূহ মৃত্তিকার কয়েকটি

স্তর নিম্নে প্রবেশ করিলে প্রচুর পরিমাণে রস গ্রহণ বা শোষণ করিতে পারে সত্য কিন্তু বায়ু ও আলোকাভাবে তাহাদের সুচারুরূপে কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। উক্তরূপ শীতল ও পাতলা রস হইতে উৎপন্ন ফল সুস্বাদু তো হয়ই না বরং ফল দাগী হয়। এমন কি সময় সময় পত্রগুলি পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হইতে দেখা যায়। অন্যদিকে শিকড় ও শাখা শিকড়গুলি যদি যথাসম্ভব মৃত্তিকার উপর স্তরে বিন্যস্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা যে রস গ্রহণ করে তাহা প্রকৃতি হইতে কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ গ্যাস ও সূর্য্যালোক প্রভাবে বৃক্ষকোষ গুলিকে স্বাস্থ্য সম্পন্ন করায় শোষিত রস ঘন ও ফলোৎপাদনের গুণ সমন্বিত হইয়া বৃক্ষকে প্রচুর ফলধারণের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে। কিন্তু বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রভাব বিবর্জ্জিত রসে কখনও তাহা হইতে পারে না। সে জন্যও শিকড় ছাঁটিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়।

ডাল ছাঁটাই

(**Prunning**)

প্রায় সর্ব্বপ্রকার ফল গাছেরই ডাল ছাঁটিবার আবশ্যকতা আছে। ডাল ছাঁটাই কার্য্যে কিছু বিবেচনা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। গাছের শাখা-প্রশাখা ও আকার পরিবর্ত্তিত এবং নিয়মিত করিতে ও গাছের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে ডাল বা শাখা ছাঁটিতে হয়। অনিয়মিত ভাবে বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ডাল ছাঁটিলে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। গাছের ভাবী আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ডাল ছাঁটিতে হয়। প্রথমে ইহার রুগ্ন, শুষ্ক অথবা অর্দ্ধ শুষ্ক শাখাকে অপসারণ করা দরকার। অনেক গাছের অতিরিক্ত শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগ অল্প কাটিয়া দিলে ভাল হয়। গাছের নূতন শাখা আদৌ কাটা উচিত নহে। নূতন শাখা না কাটিয়া উহা দড়ি বাঁধিয়া নিম্নদিকে ঈষৎ হেলাইয়া বাঁধিয়া দিলে উহাতে যে শাখা-প্রসবিনী চোক থাকে তাহা মুকুলিত ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। গাছের নিম্নভাগে নতমুখী শাখা-প্রশাখা ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছের গোড়ায় যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস খেলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। গাছের মধ্যভাগ অতিরিক্ত শাখা-প্রশাখা ও পত্রপল্লব হেতু ঘন অন্ধকারময় হইলে ২।১টী শাখা কাটিয়া ফাঁকা করিয়া দিতে হয়, ইহাতে গাছের অপকার না হইয়া উপকারই হয়। গাছের

মধ্যে ফাঁক থাকিলে এবং তথায় সূর্য্যালোক ও বাতাস দেখিতে পাইলে ফল অধিক জন্মে। অনেক সময় দেখা যায়, গাছের যে অংশে সূর্য্যালোক পড়ে সেই অংশের শাখায় অধিক ফল ধরে এবং যেদিকে আদৌ সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হয় না সেদিকে হয়'ত ফল হয় না, নতুবা যাহা হয় তাহা খুব কম। অধিকন্তু গাছের মধ্যে সূর্য্যালোক ও বাতাস প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে উহা কীটকুলের আবাসস্থল হইয়া থাকে। তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি শাখাহীন গাছের শুষ্ক পত্র ও মস্তক পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

গাছের বিশ্রামের সময় সম্পূর্ণ অতিবাহিত হইলে ডাল ছাঁটাই আরম্ভ করা দরকার। ডাল ছাঁটিতে খুব ধারাল ছুরি বা কাঁচি দরকার। অনিয়মিত বা নিষ্ঠুর ভাবে গাছ ছাঁটিলে উহার শিকড় অধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং শিকড় যত বাড়িতে থাকে গাছের শাখা-প্রশাখা তত বৃদ্ধি পায় এবং ফলপ্রদান শক্তি কমিয়া যায়। সুতরাং গাছ ছাঁটিতে হইলে এ সমস্ত কার্য্য বিবেচনাপূর্ব্বক করা দরকার।

কীট-রোগ

কীট-পতঙ্গের উপদ্রব অনেকক্ষেত্রে জলবাতাসের উপর নির্ভর করে। ভাল মন্দ চাষের উপরেও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব কম বেশী হইয়া থাকে। জমি স্যাঁতা হইলে, জমিতে অধিক দিন ধরিয়া জল দাঁড়াইলে, জমিতে আগাছা জন্মিতে দিলে, ভালরূপে মাটি কর্ষণ না করিলে, মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য যথোপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান না থাকিলে ইত্যাদি বহুকারণে উদ্ভিদ কীটাক্রান্ত হইয়া থাকে। কীটপতঙ্গের উপদ্রব হইতে সর্ব্বদা সতর্ক ও সাবধান থাকা আবশ্যক। শুষ্ক বা রুগ্ন শাখা কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা দরকার। এই সমস্ত শাখা প্রশাখায় সাধারণতঃ অনিষ্টকর রোগের বীজাণু থাকিতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে রোগের বীজাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ কিংবা হস্তদ্বারা বাছাই করা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় কীট নিবারণে যত্নবান না হইলে ক্রমে ইহা সমস্ত ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন ইহার দমন একরূপ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রথমেই মনে রাখা আবশ্যক যে, কীট-পতঙ্গের উপদ্রব দমন করা অপেক্ষা যাহাতে গাছপালা রোগ বা কীটাক্রান্ত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা করকার। প্রথম হইতে সাবধান থাকিলে অধিক বেগ পাইতে হয় না।

সাধারণ ক্ষেত্রে বোর্দ্দো মিকশ্চার সর্ব্বপ্রকার আঁইস ও ছাতাধরা রোগে ফলপ্রদ। লেড আর্সিনিয়েট উইচিংড়ি,

পঙ্গপাল, গুটীপোকা ও সর্ব্বপ্রকার পত্র-ভক্ষক কীটের পক্ষে ফলপ্রদ। ক্রুড্ অয়েল ইমালসন সর্ব্বপ্রকার চুষি বা শোষক ও মাছি পোকার পক্ষে ফলপ্রদ। আজকাল ডি, ডি, টি ও গ্যামাক্সিন কীট পতঙ্গের উপদ্রব দমনে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। ইহাদের কীট নিবারক শক্তি আছে সেই কারণে ব্যবহার করিতে হয়। উভয়কেই জলে মিশ্রিত করিয়া বা পাউডাররূপে ব্যবহার করা চলে।

বোর্দ্দো মিকশ্চার (Bordeoux mixture)
(তুঁতের আরক)

১২ সের জল
২ ছটাক তুঁতে
২ ছটাক পোড়াচূণ

দুইটী মাটীর গামলা লইয়া একটীতে ৬ সের জল ও ২ ছটাক তুঁতে ভাল করিয়া ভিজাইয়া গুলিয়া লইতে হয়। অন্য পাত্রে ৬ সের জলের সহিত ২ ছটাক চূণ ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইতে হইবে। চূণের জল ঠাণ্ডা হইলে তুঁতের জলের সহিত বেশ ভালভাবে মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই ঔষধটি প্রস্তুত ঠিক হইল কি না তাহা দেখিবার জন্য একখানি ইস্পাতের ছুরির ফলা ঐ জলে ডোবাইতে হইবে। যদি উহাতে তামার রং ধরে তাহা হইলে আরক প্রস্তুত হয় নাই বুঝিতে হইবে এবং আরও কিছু চূণের জল উহাতে মিশাইতে

হইবে। যখন ছুরির ফলায় আর তামার রং ধরিবে না এরূপ দেখা যাইবে তখন ইহা প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পিচকারী দ্বারা ইহা প্রয়োগ করিলে ছাতা বা ধসা ধরা রোগের আক্রমণে উপকার পাওয়া যায়।

লেড আর্সিনিয়েট (Lead Arseniate)
(সেঁকো বিষ)

ইহা একপ্রকার বিষাক্ত আরক। ইহা জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা ব্যবহার করিতে পারা যায় এবং গুঁড়া চূণ বা ছাইয়ের সহিত. ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশাইয়া গাছের পাতায় ব্যবহার করা চলে। লেড্ আর্সিনিয়েট শ্বেতবর্ণ গুঁড়া ও আটার আকারে কিনিতে পারা যায়। ইহা মাত্রায় একটু বেশী হইলে গাছের পাতা ইত্যাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। মানুষ ও গবাদি পশুর পক্ষেও ইহা বিষাক্ত। গুটিপোকা, পঙ্গপাল এবং পত্রভোজী কীট মাত্রেই ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। গুড় বা চূণের সহিত প্রয়োগ করিলে ইহা খুব তীব্র হয়।

লেড্ আর্সিনিয়েট	—	১ ছটাক
গুঁড়া চূণ	—	৩ ছটাক
কাত গুড়	—	৬ ছটাক

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্র সংমিশ্রণ করতঃ ইহার এক ছটাক এক মণ জলের সহিত গুলিয়া পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ

করিতে হয়। আধমণ গুঁড়া চূণ বা ছাই মিহি করিয়া ছাঁকিয়া ইহার সহিত প্রথমোক্ত দ্রাবণের আধ সের মিশাইয়া গুঁড়ারূপে ব্যবহার করা চলে।

লেড ক্রোমেট (Lead Chromate)

একমণ জলের সহিত এক ছটাক পরিমাণ লেড ক্রোমেট মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিতে পারা যায়। ইহা দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ। যে সব পোকা গাছের পাতা কাটিয়া খায় তাহাদের মারিবার পক্ষে ইহা বেশ উপযোগী। ইহা প্রয়োগে গাছের অনিষ্ট হয় না এবং বৃষ্টিতেও ইহা ধুইয়া যায় না।

কেরোসিন মিশ্রণ (Kerosen Emulsion)

কেরোসিন তৈল উত্তম কীটনাশক দ্রব্য ; কিন্তু ইহা গাছের পাতায় লাগিলে পাতা ঝলসিয়া যায়। ইহাকে নিম্নোক্ত ভাবে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। প্রথমে ৫ সের জলে এক পোয়া বার সোপ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া আগুনে ফুটাইয়া লইতে হয়। সাবান জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে উহা নামাইয়া একটু করিয়া ১০ সের পরিমাণ কেরোসিন তৈল উহাতে ঢালিয়া ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। ইহা বেশ মিশ্রিত হইলে ইহার একসের লইয়া ১০ সের জলের সহিত মিশাইয়া বহুছিদ্র মুখ বিশিষ্ট পিচকারী দ্বারা গাছের

পাতার উপরে ও নিম্নভাগে প্রয়োগ করিতে হয়। উইচিংড়ি, ফড়িং, ঘুরঘুরে এবং Aphide নামক কীট ইহার ব্যবহারে বিনষ্ট হয়।

ক্রুড অয়েল ইমালসান (Crude Oil Emulsion)

ইহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার এক পোয়া পরিমাণ আধমণ জলের সহিত ভাল করিয়া মিশাইলে যখন সাদা রং হয় সেই সময় পিচকারী দ্বারা গাছে প্রয়োগ করা চলে। সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ইহার প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। ইহা বাটীর দুর্গন্ধ নাশ করিতে এবং গৃহপালিত পশুর গাত্রস্থ কীটাদি দমন করিতে ফিনাইলের ন্যায়ও ব্যবহার করা চলে।

বার্গাণ্ডি মিকশ্চার (Burgundy Mixture)

জল	—	একমণ
কাপড় কাচা সোডা	—	১ সের
তুঁতে	—	১ ছটাক

প্রথমে আধমণ জলের সহিত কাপড় কাচা সোডা এক সের কোন মাটির গামলায় ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইতে হইবে। অন্য একটী পাত্রে আধমণ জলে উপরোক্ত পরিমাণ তুঁতে ন্যাকড়ার পুটুলী করিয়া ভিজাইতে হইবে। উহা বেশ ভিজিয়া গেলে তুঁতের জল ও সোডার জল পরস্পর সংমিশ্রণ

করতঃ পিচকারী সাহায্যে প্রয়োগ করা চলে। ইহা বের্দ্দো মিকশ্চারের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে।

বার্গাণ্ডি মিক্শ্চারের সহিত রজন প্রয়োগ করিলে উহা আরও তেজস্কর হয় এবং গাছের পাতায় প্রয়োগ করিলে বৃষ্টির জলেও ধুইয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ বার্গাণ্ডি মিক্শ্চারের সহিত নিম্ন পরিমিত রজনের (Resin) আরক ব্যবহার করিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

কাপড় কাচা সোডা	—	৩ ছটাক ৩ তোলা
রজন	—	৩ ছটাক ৩ তোলা
জল	—	১ সের ৪ ছটাক

কোন একটি মাটির পাত্রে উক্ত জলের সহিত কাপড় কাচা সোডা আগুনে ফুটাইতে হইবে। সোডা উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে উহাতে রজন দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হইবে; পরে উহা জলের সহিত বেশ মিশিয়া গেলে নামাইতে হইবে।

তামাকের জল (Tobacco Solution)

তামাকের জলও বেশ কীটনাশক। ইহাকে জলে ভিজাইয়া সাবানের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। ১০ সের জলে এক সের তামাক পাতা তুই দিন ভিজাইয়া রাখিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া উহাতে এক পোয়া বার সোপ বা কাচা সাবান টুকরা টুকরা করিয়া দিয়া উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইতে হয়।

জলের সহিত বেশ মিশিয়া গেলে ঠাণ্ডা অবস্থায় উহার এক সের ৬।৭ সের জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা গাছে প্রয়োগ করা চলে।

গন্ধকের গুঁড়া—গন্ধক বেশ ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া অল্প পরিমাণ গুঁড়া চূণের সহিত মিশাইয়া গাছের পাতা ভিজা থাকা অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়।

ছাইএর গুঁড়া—ঘুঁটের ছাই বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া তাহাতে অল্প কেরোসিন তৈল মিশাইয়া গাছের পাতায় ছড়াইয়া দিতে হয়। তৈলের ভাগ যেন বেশী না হয়। গাছের পাতা ভিজা অবস্থায় উহা প্রয়োগ করিতে হয়। নতুবা উহা ঝরিয়া পড়ে।

আটারোগ—আম, জাম, পীচ, কুল প্রভৃতি জাতীয় গাছের কাণ্ড ও শাখা হইতে আটার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ বহির্গত হইতে থাকে। ইহাতে গাছের তেজ কমিয়া যায় ও স্বাস্থ্য খারাপ হয়। এক প্রকার কীট ফল গাছের কাণ্ড বা গাত্রস্থ ত্বক ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, ফলে গাছের গাত্র হইতে আটা নির্গত হয়। ক্ষতস্থান হইতে আটা উঠাইয়া ফেলিলে গাছের গাত্রে যে ছিদ্র দেখা যায় উহার মধ্যে কীট অবস্থান করে। ঐ ছিদ্রপথে ফিনাইল বা কেরোসিন জল দিয়া গোবর মাটি দ্বারা বন্ধ করিয়া দিলে ভাল হয়।

অর্ব্বুদ রোগ—কোন কোন ফল-গাছের কাণ্ড বা শাখা

প্রশাখায় এক প্রকার দোনা গাঁট দৃষ্ট হয়, ইহাকে অর্ব্বুদ রোগ বলে। প্রথম অবস্থায় উহা ক্ষুদ্র থাকে, কিন্তু পরে ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি পাইয়া বৃহৎ আকার ধারণ করে। ঐ সমস্ত গাঁইটের উপরিভাগ কাটা কাটা এবং সময় সময় উহা হইতে আটা নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহা অতি সংক্রামক রোগ। প্রতিকার না করিলে ক্ষেত্রস্থ অন্য গাছেও এই রোগ জন্মে। ইহাতে গাছ দুর্ব্বল হয় এবং ফলন বা উৎপাদন শক্তি হ্রাস পায়। কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ঐ রোগযুক্ত গাঁট কাটিলে ভিতরে ঘায়ের ন্যায় লাল বর্ণ দৃষ্ট হয়। যতদূর পর্য্যন্ত এইরূপ লালবর্ণ দৃষ্ট হইবে ততদূর পর্য্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং উহা চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। এই কর্ত্তিত স্থান কার্ব্বলিক বা ফিনাইল জল দ্বারা ধুইয়া ক্ষতস্থানে বেশ পুরু করিয়া আল্‌কাতরা লেপিয়া দেওয়া আবশ্যক।

উই পোকা—ইহাদের গর্ত্তে পাতলা করিয়া ফিনাইল জল প্রয়োগ করিলে উহারা মরিয়া যায়। ইহারা যে সমস্ত গাছ আক্রমণ করে সেই সমস্ত গাছের গোড়ায় তামাকের আরক ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। খুব পাতলা কার্ব্বলিক দ্রাবণ দ্বারা জমি হইতে এই পোকা বিদূরিত করা যায়। জমি প্রস্তুত করিবার সময় নিমের পাতা বা ছাল সিদ্ধ করিয়া কিংবা নিমের ও রেড়ীর খইল প্রয়োগ করিলে উহাতে উই ধরে না। গন্ধক ও চূণ একত্রে মিশাইয়া অথবা চূণ প্রয়োগ দ্বারা জমি হইতে উই পোকা

বিতাড়িত করা যায়। কার্ব্বলিক পাউডার প্রয়োগেও সুফল পাওয়া যায়।

পিপীলিকা বা পিঁপড়া গাছের খুব ক্ষতি করে। আর্সেনিক চিনি ও ময়দা একত্রে মিশাইয়া পিঁপড়ার গর্ত্তের নিকটে রাখিলে পিঁপড়া উহা খাইলেই মারা যায়।

অন্যান্য শত্রু—এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পশু পক্ষাদি ফল খাইয়া ও নষ্ট করিয়া বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। কাক, বাদুড়, শৃগাল, বানর প্রভৃতি পশু-পক্ষাদিও ফল-গাছের পরম শত্রু।

উলু, মন্দা, পরভোজী অর্কিড, আলগুসি প্রভৃতি নানা-জাতীয় আগাছা ও পরগাছা বৃক্ষাদির বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণের হাত হইতে জমি এবং গাছপালা মুক্ত রাখিতে হইবে।

আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি

ফল-বাগান করিতে হইলে ফল-বাগানের উপযোগী ও ব্যবহার্য্য কতকগুলি যন্ত্রপাতি রাখা উচিত। জমির মাটি কোপাইতে, গাছের গোড়া খুঁড়িতে, নিড়াইতে, গাছের ডালপালা ও শিকড় ছাঁটিতে, বড় গাছের ডাল কাটিতে, কলম প্রস্তুত করিতে এবং জমিতে ও গাছে জলসেচন করিতে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদি আবশ্যক হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বাগানের আবশ্যকীয় আরও অনেক উপকরণ আছে। উহা ঠিক সময় মত না পাইলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়, এজন্য ফল-বাগানে পূর্ব্ব হইতেই এগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার।

ট্রাক্টর—ইহার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ফলকর উদ্যানেই হইতে পারে, সাধারণ ফলকর উদ্যানে ছোট ছোট ট্রাক্টর ও ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ব্যয় সাপেক্ষ, ট্রাক্টর সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে এরূপ লোকের দ্বারাই উহা চালান উচিত। নচেৎ উহাতে যে কোন প্রকারে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। যাঁহারা ট্রাক্টর ব্যবহার করিবেন তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে (Repairing) কারখানা এবং ঐ সম্বন্ধীয় কোন অভিজ্ঞ মিস্ত্রী আছে কিনা।

লাঙ্গল—জমি প্রস্তুত করিতে সর্ব্বাগ্রেই ইহা আবশ্যক হইয়া থাকে। বিভিন্ন শস্যের চাষে হাল্কা লাঙ্গল হইলেই চলে, কারণ উহাতে ভাসা চাষ দিতে হয়; কিন্তু ফলের জমিতে চাষ দিতে হয় বলিয়া ভারি লাঙ্গল আবশ্যক।

কোদাল—লাঙ্গলের পরই কোদালের আবশ্যক হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লাঙ্গল দ্বারা সকল স্থানে জমি চষা চলে না। গাছের মধ্যে যেখানে লাঙ্গল চালান যায় না সেখানে কোদালের দ্বারা এই কাজ করা হয়। অল্প জমিতে লাঙ্গল অপেক্ষা কোদালে কম খরচে কাজ সমাধা হয়। কোদাল ২।৩ প্রকারের আছে। একপ্রকার হেলা ছোট কোদাল, একপ্রকার দাঁড়া কোদাল, আর একপ্রকার ৫।৬টী দাঁত বা গজালের ন্যায় বিন্ধকযুক্ত লোহার বা ইস্পাতের পাত বিশিষ্ট কোদাল। গাছের গোড়া কোপাইতে হেলা ছোট কোদাল, জমিতে মাটি বা ঢেলা ভাঙ্গিতে এই গজালযুক্ত কোদাল (Pronged hoe) এবং সাধারণ ভাবে জমি কোপাইবার জন্য দাঁড়া কোদাল কার্য্যকরী।

মই—জমি সমতল করিতে ও ঢেলা ভাঙ্গিতে আবশ্যক হয়।

নিড়েন ও খুরপী—ছোট অবস্থায় বা ছোট ছোট গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আল্‌গা করিতে ও ঘাস বাছিতে ইহা আবশ্যক হয়।

ঘাস জাতীয় তৃণ কাটিতে **কাস্তে,** গাছের সাধারণ ডাল কাটিতে **দা** বা **কুঠার** এবং মোটা ও শক্ত ডাল সমান ভাবে কাটিতে **করাত** প্রভৃতি যন্ত্র আবশ্যক হইয়া থাকে।

ঝারি (বোমা বা ঝাজরা)—ইহা দ্বারা খুব সূক্ষ্মধারে গাছে জল দেওয়া যায়। বোমার মুখে সূক্ষ্ম ও বহু ছিদ্র মুখ বিশিষ্ট ঝাজরা থাকায় খুব সরুধারে জল পড়ে। ইহার দ্বারা গাছ উত্তমরূপে স্নাত হইয়া থাকে।

পিচকারী—(Garden Syringe বা Sprayer) গাছের পত্রাদি ধৌত করিতে এবং দূরে ও উর্দ্ধে জল দিতে পিচকারী আবশ্যক হয়।

Knapsack sprayer—তরল পদার্থ ছিটাইতে ও Rotary Dust পাউডার ছড়াইতে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োগে ইহার সাহায্য লইতে হয়।

আঁচড়া—ইহা দ্বারা জমির মাটিকে আলগা করা যায় ও জমি হইতে আগাছা বা ঢেলা বাছিয়া ফেলা যায়।

Prunning Knife—গাছের সরু শাখা-প্রশাখাদি কাটিবার জন্য ইহা আবশ্যক হইয়া থাকে।

Prunning Scissors—গাছের সরু শাখা-প্রশাখাদি ছাঁটিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে স্প্রিং দেওয়া থাকে।

Garden Shears—ইহা আর এক প্রকার চওড়া আকারের কাঁচি, উহা ২॥ ফিট দীর্ঘ। ঈষৎ মোটা ডাল কাটিতে ইহা ব্যবহার্য্য।

Grafting Knife ও **Budding Knife**—যথাক্রমে কলম প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলার অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র।

এতদ্ব্যতীত মাপিবার ফিতা (Measuring Tape), মস বা নারিকেল ছোবড়া, দড়ি, ঝুড়ি, বালতি, ঝালতী, বাঁশ, কাটারি, শাবল, মই বা সিঁড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

গাছ বৃদ্ধি ও ফলবতী করিবার উপায়।

বিবিধ কারণে গাছে ফল ধরে না। প্রথমতঃ জলবায়ু বা আবহাওয়া ইহার উপযোগী না হইলে, মৃত্তিকা শক্ত বা খারাপ হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে জলের অভাব হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে সূর্য্যকিরণ এবং আলোক ও বাতাস না পাইলে, জমিতে অধিক পরিমাণে সার প্রদান করিলে, গাছের অধিক তেজ হইলে, গাছ অতিশয় দুর্ব্বল হইলে এবং কীটাক্রান্ত হইলে গাছ অনেক সময়ে ফলধারণে বিরত থাকে। এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া ও অসুবিধা দূর করিয়া গাছের অনুকূল অবস্থা আনয়ন করিতে পারিলে গাছ পুনরায় ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

কোন গাছ বা চারা বিদেশ বা কোন বিভিন্ন স্থান হইতে আনিতে হইলে উভয় স্থানের আবহাওয়া বা জলবায়ুর গুণা-গুণের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। আবহাওয়ার অনুকূল অবস্থায় সুফল লাভের এবং প্রতিকূল অবস্থায় বিফল মনোরথের বিশেষ সম্ভাবনা।

গাছের গোড়ার মাটি শক্ত হইয়া গেলে ইহার শিকড় বাড়িতে না পাওয়ায় এবং মাটি হইতে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারায় বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কোন খারাপ মৃত্তিকাতে অথবা যে জমি ফল গাছের পক্ষে উপযোগী নহে এরূপ মাটিতে গাছ লাগাইলে গাছ বৃদ্ধি পায় না এবং

অনেক সময় উহা মরিয়া যায়। সকল জমিতে সকল স্তরের মৃত্তিকা সমান থাকে না। হয়ত উপরের স্তরের মৃত্তিকা খুব ভাল থাকে কিন্তু তাহার নিম্নস্তরের মৃত্তিকা খুব খারাপ। এরূপ জমিতে ক্ষুদ্র মূল বিশিষ্ট উদ্ভিদ জন্মিতে পারে কিন্তু দীর্ঘ মূল বিশিষ্ট ফল গাছের পক্ষে সেরূপ ক্ষেত্র উপযোগী নহে। গাছ যদি দীর্ঘমূল বিশিষ্ট হয় সে ক্ষেত্রে (গাছ অধিক পুরাতন না হইলে) গাছের গোড়ায় জল প্রয়োগে মাটী নরম করিয়া গাছের কাণ্ড হইতে এক হাত আন্দাজ দূরে গোলাকার ভাবে চতুর্দ্দিকে খুঁড়িয়া (যতটা মূল প্রবেশ করিয়াছে) শিকড় সমেত উহা আস্তে আস্তে তুলিতে হয়। ইতিমধ্যে নির্দ্ধারিত ভূমিতে গভীর ও প্রশস্ত গর্ত্ত খুঁড়িয়া (গাছের মাপ অনুযায়ী) তাহাতে ছাই ও আবর্জ্জনা ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে। এক্ষণে উত্তোলিত গাছটী প্রস্তুত জমিতে বসাইয়া জল দিতে হইবে। গাছ অপেক্ষা কৃত পুরাতন হইলে উহা বসাইবার পূর্ব্বে শিকড় ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত।

জমিতে জল জমিলে উহা নিকাশের ব্যবস্থা না করিলে এবং আবশ্যক মত পুনরায় জল প্রদান না করিলে গাছের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে এবং উহা ফলদানে বিরত হয়। ফলের বাগানের জমি কিছু উঁচু হওয়া দরকার। জমিতে নালা রাখিয়া জল প্রবেশের ও নিকাশের সুবন্দোবস্ত রাখা দরকার।

অতিরিক্ত ছায়াযুক্ত স্থানে গাছ লাগাইলে এবং খুব ঘন-

ভাবে গাছ লাগাইলে জমির মধ্যে সূর্য্যালোক ও বাতাস খেলিতে পারে না। ইহাতে গাছ বৃদ্ধি পায় না ও ফল ধরে না ; অনেক সময়ে ইহা কীট-পতঙ্গের আবাসস্থল হয়।

জমিতে সার না থাকিলে সার প্রয়োগ করা দরকার। জমিতে এরূপভাবে সার প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে জমি ও গাছের ক্ষতি না হয়। অত্যধিক তেজ হইলে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া উহাতে রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হয় এবং আবশ্যক হইলে শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং প্রয়োজন হইলে ডাল পাতাও ছাঁটিতে হইবে। বস্তুত শিকড় ও ডাল পাতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ডাল, পাতা ও শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছের মূল কাণ্ড ও শাখা গুলিকে জোর করা ব্যতীত গাছকে সু-আকৃতিতে আনিবার জন্যও ছাঁটাইএর প্রয়োজন, সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মূল ও কাণ্ডের সহিত সমন্বয় রাখিয়াই ডাল পালা বৃদ্ধি পায়। কোন ডাল পালা বিকৃতরূপ ধারণ করিতেছে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ উহা কাটিয়া ফেলা উচিত।

প্রকৃতি উপযুক্ত সময় বংশ বৃদ্ধির সহায়তার জন্য গাছে অফুরন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু খুব ঘন ফল হইলে উহা ছোট হয় ও স্বাদ ভাল হয় না, সুতরাং ফলকরের ফলের ঐ ঘনতা নষ্ট করা উচিত, উহাতে ফলের গঠন, রং ও স্বাদ উৎকৃষ্ট হয় এবং ফলও বড় হয়।

কোন কোন সময় একপ্রকার পিঁপড়া ও উইপোকা গাছের

গোড়ায় বাসা করিয়া গাছের শিকুড় প্রভৃাত কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। এরূপ স্থলে গাছের গোড়ায় তূঁতের জল, তামাকের জল প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। এইরূপে সকল দিক দেখিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আম বা আম্র

(Mango)

আম ইংরাজীতে ম্যাঙ্গো, তেলেগু ভাষায় মাবিড়ি, মালাবারে মা, মহারাষ্ট্রে আম্বাফল, কর্ণাটে মাবিণ ফল, গুজরাটে আম্বো, তামিলে মাঙ্গা, সিংহলে আম্বা, মালয়ে মেঙ্গা ও আরবদেশে অম্বজ বলে। সংস্কৃতে ইহা আম্র, রসাল, চ্যূত, মাকন্দ, মধুদূত ও কামাঙ্গ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে আম্রবৃক্ষের সহিত ভারতবাসীর ধর্ম ও জাতীয় সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ আম্রবৃক্ষকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। কোন স্থানে গমন করিবার সময়, বিবাহাদি মঙ্গল উৎসবে অথবা দেব-দেবীর পূজাদিতে আম্রশাখার আবশ্যক হয়। হিন্দুর অতি প্রাচীন গ্রন্থ বেদেও আম্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সুতরাং ইহা যে ভারতবর্ষীয় ফল এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে আম্রের চাষ হইয়া আসিতেছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। এসিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহেও আম্র জন্মিয়া থাকে। বর্তমানে ফ্লোরিডায় (আমেরিকায়)

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, মেটাল (আফ্রিকায়) ও মাণ্টা-দ্বীপে, কুইন্সল্যাণ্ডে (অষ্ট্রেলিয়ায়) ইহার চাষ হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে নীত হইয়া ইহা ব্রহ্মদেশ, চীন, শ্যাম, মালাক্কা, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপ সমূহে এবং সিলোন, সিঙ্গাপুর, আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো, জাভা, মরিসাস, সিসেলিস, মালয়, ইজিপ্ট এবং আরবের মস্কট প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ অত্যুচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থানেই অল্পাধিক আম্রের চাষ দৃষ্ট হয়। হিমালয়স্থ গিরিশৃঙ্গেও আমের গাছ আছে, এজন্য অনেকের মতে হিমালয়ের পাদদেশ সমূহেই আম্রের আদি জন্মস্থান। সমুদ্র তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ হাজার ফিট উচ্চ প্রদেশে ইহা ভাল-ভাবে জন্মিয়া থাকে। সমগ্র ভারতে এত অধিক প্রকার আম্রের নাম আছে যে তাহা বলা কঠিন। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই অতি প্রাচীনকাল হইতেই জংলা গাছের ন্যায় স্বভাবতই বহু আম্রবৃক্ষ জন্মিতেছে। যে স্থানে স্বভাবতঃই কোন গাছ আপনা হইতেই অযত্নে জন্মে সেই স্থানকে উক্ত গাছের আদি জন্মস্থল বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভারতে অবহেলা প্রযুক্ত যেরূপ ভাবে ইহা জন্মে অন্যান্য দেশে যত্ন করিলেও এত অধিক গাছ জন্মাইতে পারা যায় না, সুতরাং ভারত যে আম্রের আদি জন্মস্থান ইহাতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের শীতপ্রধান স্থান ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অংশে অল্পবিস্তর আম্র জন্মিয়া থাকে। শীতপ্রধান স্থান ইহার চাষের

পক্ষে উপযোগী নহে। বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, গয়া, দ্বারভাঙ্গা, গাজীপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মজঃফরপুর জেলার হাজিপুর, দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের বাঙ্গালোর, রাজপুতানার চিতোর এবং বাংলার মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র জন্মিয়া থাকে। এক বাংলা দেশেই বহু বিভিন্ন জাতীয় আম্র দৃষ্ট হয়।

নিম্নে কতিপয় উৎকৃষ্ট আমের জন্মস্থান ও বিবরণ দেওয়া হইল।

অনুপান—চূণখালির আম। স্বাদে অতুলনীয়, ওজনে ১½ পোয়া, আষাঢ় মাসে পাকে।

অরুণভোগ—ইহা কোচিন দেশের আম। সৌগন্ধযুক্ত সুমিষ্ট ফল, ওজনে ½ সের হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পাকে।

অংবিণ (হনি)—ফলে মধুগন্ধ, ওজনে ১½ পোয়া, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাকে।

অমৃতভোগ—মুর্শিদাবাদের আম। ফল অনেকাংশে গোল, ঈষৎ চ্যাপ্‌টা, মিষ্ট ও আঁশহীন, খোসা পাতলা, ওজনে ১½ পোয়া—½ সের হয়। ইহা পাকিয়া যাইবার পরেও ১০।১২ দিন ঘরে রাখা চলে, নষ্ট হয় না, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

আলি পছন্দ—কোচিনের আম। সুস্বাদু, গন্ধ মনোহর, ঝড়সহিষ্ণু; ওজনে ১ পোয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পাকে।

আমির—ইহা ইব্রাহিমপুরের প্রসিদ্ধ আম। ফল হলদে-

রংয়ের, লাল রংয়ের সুমিষ্ট শাঁস, আঁশবিহীন ওজনে ১½ পোয়া। পাকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

আমির—মুর্শিদাবাদের আম। ফল সুমিষ্ট, শাঁস লাল রংয়ের, ওজনে ১½ পোয়া হয়। পাকে আষাঢ় মাসে।

আমিনা—ইহা মান্দ্রাজের আম। আঁশ শূন্য, অতি মধুর, ওজনে তিন পোয়া। আষাঢ় মাসে পাকিতে থাকে।

আমির পছন্দ—গুলবাগের আম। ওজন ১½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে।

আঁধার মাণিক—গাঢ় সবুজ রংয়ের ফল, শাঁস সোনালি রংয়ের, ওজনে ½ সের হয়, পাকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

আর্চ্চাই—মুর্শিদাবাদের আম। ফল আঁশ শূন্য, ওজনে ১ পোয়া, পাকে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে।

আনারসি—মুর্শিদাবাদের আম। দেখিতে অনেকাংশে অমৃতভোগের ন্যায়, পাকিলে আনারসের গন্ধ অনুভূত হয়। ফল মিষ্ট, সুগন্ধ ও আঁশহীন, ওজনে ১½ পোয়া—½ সের হয়। অমৃতভোগের সঙ্গেই পাকে।

উমদাবেগম মুর্শিদাবাদের আম। অতি উপাদেয়। ওজনে ১½ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

কাউন্সিল পছন্দ - ফল সুমিষ্ট, লম্বা ১২" পর্য্যন্ত হয়, ওজনে ১ পোয়া, আষাঢ় মাসে পাকে।

কালাচাঁদ—ইহা অতি উৎকৃষ্ট আম। ওজনে ½ সের হয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পাকে।

কালাপাহাড়—ইহা মালদহের আম, কেহ কেহ বলেন ইহা মুর্শিদাবাদে আসিয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ফল প্রায় গোল, নিম্নাংশ ঈষৎ লম্বা, আঁটি ছোট, আঁশহীন, মিষ্ট ও রসাল, ওজনে ১½ পোয়া—½ সের হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে পাকিতে আরম্ভ করে এবং আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত গাছে থাকে। বাজারে সাধারণতঃ কালাপাহাড় নামে যে আম পাওয়া যায়, মুর্শিদাবাদের কালাপাহাড়ের সহিত ইহার তুলনা হয় না। পক্ক অবস্থায় আম্রের বর্ণ পরিবর্তন হয় না, এজন্য আমের উপরিভাগ দেখিয়া উহা পাকিয়াছে কিনা ঠিক বুঝা যায় না। ফল পাড়িয়া আনিয়া ৩।৪ দিন ঘরে রাখিয়া দিলে খাইবার উপযোগী হয়, নতুবা ঈষৎ অম্লাক্ত বোধ হইবে, কিন্তু পক্ক আম অধিক দিন ঘরে রাখিয়া দিলে স্বাদের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

কাঁচামিঠা—নামের সহিত ইহার গুণেরও ঠিক সামঞ্জস্য আছে। সাধারণ আম যেমন কাঁচা অবস্থায় টক থাকে এবং পক্ক অবস্থায় মিষ্ট আস্বাদযুক্ত হয় ইহার পক্ষে কিন্তু ঠিক তাহা নহে। কাঁচা অবস্থাতেই বরং ইহা অনেকাংশে মিষ্ট কিন্তু পাকিলে পানসে হইয়া যায়, কোন আস্বাদন থাকে না, শীঘ্র পাকে।

কালিমুক্কু—প্রসিদ্ধ দক্ষিণ ভারতবর্ষের আম। ওজনে ½ সের হয়, পাকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

কিষেনভোগ—ফলে আঁশ নাই, পেঁপের ন্যায় আঁশহীন

সুমিষ্ট আম্র। ওজনে ৩ পোয়া হইতে ১ সের হয়। জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে পাকিতে আরম্ভ করে ও আষাঢ়ের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গাছে থাকে। ত্রিহুত হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া ইহা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এজন্য মুর্শিদাবাদের আমের মধ্যে ইহাকে গণ্য করা হয়।

কুয়া পাহাড়—ইহা মুর্শিদাবাদের উৎকৃষ্ট আম, প্রচুর ফলে, ওজন ১ পোয়া, পাকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

কুমড়াজালি—মালদহের আম, ফল মিষ্ট ও বড়, ওজনে ১ পোয়া হইতে ½ সের হয়, আষাঢ মাসে ফল পাকে।

কোপাহাড়ী—আমের মিষ্টতা কিছু অল্প, অধিকন্তু আঁশযুক্ত, আকার লম্বা, তলায় নাক আছে, ½ সের হইতে ৩ পোয়া পর্য্যন্ত ভারী হইয়া থাকে, আষাঢ় মাসে পাকে।

কোহিনুর—মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ উচ্চশ্রেণীর আম। ওজনে ½ সের হয়, পাকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে।

কোহিনুর—বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম সর্ব্বোৎকৃষ্ট আম। ফল সুমিষ্ট আঁশহীন ও কোমল। এক একটী আম ওজনে ½ সের—৩ পোয়া হয়। জ্যৈষ্ঠের প্রথম হইতে পাকিতে আরম্ভ করে এবং আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গাছে থাকে।

খরমুজা—মুর্শিদাবাদের আম, আকার অনেকটা গোল, আম পাকিলে খুরমুজার ন্যায় গন্ধ অনুভূত হয়, ফল আঁশহীন ও সুমিষ্ট, ওজনে ১½ পোয়া হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে এবং অল্প দিনেই ঝরিয়া যায়।

খানান পছন্দ—অতি সুমিষ্ট, আঁশশূন্য আম। ওজনে ১ পোয়া হয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পাকে।

খাসনাড়া—খুব নামজাদা আম। ওজনে ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠের শেষে আষাঢ়ের প্রথমে।

খাঁজরি—উৎকৃষ্ট জাতীয় আম, ওজনে ১ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পাকে।

খাসা—(ইব্রাহিমপুর)—ইহা ইব্রাহিমপুরের প্রসিদ্ধ আম। ওজনে ১½ পোয়া, পাকে আষাঢ়-শ্রবাণ মাসে।

খেঁজুর গুড়—অতি সুস্বাদু আম, ফলে আরবদেশীয় খেঁজুরের ন্যায় গন্ধযুক্ত, ওজনে ১ পোয়া হয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পাকে।

খুসুল খাস—অতীব তৃপ্তিদায়ক মিষ্ট আম। ওজনে ১½ পোয়া, পাকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

গোয়া—দাক্ষিণাত্যের অতি সুন্দর জাতীয় আম, ওজনে ১½ পোয়া, আষাঢ় মাসে পাকে।

গোলাপখাস—ইহা টালিগঞ্জের প্রসিদ্ধ আম। আঁশহীন, লাল আভাযুক্ত বর্ণ, ফল গোলাপ গন্ধযুক্ত, ওজনে ১½ পোয়া হয়, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

গোপালধোবা—বারুইপুরের বিখ্যাত আম। ইহা আঁশহীন, প্রচুর ফলে, সুমিষ্ট, ওজনে ½ সের হয়, আষাঢ় মাসে পাকে।

গোপালভোগ—প্রথমে বোম্বাই হইতে আনীত হয়, কিন্তু মালদহে আসিয়া আমের উৎকর্ষ সাধিত হয়। আম খুব মিষ্ট ও

সুগন্ধযুক্ত, খোসা পাতলা, আঁশহীন, পাকিলে অনেকটা কমলালেবুর বর্ণের হয়, ওজনে ১—১½ পোয়া হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পাকিতে আরম্ভ করে এবং আষাঢ়ের প্রথম ভাগেই ফুরাইয়া যায়।

চম্পা (হুজুর পছন্দ)—অতি দুর্লভ আম, ফলে চাঁপাফুলের গন্ধ, সুস্বাদু, ওজন প্রায় ১ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

চালতা খাস—খুব বড় আম, সামান্য আঁশযুক্ত শাঁস, ওজন ১½ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

জর্দ্দালু—ভাগলপুরের উৎকৃষ্ট আম, সুস্বাদু, পাতলা আবরণ ও আঁশহীন, ওজন ১ পোয়া, পাকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে।

জাফ্রান (মুর্শিদাবাদের)—মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ আম। ফল সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত, ওজন ১ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। জাফ্রান (সাহাবাদ)—মুর্শিদাবাদ আমেরই অনুরূপ।

জাহাঙ্গীর—অতি সুন্দর আম, আঁটি ছোট, ওজন ১ পোয়া, পাকে ভাদ্র মাসে।

জলমুরাই—ফল অতি তৃপ্তিকর, ওজন ১ পোয়া, পাকে আষাঢ় মাসে।

জাভা—ফল মিষ্ট, শাঁস পুরু, ওজন ½ সের, পাকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

জালিবান্ধা—মালদহের আম, এই আম আকারে অতিশয় বড় হয়। সময় সময় /॥০ সের—/১ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। জালি দিয়া ইহা বাঁধিয়া রাখিতে হয়, এজন্য বোধ হয়

ইহার এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই আম দীর্ঘ নাক বিশিষ্ট, ফলের বর্ণ অনেকটা সাদা, দেখিতে ফজলির মত ; ফজলির সহিত এক সঙ্গেই পাকে।

তাইমুরিয়া—লম্বা জাতীয় আম। ফল সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত, ওজনে ১ সের হয়। পাকে শ্রাবণ মাসে।

তালাবি—ইহা মুর্শিদাবাদের দুর্লভ আম, বরফের ন্যায় গলিয়া যায়, ওজন্ ১ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

তোতাপুরী—মাদ্রাজের আম, পাকিলে আমের গাত্রের বর্ণ সুবর্ণ রঙের হয়, ফল একটু লম্বা, নাক আছে, অল্প আঁশযুক্ত ও সুগন্ধ, ফল ওজনে ½ সের হয়, আষাঢ়-শ্রাবণে পাকে।

তোয়াসেখ—খুব বড় জাতীয় ফল, সুমিষ্ট, ওজনে ½ সের পর্য্যন্ত হয়, পাকে আষাঢ় মাসে।

দসেরী বড়—ইহা লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ আম। খুব বড় সাইজের হয়, ওজনে ১½ পোয়া হয়, পাকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে।

দশেরী ছোট—তৃপ্তিকর, সুগন্ধযুক্ত, ওজনে ১ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

দাউদিয়া—আঁশশূন্য, প্রচুর ফলে, ঝড়সহিষ্ণু, ওজন ২ সের, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাকে।

দিলপছন্দ (মাদ্রাজ)—মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ আম, ফল উৎকৃষ্ট, ওজন ১ পোয়া, আষাঢ় মাসে পাকে।

দিলপছন্দ (ঢাকা)—ইহা ঢাকার আম। দেখিতে অতি সুন্দর, অতি সুস্বাদু, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

দিলসাদ—ইহা মুর্শিদাবাদের দুষ্প্রাপ্য আম। আঁটি অতি ক্ষুদ্র, খোসাও খুব পাতলা, আঁশশূন্য, সুস্বাদু ও সুগন্ধি ফল, শাঁস হলদে, মুখে দিলে জিহ্বার চাপে গলিয়া যায়, ওজনে এক সের হয়, পাকিবার সময় জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ।

দুধিয়া—ইহার আকার ছোট ও গোল, ফল আঁশযুক্ত, পাকিলে ভিতরের বর্ণ সাদা থাকে, এজন্য ইহার এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। সুমিষ্ট ও দুগ্ধে খাইবার উপযুক্ত। বৈশাখের শেষে পাকিতে আরম্ভ করে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই ফুরাইয়া যায়।

দোফলা—বৎসরে দুইবার ফলে, ওজন ১ পোয়া।

নবাবভোগ—অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় আম, ওজন ½ সের হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

নবাবপছন্দ—ইহা নামজাদা আম। ওজন ১ সের, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

নজরাত পছন্দ—ইহা মুর্শিদাবাদের দুর্লভ আম। ওজনে ১½ পোয়া হয়, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

নায়া মালিয়াবাদ—অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল, ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

নাজির পছন্দ—অতি সুস্বাদু আম, ওজন ½ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

নিলাম—ইহা মাদ্রাজের আম, ফল অতি মিষ্ট, শাঁস আঁশহীন, লাল, বৎসরে দুইবার ফলে, ওজনে ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ মাসে।

নিলাম্মদি—অতি সুন্দর, রসাল, ওজনে ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

নিম চৌধুরী—ইহা জয়নগর বারুইপুরের আম, বড় সাইজের ফল, ওজন ½ সের, পাকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে।

পাঁচরিশি—কাঁচা অবস্থায় মিষ্ট, ওজন ১ পোয়া, বৈশাখ মাসে পাকে।

পাঞ্জা পছন্দ বা হীরা—মুর্শিদাবাদের উৎকৃষ্ট আম, ওজন ½ সের, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

পিটার—কোচিনের উৎকৃষ্ট আম, খোসা খসখসে, আঁশ শূন্য, ওজন ½ সের, আষাঢ় মাসে পাকে।

পিটার পছন্দ—ইহা সালেমের আম, আঁশ শূন্য ও অতি সুমিষ্ট। আঁটি ছোট, ওজন প্রায় ৩ পোয়া, পাকে আষাঢ় মাসে।

পেয়ারাফুলি—আমে অম্ল ভাগ কম, কাঁচা অবস্থায়ও ইহা খাওয়া চলে, পক্ক অবস্থায় ইহা সুমিষ্ট ও সুস্বাদু হয়, ফলে অল্প আঁশ আছে, ওজনে ½ পোয়া হয়। বৈশাখ মাসের শেষ হইতে পাকিতে আরম্ভ করে। ইহা মুর্শিদাবাদের আম।

ফজলি—মালদহের প্রসিদ্ধ আম, খোসা পাতলা, আঁটি ছোট, সুমিষ্ট, কিন্তু অল্প আঁশযুক্ত। পক্ক আম অধিক দিন ঘরে

রাখা চলে না, কোন স্থানে আঘাত লাগিলেই অল্প সময়ে আহত স্থানে পচ ধরে। ফজলি আম বর্ণভেদে সিন্দুরে লাল, কাল ও সাদা রঙের আছে। সাদা ও লালের আকার বড় হয়, কিন্তু আস্বাদনে কাল ফজলিই অধিক সুমিষ্ট। ফল ওজনে ১½ সের—২ সের হয়, শ্রাবণ মাসে পাকে।

ফেরদৌস পছন্দ—অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় আম। ওজন ১½ পোয়া। পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

বড় সাহী—মুর্শিদাবাদের আম। ওজন ৩ পোয়া—১½ সের হয়, পাকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে।

বড় সিন্দুরিয়া (দাউদভোগ)—দেখিতে মনোলোভা, ওজন ১½ পোয়া, পাকে আষাঢ় মাসে।

বাদামি—ইহা সালেমের আম, আঁশ শূন্য, অতি মিষ্ট ফল, ওজনে ১½ পোয়া, আষাঢ় মাসে পাকে।

বাংলাওয়ালা (বাঙ্গালীগোলা)—অতি সুমিষ্ট ওজন ১½ পোয়া, পাকে আষাঢ় মাসে।

বাঁশবেড়ে—খুব ভাল আম, ওজন ১ পোয়া, পাকে আষাঢ় মাসে।

বারমেসে—ইহা বৎসরে তিনবার ফলে সেজন্য ইহার অপর নাম 'তেফলা'। প্রায় সব সময়ে পাওয়া যায়, ওজন ১ পোয়া।

বাটাজোড়া—মালদহের আম। ফল মিষ্ট ও বড়। ওজন ৫ পোয়া—১½ সের হয়। জ্যৈষ্ঠের শেষে পাকিতে আরম্ভ হয় এবং আষাঢ়ের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত থাকে।

বিমলি—মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ আম। ফলের আকার গোল, সুমিষ্ট, ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

বিশ্বনাথ মুখোঃ—বাংলার খ্যাতনামা আম। ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

বৃন্দাবনী—ছোট ছোট গোলাকার ফল অসংখ্য ফলে, সুগন্ধযুক্ত ও সুমিষ্ট। ফল পাকিলেও সবুজ আভা বিশিষ্ট থাকে, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে এবং আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

বেগমফুলি--খুব বড় সাইজের আম, অতি মিষ্ট, ওজন ১½ সের হয়, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে। পাকিলে রং হলদে হয়।

বাইগনোপল্লী (বেগমফুলি রাজা)—ইহা মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ আম। ওজনে প্রায় /২ সের হয়, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

বেগম পছন্দ—ইহা মুর্শিদাবাদের উৎকৃষ্ট আম। ফল লম্বা-জাতীয়, সুমিষ্ট, ওজন ১ পোয়া শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাকে।

বেলখাস—ইহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আম নহে এবং ফলও খুব বড় হয় না, ফল হইতে বিস্তর আটা বহির্গত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে আমের পাতায় ও ফলে কাঁচাবেলের ন্যায় গন্ধ অনুভূত হয়।

বোম্বাই-সারোলি—ফল অতি সুমিষ্ট, ওজন ১ পোয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

বোম্বাই চিতলি—উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল, সুমিষ্ট, ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

বোম্বাই ধর—আঁশশূন্য, সুমিষ্ট, ওজন ১ পোয়া, পাকে ভাদ্র মাসে।

বোম্বাই পাইরী—জনপ্রিয়, লোহিতাভ, ওজন ১ পোয়া, পাকে ভাদ্র মাসে।

বোম্বাই সুরত—সুমিষ্ট, আঁশশূন্য ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

বোম্বাই হাপুস—সুমিষ্ট আঁশশূন্য, ওজন ১ পোয়া, পাকে বৈশাখ মাসে।

বোম্বাই আলফান্সো—ইহা বোম্বাই হইতে প্রথমে আনীত হয়। এই আমের আকার অনেকটা নোনা ফলের গায়ের অনুরূপ হইয়া থাকে; একটী আম ওজনে ½ সের; আমের খোসা খুব মোটা, আঁটি ছোট। আমের বোঁটা খুব সরু এবং লম্বা; এজন্য ঝড়ে অনেক পড়িয়া নষ্ট হয়। বোম্বাই আমের পাতা লম্বা ও খস্‌খসে হয়। আষাঢ় মাসের শেষে আম পাকে এবং শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

বোম্বাই ভূতো—বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই হয়। প্রচুর ফলে, ফল সুমিষ্ট ও আঁশহীন, ওজনে ১ পোয়া—১½ পোয়া হয়। বৈশাখ মাসের শেষ হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়।

ভবানী চৌরস—প্রচুর ফলে; ওজন তিন ছটাক; পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

ভাদুড়িয়া—ইহার খোসা ও আঁটি পাতলা; ফল সুমিষ্ট ও আঁশহীন। বোঁটা একটু লম্বা হয়; কিন্তু শক্ত থাকায় ঝড়ে বা

বাতাসে সহজে পড়ে না, পাকিলেও আমের বর্ণ কাল থাকে। ওজনে এক একটী আম ১ পোয়া হইতে ½ সের হয়। ইহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, ফজলির ন্যায় ইহা অতি সহজে এবং অল্পে নষ্ট হয় না। পক্ক অবস্থায়ও ৮।১০ দিন ঘরে রাখা চলে, ইহার ফল অনেকটা লম্বাকৃতি, ইহার আর একটী জাতি আছে তাহার ফল অনেকটা গোল। আম শ্রাবণ মাস হইতে পাকিতে আরম্ভ করে এবং ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত থাকে, এজন্য ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

মহারাজ পছন্দ—ইহা দ্বারভাঙ্গার আম। প্রচুর ফলে, ওজন ½ পোয়া, পাকে আষাঢ় মাসে।

মাখন—ফল সুমিষ্ট, তৃপ্তিকর, ওজন ½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই আম প্রচুর ফলে।

মালগোভা—মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ আম। ওজন ১ সের, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। খর্ব্বাকৃতি গাছ।

মাদ্রাজ—গোল, তৃপ্তিদায়ক, ওজন ½ সের, পাকে আষাঢ় মাসে।

মিঠুয়া পাটনা—প্রসিদ্ধ আম, ওজন ½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

মিঠুয়া (রামপুর)—বিখ্যাত আম, ওজন ½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

মোহন ঠাকুর—ফলের আকৃতি উঁচু নিচু, পাতলা আঁটি, অনেকদিন স্থায়ী, ওজন ½ পোয়া, পাকে শ্রাবণ মাসে।

মালদহ—ইহা আঁশ বিহীন ক্ষুদ্র আঁটী বিশিষ্ট আম, ইহা ওজনে প্রায় /১॥৹ সের হয়। তাড়াতাড়ি পাকে।

মোলায়েম জাম—ইহা মুর্শিদাবাদের আম, ফলন কম, অতি উৎকৃষ্ট ফল, ওজন ১½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

মোহনভোগ—মালদহের আম। ফল বেশ সুমিষ্ট ও আঁশহীন। আকার গোল, বিস্তর ফলে। ফলের ওজন ১ পোয়া হইতে আধসের তিন পোয়া পর্য্যন্ত হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে পাকে। ফল বেশ সুপক্ক হইলে ভিতর মিষ্ট হয়, নতুবা অল্প টক লাগে। গাছে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ আম ফাটিয়া নষ্ট হয়।

রাঢ়ি—শাঁস বেশ নরম ও মিষ্ট। মধ্যম আকারের উৎকৃষ্ট ফল। শ্রাবণের শেষভাগে পাকে।

রাজপুরী—মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ আম, ওজন ১ পোয়া, পাকে আষাঢ় মাসে।

রাণী-পছন্দ—মুর্শিদাবাদের উৎকৃষ্ট আম। ওজন ১ পোয়া পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

রাসপূরী—ইহা সালেমের আম, সুমিষ্ট, আঁশ শূন্য, ওজন ৩ পোয়া, শ্রাবণ মাসে পাকে।

রোসনি—ইহা মুর্শিদাবাদের আম। অতুলনীয়, ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

লতানে—ইহা একেবারে লতানিয়া নহে। ইহার গাছ ছোট এবং অনেকাংশ ঝোপ বিশিষ্ট, ডালগুলি মাটির দিকে

ঈষৎ ঝুলিয়া পড়ে এজন্য এরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহার ফল প্রচুর জন্মে, ফলের আকার গোল, পক্ক অবস্থায় সম্পূর্ণ লাল হয় না, বিলম্বে পাকে। ফল মিষ্ট ও সুস্বাদু।

লস্কর শিকান—মুর্শিদাবাদের দুর্ল্লভ আম, ওজন ১½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

লজ্জাত বক্স—ইহা মুর্শিদাবাদের উৎকৃষ্ট আম। ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

লাজুক বদন—মুর্শিদাবাদের আম, প্রচুর ফলে, ওজন ১½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে।

ল্যাংড়া—উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল, বেশ সুমিষ্ট ও আঁশহীন; আবরণ ও আঁটি খুব পাতলা, রং মেটে, পক্ক অবস্থায় অল্প হরিদ্রাভ হয়। ওজনে ½ সের—৩ পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি হইতে পাকিতে আরম্ভ হয় এবং আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

শ্রীদহন—উৎকৃষ্ট আম, ওজন ১½ পোয়া, পাকে ভাদ্র মাসে।

শ্যামভোগ—ইহা মুর্শিদাবাদের আম, সুস্বাদু, ওজন ½ সের, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সন্তম—ইহা দাক্ষিণাত্যের আম। সুমিষ্ট, পাকে চৈত্র মাসে, ওজন ½ সের হয়।

সদাফর—অতি উৎকৃষ্ট আম, সুমিষ্ট, তৃপ্তিকর, ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সরবতী—ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সরিখাস—মালদহের উৎকৃষ্ট আম, খোসা পাতলা, আঁটি ছোট, আঁশহীন, অল্পদিনে ফলে কিন্তু ফল খুব বড় হয় না; ½ পোয়া হইতে ১ পোয়া পর্য্যন্ত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পাকিতে আরম্ভ হয় এবং ২।৪টি করিয়া মাসাধিক কাল ধরিয়া পাকে, একসঙ্গে সব পাকে না।

সফেদা—ইহা পশ্চিমের আম, মিষ্ট, ওজনে সুকুলের অনুরূপ। অধিক পাকিলে পানসে হইয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

সাবজা—অতি. উৎকৃষ্ট আম, ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সাদক পছন্দ—উল্লেখযোগ্য আম, ওজন ১½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সফদর পছন্দ বা বাঁড়া—ইহা মুর্শিদাবাদের উৎকৃষ্ট আম, ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে।

সারদকামুথু—উল্লেখযোগ্য আম, ওজন ১ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সাদওয়ালা—আরামপ্রদ আম, ওজন ১½ পোয়া, পাকে আষাঢ় মাসে।

সানাকুলু—ইহা দাক্ষিণাত্যের আম। খুব মিষ্ট, ওজন ১½ পোয়া, পাকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সিপিয়া—মুর্শিদাবাদের আম, অনেকাংশে বোম্বাই আমের অনুরূপ, এজন্য অনেকে সিপিয়া বোম্বাই বলিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে পাকে।

সুলতান পছন্দ—সুশ্রী, ওজন ১½ পোয়া, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সুবর্ণরেখা—দাক্ষিণাত্যের আম, প্রচুর ফলে, ওজন ১½ পোয়া—½সের, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। লাল সিন্দুর বর্ণের আম, বৈশাখের প্রথমে বাজারে আনীত হয় ও গোলাপ খাস বলিয়া বিক্রয় হয়।

সুন্দর সা—সুমিষ্ট আম, ওজনে ৩ পোয়া পর্য্যন্ত হয়, বর্ণ সিন্দুরে। আষাঢ় মাসে পাকে।

সুকুল—পশ্চিমের আম; মিষ্ট ও বড় আঁশযুক্ত। ওজনে ½ সের—৩ পোয়া পর্য্যন্ত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পাকে এবং আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

হাড়ীর বাড়ী—জয়নগর বারুইপুরের আম। প্রচুর ফলে ওজন ১ পোয়া—½ সের, পাকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে।

হাওজে কাওসার—অতি উৎকৃষ্ট আম, ওজন ½ সের, পাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।

হ্যামলেট—আঁশ শূন্য, সুমিষ্ট, সুশ্রী, ওজন ১ সের, পাকে শ্রাবণ মাসে।

হিমসাগর—মালদহের আম, ফল মিষ্ট, আঁটি ছোট, ওজনে ½ সের—৩ পোয়া হয়। আষাঢ মাসে পাকে।

ক্ষীরসাপাতি—মালদহের আম, সুমিষ্ট, ফল কিঞ্চিৎ লম্বা, নাক আছে। ওজনে ১ পোয়া পর্য্যন্ত হয়, অল্পে পচিয়া যায় না, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

চারা বা কলম উৎপাদন

সাধারণতঃ বীজ ও কলম হইতে উভয় প্রকারেই আম্রের গাছ জন্মান হইয়া থাকে। আঁটির গাছের ফল প্রায়শঃই মাতৃ-বৃক্ষের অনুরূপ হয় না। এতদ্ভিন্ন আঁটির গাছের ভাবী ফলের আকৃতি ও গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

আঁটি হইতে চারা প্রস্তুত করিবার সময় সাবধানে বীজের বহিরাবরণটি ছাড়াইয়া ফেলিয়া উক্ত বীজ বপন করিলে গাছের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রধানতঃ কাণ্ড ও শিকড় বক্র হয় না ও আঁটি অঙ্কুরিত হইবার প্রায় ৭।৮ দিন পূর্ব্বে উহা অঙ্কুরিত হয়। এরূপ গাছ শীঘ্র ফলে এবং আদি গাছের ফল অপেক্ষা এই গাছের ফল কোন অংশে নিকৃষ্ট ও ছোট হয় না। তবে এরূপভাবে আবরণটী বাহির করিতে হইবে যাহাতে ভিতরের শাঁসে কোন প্রকার আঘাত না লাগে। এই প্রক্রিয়াতে চারা জন্মাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

জোড় কলম, গুল কলম, দাবা কলম, জিব কলম ও চোক কলম প্রভৃতি দ্বারা আম্র বৃক্ষের কলম প্রস্তুত করিতে পারা যায়। প্রধানতঃ জোড় কলম ও গুল কলম দ্বারা আম্রবৃক্ষের বংশবৃদ্ধি করা হয়। সাধারণতঃ নার্শরীতে যে সমস্ত আম্রের কলম বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই জোড় কলম।*

---

* কলম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পাট বা পরিচর্য্যা

বর্ষার প্রারম্ভে মনোনীত বাগানের জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। জমিতে জাতিগত স্বভাবানুয়ায়ী ১৬ হইতে ৩২ হাত অন্তর তিন হাত দীর্ঘ, তিন হাত প্রস্থ ও তিন হাত গভীর ভাবে গর্ত্ত করিয়া মৃত্তিকার সহিত পুরাতন গোবর সার, ছাই ও অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া ঐ গর্ত্ত ভর্ত্তি করিয়া রাখিতে হয়, পরে যথা-সময়ে ঐ সমস্ত গর্ত্তে চারা বা কলম রোপণ করিতে হয়। উদ্যানক তাঁহার রুচি অনুযায়ী চতুষ্কোণ, পঞ্চক সংস্থান, ত্রিভুজাকার বা অন্য যে কোন প্রকার প্রথাতে গাছ রোপণ করিতে পারেন। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত আমের কলম রোপণ করা যাইতে পারে। অত্যধিক বৃষ্টির সময় কলম রোপণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বর্ষাকালে যে সময় আকাশ মেঘমুক্ত ও পরিষ্কার থাকে এবং উজ্জ্বল রৌদ্র কিরণ পাওয়া যায় সেই সময়ে অথবা বর্ষান্তে যখন মাটি সরস থাকে এরূপ সময়ে 'যো' বুঝিয়া গাছ লাগান যুক্তিসঙ্গত। কলমের গাছের যে স্থানে জোড় বাঁধা হয় তাহার উপর পর্য্যন্ত মাটি চাপা-দেওয়া উচিত এবং রোপণের সময় গাছের কাণ্ড যাহাতে মাটির উপর সোজাভাবে দাঁড়াইয়া থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ গাছ সোজাভাবে রোপণ করা হইলে উহা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া থাকে।

গাছ লাগাইবার পর যত্নসহকারে উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ

করিতে হয়। এ সময় যাহাতে গাছে আঘাত না লাগে এবং বহিঃশত্রুর হাত হইতে গাছগুলি রক্ষা পায় এজন্য বাগানটী প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকিলে অথবা চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়া থাকিলে ভাল হয়। গাছগুলি ভাল ভাবে মাটিতে না লাগা পর্য্যন্ত এবং ছোট অবস্থায় যতদিন না উহারা মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া আহার জোগাইতে পারে ততদিন আবশ্যক মত গাছের মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা আবশ্যক। গাছগুলি লাগিয়া গেলে পর শীত ও বর্ষার প্রারম্ভে বৎসরে দুইবার উহাদের গোড়ার চারিধার খুঁড়িয়া মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়। গাছ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া ফলধারণের উপযুক্ত হইলে বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি আলগা করিয়া দিতে হয় এবং এক সপ্তাহ কাল গাছের গোড়ায় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইয়া কিছু পুরাতন গোবর, ছাই ও অস্থিচূর্ণ মাটির সহিত মিশাইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়া চাপা দিতে হয়।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বসন্তকাল সমাগমের পূর্ব্বে পৌষ মাঘ মাস হইতে আম গাছ মুকুলিত হইতে আরম্ভ করে। স্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়া অনুসারে কোন কোন স্থানে ইহার কিছু পূর্ব্বে এবং কোন কোন স্থানে পরে মুকুল ধরে। আমগাছে মুকুল ধরিবার পর আমের কড়া ধরিতে আরম্ভ হইলে বাগানের সমস্ত আম গাছের গোড়া জলসেচন দ্বারা সিক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মুকুল ধরিবার পর অত্যধিক রৌদ্র বশতঃ মৃত্তিকা উত্তপ্ত হইলে মুকুল ঝরিয়া পড়ে। অত্যধিক ঝড় ও বৃষ্টিতেও

মুকুল নষ্ট হয়। কুয়াশাতেও মুকুল পুড়িয়া যায়। রৌদ্রতাপে মৃত্তিকা কঠিন ও শুষ্ক হইলে গাছের যে কোন অবস্থাতেই অপরাহ্ন কালে জলসেচন করা আবশ্যক।

প্রতি বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ও সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গোড়া খুঁড়িবার সময় গাছের কিছু শিকড় কাটা পড়ে, ইহাতে গাছের উপকারই হইয়া থাকে। গাছের আকার অনুসারে পরিমাণ অনুযায়ী সার দেওয়া দরকার। অধিক সার প্রয়োগ করিলে একদিকে যেমন গাছের অনিষ্ট হয় অপর দিকে পরিশ্রম ও অর্থ বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। গাছ লাগাইবার পর উহা মাটিতে বসিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সার প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। সাধারণতঃ কলমের গাছ রোপণের দুই বৎসর পরে সার প্রয়োগ করিলে উহা কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বড় গাছে প্রতিবৎসর নিম্নলিখিত সারগুলি যথা :—

গোয়ালের পচা আবর্জ্জনা ও গোবর	১০	সের
ছাই	৫	,,
সুপার ফস্ফেট্	২॥	,,
খইল চূর্ণ	২	,,
অস্থি চূর্ণ	২	,,

প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মিঃ উড্ সাহেবের মতে আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত প্রদেশে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বড় আম গাছ পিছু /৫ সের করিয়া লবণ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

গাছের ঠিক গোড়ায় সার বা জল প্রদান করিলে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সধিত হয় না, কারণ গাছ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় দ্বারাই মৃত্তিকা হইতে রস বা আহার সংগ্রহ করে, এজন্য ঐ সমস্ত শিকড়গুলি রস সংগ্রহার্থে মৃত্তিকা মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত শিকড়ের নিকটেই জল ও আহার পৌছাইয়া দিতে পারিলেই সার প্রদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ফলতঃ গাছের শাখা-প্রশাখা যতদূর পর্য্যন্ত পার্শ্বদেশে বর্দ্ধিত হয়, ঐ সমস্ত শিকড়গুলি মৃত্তিকা মধ্যে ততদূর বিস্তৃত হইয়া আহার সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকে। এজন্য বড় গাছের কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে অন্ততঃ আড়াই হাত হইতে তিন হাত ব্যবধানে দুই হাত প্রশস্ত ও এক হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া সার প্রদান করিয়া পুনরায় মাটি চাপা দিতে হয়। জলও ঠিক গাছের গোড়ায় না দিয়া এইরূপ ব্যবধানে আলবাল ও আইল প্রস্তুত করিয়া দিলে ভাল হয়।

আমের রোগ

আমগাছ নানাপ্রকার রোগ ও কীট দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমগাছের কাণ্ডে ও শাখা-প্রশাখায় এক প্রকার কীট বা অর্ব্বুদ রোগ জন্মে। ঐ সমস্ত গাঁইট প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্র থাকে, পরে উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বৃহৎ আকার ধারণ করে। ঐ সমস্ত গাঁইটের উপরিভাগ ফাটা ফাটা এবং

সময় সময় উহা হইতে আটা নিঃসৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আম্রবৃক্ষ ব্যতীত অন্য কোন গাছ এই রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। ইহা আম্রবৃক্ষের অতি সংক্রামক রোগ। পূর্ব্ব হইতে প্রতিকার না করিলে অন্যান্য আম গাছও এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এই রোগে গাছ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উহার উৎপাদিকা শক্তিও ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়ে। কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ঐ রোগযুক্ত গাঁইট কাটিলে ভিতরে ঘায়ের ন্যায় লালবর্ণ দৃষ্ট হয়। যতদূর পর্য্যন্ত এইরূপ লালবর্ণ দৃষ্ট হইবে ততদূর পর্য্যন্ত উহা রোগাক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং উহা চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে ইহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। ঐ সমস্ত রোগগ্রস্ত কর্ত্তিত স্থান কার্ব্বলিক বা ফিনাইল জল দ্বারা ধুইয়া ঐ সমস্ত ক্ষত স্থানে বেশ পুরু করিয়া আলকাতরা লেপন করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

কোন কোন কীট, আম গাছের কাণ্ড ও গাত্রস্থ ত্বক বিদ্ধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, ফলে গাছের গাত্র হইতে আটা নির্গত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা গাছের সম্পূর্ণ অনিষ্ট সাধিত না হইলেও আংশিক ক্ষতি করে। ক্ষত স্থান হইতে আটা উঠাইয়া ফেলিলে গাছের গাত্রে যে ছিদ্র দেখা যায় উহার মধ্যেই কীট অবস্থান করে। ঐ ছিদ্রপথে ফিনাইল বা কেরাসিন জল দিয়া গোবর মাটি দ্বারা ছিদ্র পথ বন্ধ করিয়া দিলে ভাল হয়।

আম গাছের গাত্রস্থ ত্বকে ময়লাটে সাদা রঙের এক প্রকার চাকা চাকা দাগ দৃষ্ট হয়। এই চাকা চাকা দাগগুলিই গাছের দদ্রু রোগ। ইহা গাছের রস শোষণ করিয়া থাকে। রোগাক্রান্ত স্থান চাঁচিয়া ফেলিয়া গরম জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয়।

আম গাছের পাতায় বসন্তের মত এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের গুটি জন্মাইতে দেখা যায়, ইহা সংক্রামক রোগ। প্রথম অবস্থায় লক্ষ্য রাখিলে এবং ঐ সমস্ত পত্র নষ্ট করিলে উহা আর বিস্তৃত হইতে পারে না।

এক প্রকার পরগাছা বা পরভোজী উদ্ভিদ্ আম গাছের শাখায় জন্মিয়া গাছের গাত্রস্থ রস শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া গাছকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। ঐ সমস্ত পরগাছা শিকড় সমেত গাছের গাত্র হইতে উঠাইয়া ফেলিতে হয়।

আম গাছের নিকট দিয়া যাইলে অনেক সময় এক প্রকার ছোট জাতির পোকা উড়িয়া চোখে মুখে পড়ে। ইহাদিগকে আম-মাছি বলা হয়। ইহারা আমের মুকুলের ডাঁটা ও কচি কচি ডালের রস চুষিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করে। মাছির সংখ্যা অধিক হইলে গাছের ফল ধারণের শক্তি থাকে না। এই আম-মাছি আমের কচি পাতার শিরে ডিম পাড়ে। অল্প দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয় ও উহা রস চুষিয়া খাইতে আরম্ভ করে। গাছের গোড়ায় খুব বেশী করিয়া গন্ধকের ধোঁয়া দিতে পারিলে অনেক সময় মাছিরা গন্ধ সহ্য

করিতে না পারিয়া পলাইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ফিনাইল বা কেরোসিন ইমালসান প্রস্তুত করিয়া কোন প্রকার স্প্রে বা যন্ত্র সাহায্যে গাছের সমস্ত অংশে ছিটাইতে পারিলে পোকা নষ্ট হয়।

আম গাছের গাত্র যেমন নানাপ্রকার কীটাক্রান্ত হয়, আম ফলও সেইরূপ কীট বা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ফলে দুই জাতীয় পোকা দৃষ্ট হয় ; (১) পক্ষযুক্ত ইহাকে আমের ভোঁ পোকা বলে, (২) কৃমিবৎ, ইহা ছোট অবস্থায় সূতলী পোকার ন্যায় আমের মধ্যে অবস্থান করে এবং বড় হইলে মাছির আকার ধারণ করে, এজন্য ইহাকে ফলের মাছি পোকাও বলা হয়।

কচি কচি আম ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোঁ পোকা আসিতে আরম্ভ করে। এই পোকার মাছি কাঁচা আমের গায়ে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিয়া কীড়ারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া আমের মধ্যে প্রবেশ করে। আম বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত ছিদ্র বুজিয়া যায়। সুতরাং বাহির হইতে দেখিলে উক্ত ফল কোন পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। এই কীড়ারা ভিতরের শাঁস খাইয়া পুত্তলিকা অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরে আম কাটিয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া যায়। এই সময় ইহারা গাছের ফাটলে অথবা সেই গাছের নিম্নস্থিত মৃত্তিকার মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া সারা শীতকাল যাপন করে এবং গরম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে।

এই ভোঁ পোকা গাছের ডালে বসিলে সহজে জানিতে পারা যায় না। এই পোকার বিশেষত্ব এই যে, যে গাছ ইহারা একবার আক্রমণ করে, বংশ পরম্পরায় সেই গাছেরই সমধিক অনিষ্ট করিয়া থাকে।

এক জাতীয় কৃমিবৎ ছোট ছোট পোকা ফলের ভিতর ঢুকিয়া উহার অভ্যন্তর ভাগ নষ্ট করিয়া ফেলে। পূর্ব্ববঙ্গে এই জাতীয় পোকার উপদ্রব বড় বেশী হয়। এই পোকা বড় হইলে পতঙ্গ বা মাছির আকার ধারণ করে। এই পোকা লাউ, ফুটি, তরমুজ প্রভৃতি ফসলের শত্রু। এই মাছি ফলের গায়ে যে কোন এক স্থানে বসিয়া ক্ষত করে এবং সেইখানেই অথবা যে কোন ক্ষত স্থানে ডিম পাড়ে। দুই তিন দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হয় এবং উহারা সেই ক্ষত স্থান দিয়া ফল খাইতে খাইতে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফলের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিয়া পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই বাহির হইয়া পড়ে এবং পরে পতঙ্গ বা মাছির আকার ধারণ করে। সাধারণতঃ ধোঁয়া দিলে মাছিরা আসিতে পারে না। যে সমস্ত ফলে এইরূপ পোকা ধরে সেগুলি আহারের অযোগ্য বিবেচনায় গাছের তলায় পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ঐ সমস্ত ফল সংগ্রহ পূর্ব্বক পোড়াইয়া দেওয়া দরকার। ফল ধরিবার সময় ছোট অবস্থায় মশারির মত ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত কাপড় দ্বারা সমস্ত গাছটি অথবা পরিষ্কার পাতলা কাপড়ের টুকরা দ্বারা আলগাভাবে ফলগুলি আবৃত করিয়া দিলে মাছিরা ফলের গায়ে ডিম পাড়িতে পারে না এবং উহা কীটাক্রান্ত হইতে পারে না।

আম বাগানে প্রায়ই দেখা যায় কোন বৎসর গাছে অপর্য্যাপ্ত ফল ধরিয়াছে। আবার কোন বৎসর অল্প ফল হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, গাছ রোগাক্রান্ত হইয়াছে বা উহাতে কোন প্রকার খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ গাছে মুকুল আসার উপর নির্ভর করে সে কারণে আম গাছে মুকুলের অভাব যাহাতে না হয় তাহার একটি প্রক্রিয়া দেওয়া হইল। তবে প্রতি বৎসর নিয়মিত রূপে যাহাতে মুকুল আসে সেইরূপ উন্নত ধরণের গাছ উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। প্রক্রিয়াটি এইরূপ ঃ—একটি পূর্ণবয়স্ক গাছের প্রধান প্রধান শাখায় ঐ শাখার গোড়া হইতে কিছু উপরেই ½ ইঞ্চি চওড়া করিয়া গোলাকার ভাবে ছালটি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। একটি গাছে সাধারণতঃ ৬টি হইতে ৯টি প্রধান শাখা থাকে অতএব ঐ কয়টির ছাল ছাড়াইয়া ফেলিলেই সম্পূর্ণ হইবে। ইহা শ্রাবণ মাসে করাই বিধেয়। ঐ ক্ষয় পূরণের জন্য গোবর সার বা উদ্ভিজ্জ সারের সহিত সালফেট অফ এমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিলেই চলিবে। এই কার্য্য ছাল ছাড়াইবার সঙ্গে -সঙ্গে করিয়া রাখাই ভাল। মনে রাখিবেন যে বৎসর ফলন পাইতে চান তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরেই উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ ঐ প্রক্রিয়ার দ্বারা পর বৎসর হইতে ফল পাওয়া যাইবে। যে গাছে মুকুল কম আসে সে গাছেও এই প্রক্রিয়ার সাহায্য লইলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে।

আমের ব্যবহার ও লাভালাভ

আমের ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতবাসীর কাহারও অবিদিত নাই। কাঁচা অবস্থায় আম হইতে নানাপ্রকার আচার, মোরব্বা এবং পক্ক আমের রস বা ক্বথ হইতে আমসত্ব প্রস্তুত হইয়া থাকে। পক্ক আম পচিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনায় পূর্ব্বে উহা দূরদেশে পাঠান সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু আজকাল cold storage vanএ করিয়া উহা বহু দূরদেশে চালান যাইতেছে। ইহার চাষে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ান ফ্রুট গ্রোয়ার্স গাইড (Australian Fruit Growers' Guide by Alfred & Stephen) নামক পুস্তকে দেখা যায় যে একটী সুস্থ সতেজ বড় আম গাছে ২ টন পর্য্যন্ত আম ফলিয়া থাকে। এক টনের ওজন ২৮ মণ ধরিলে এবং এক একটি আম /।৵০ পোয়া করিয়া হইলে এক মণে প্রায় ১১০টি হয়। তাহা হইলে এক টনে প্রায় ৩০।৩২ শত আম পাওয়া যায়। এ দেশে যত্ন, পরিচর্য্যা ও সার প্রদান করিলে গাছ পিছু এক টন আম পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। জমিতে উৎকৃষ্ট জাতীয় আম গাছ লাগাইতে হয়। ভাল বাছাই বড় ফল প্রতি শত ১০৲ টাকা হিসাবে বাজারে প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে ৩০০০ আমে প্রায় ৩০০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এক বিঘা জমিতে ১০।১৫টি আম গাছ লাগান চলে তাহা হইলে এক বিঘা জমি হইতে প্রায় ৪৫০০ টাকা পাওয়া যায়। খরচ খরচা বাবদ ১৫০০৲ টাকা বাদ দিলে এক বিঘা

জমিতে ৩০০০ টাকা লাভ হইতে পারে। একটু যত্ন করিয়া উপযুক্তরূপে গাছের পরিচর্য্যা করিলে সুফল সব সময়েই পাওয়া যায়।

অধিক পুরাতন আম গাছের গুঁড়ি হইতে যে তক্তা পাওয়া যায় তাহার দ্বারাও চৌকাট, কপাট, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী প্রভৃতি নানাবিধ আসবাবপত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আঙ্গুর

(Grape Vine)

ইহার জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সাউদার্ন ইউনাইটেড ষ্টেটস্। আজকাল পৃথিবীর চারিদিকে ইহার চাষ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা দেশের অনেক স্থানে ইহা জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু পশ্চিম ও পাঞ্জাব অঞ্চলে ইহার যেরূপ আকার ও আস্বাদ হয় বাঙ্গালা কিংবা আসাম জাত আঙ্গুর কখনও সেরূপ হইতে দেখা যায় না।

উচ্চ হালকা ও দোআঁশ জমি ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, ইহার জমিতে চূণের ভাগ বিদ্যমান থাকা বিশেষ দরকার। আর্দ্র আবহাওয়া ইহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক আঙ্গুর গাছ লতানিয়া, ইহার অবলম্বনের জন্য মাচা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। গেট বা জাফরিতে তুলিয়া দিলেও ইহা বেশ সুন্দর মানায়। ইহার জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া মাটির সহিত গোবর, গোয়ালের আবর্জনা ও অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি সার মিশাইয়া লইতে হয়। জমিতে ৮।১০ হাত অন্তর ইহার চারা লাগাইতে পারা যায়। ইহার বীজ অথবা কাটিং হইতে চারা জন্মান চলে। সুপুষ্ট নীরোগ ও অর্দ্ধপক্ক আঙ্গুরের শাখা লতা লইয়া ২।৩টি চোক বা গাঁইট সমেত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বর্ষার শেষে ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোরে লাগাইতে

হয়। হাপোরের মাটিতে বালির ভাগ অধিক রাখিতে হয়। ইহাতে ঐ সমস্ত গাঁইট হইতে শীঘ্রই শিকড় ছাড়িয়া থাকে। চারা জন্মিলে উহা পরবৎসর বর্ষার কিছু পূর্ব্বে জমিতে লাগাইতে হয়। বর্ষাকালে দাবা কলমেও ইহার চারা প্রস্তুত করা চলে। চারা লাগাইবার পর গাছে রীতিমত জলসেচন করিতে হয়। স্থান, জলবায়ু এবং আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে ফল বিলম্বে পক্ক হইয়া থাকে। হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহা আশ্বিন, উত্তর পশ্চিম ভারতে আষাঢ় এবং দাক্ষিণাত্যে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল পক হইয়া থাকে। কাশ্মীর, কোয়েটা, দাক্ষিণাত্য, নাসিক এবং সিন্ধুদেশে ইহার যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া ১২।১৪ দিন ফেলিয়া রাখিবার পর উহার শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার, রক্ত, পচা মাছ, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি নূতন মাটির সহিত মিশাইয়া গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিয়া গর্ত্ত পূরণ করিয়া দিতে হয়। এই সময় গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে ও কিছু দিন পরে নূতন পাতা উদ্গত হইতে আরম্ভ করে। গাছের গোড়ায় অধিক সংখ্যক শাখা বা ডাল না রাখিয়া উহা ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত।

আঙ্গুরের বহু বিভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে কোনটীর ফল কাল, কোনটী লাল, কোনটী লম্বা বড় ও কোনটী আকারে গোল হইয়া থাকে। বাংলা দেশে ছোট গোল জাতি জন্মিতে

দেখা যায়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও বলকারক ফল। বীজশূন্য ছোট আঙ্গুর শুকাইলে কিসমিস ও বীজযুক্ত বড় জাতি হইতে মনেক্কা হইয়া থাকে।

আঙ্গুর গাছ এক প্রকার কীটাক্রান্ত হইয়া থাকে। কঠিন পক্ষবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি পতঙ্গ রাত্রিকালে ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়া আঙ্গুর গাছের পাতার নীচে থাকিয়া সমুদয় পাতা ঝাঁজরা করিয়া খাইয়া ফেলে। রাত্রে আগুন জ্বালিয়া গাছ ধরিয়া নাড়া দিলে ইহারা আগুনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে ও মরিয়া যায়। প্যারিস গ্রীণ বা কেরোসিন ইমালসান পিচকারী দ্বারা গাছের উপর ও নীচের পাতায় ছিটাইলে উপকার পাওয়া যায়। এক প্রকার প্রজাপতি আঙ্গুর গাছের পাতার উপর ডিম্ব পাড়ে এবং ঐ ডিম্ব হইতে কীড়া বাহির হয়। ইহারাও গাছের বিশেষ অনিষ্ট করে। লেড আর্সিনিয়েট প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

আপেল (Apple)

সেব বা সেও ফল

সম্ভবতঃ ইহার জন্মস্থান্ এসিয়ার শীতপ্রধান স্থান এবং আরব ও পারস্য দেশ বলিয়া অনুমান করা যায়। সমুদ্রতীর হইতে ৩,০০০ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে বা পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা জন্মিতে দেখা যায়। প্রায় ৫,০০০ হাজার ফিট উচ্চ ভূভাগে ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। অনেক বিভিন্ন জাতীয় আপেলের নাম পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে বিসমার্ক বা ক্রাব নামক আপেল জন্মে, উহা দেশী আপেল বলিয়া পরিচিত। ঝালনা নামক একজাতীয় আপেল সমতল স্থানের উপযোগী। ইহার কলম পৌষ মাসে রোপণ করিতে হয়। ইহা ১২।১৩ হাত ব্যবধানে বসাইতে হয়। নিচু সমতলভূমি ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহার চাষ হয় এবং ফল জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই পাকে কিন্তু নিচু সমতল ভূমিতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকে। হিমালয়ের পাদদেশ সমূহে খাসিয়া, গৌহাটী, সিমলা এবং মুসৌরী প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ অল্পাধিক দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালোর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে আজকাল আপেলের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ান ও বিলাতী আপেলের মধ্যে অনেক বিভিন্ন জাতি আছে তন্মধ্যে আর্লি হার্ভেষ্ট, রয়েল পিয়ারমেন, পিপিন ওয়াডহার্ষ্ট, পিপিন নিউটন, পিপিন রিবষ্টন, ষ্টার্লিং ক্যাসল্, স্কার্লেটনপেরিল, উইণ্টার পিচ প্রভৃতি বেশ উল্লেখযোগ্য। নিম্ন বঙ্গে ইহার চাষ হয় না। গাছের দূরত্ব ১৫ ফিট।

আনারস (Pine apple)

আমেরিকার ব্রেজিল নামক স্থান এই গাছের স্বাভাবিক জন্ম-স্থান হইলেও আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতের নানাস্থানে এবং নিম্ন বাংলায় শ্রীহট্টে এবং আসামের অন্যান্যস্থানে বিস্তৃতভাবে ইহার চাষ হইতেছে। ইহার চাষ বেশ লাভজনক ও বেকার ভদ্রযুবকগণ অল্প পরিশ্রমে ইহার চাষ আরম্ভ করিতে পারেন।

চাষ—আনারস চাষ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহারা যে-কোনরূপ অসার মৃত্তিকাতে জন্মায় বটে কিন্তু উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে যদি উপযুক্তরূপে নির্ব্বাচিত সার প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ইহারা আশাতিরিক্ত ভালভাবে জন্মায়। ঈষৎ ছায়াযুক্ত সরস দোআঁশ জমিতে ইহারা স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। জমিতে ২½ হাত অন্তর লাইন দিয়া ২ হাত ব্যবধানে একটি গাছ রোপণ করিতে হয়। গাছ রোপণের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে জমি প্রস্তুত করিতে হয়। জমি প্রস্তুতের সময় গোবর, ছাই ও হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। বর্ষার প্রারম্ভে চারা রোপণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। কিন্তু এ সময় চারা পাওয়া কঠিন। সেজন্য পূর্ব্ব হইতে চারা প্রস্তুত করা বা সংগ্রহ করা ও সহজে ফলের মাথায় যে খোঁপা জন্মায় ফল পাকিবার পর উহা সংগ্রহ করিয়া লাগাইলে নূতন গাছ জন্মায়। এই গাছের ফল জন্মাইতে

৩।৪ বৎসর সময় লাগে। ফলের বোঁটার গায়েও চারা জন্মায়। ইহাকে Slips বলে। এই চারা রোপণেও গাছ হয়। কিন্তু গাছগুলি ৩ বৎসরের পূর্ব্বে প্রায় ফলে না। গাছের গায়ে যে তেউড় জন্মায় তাহা উপরোক্ত দুই প্রকার চারা অপেক্ষা ভাল। ইহারা দুই বৎসরের মধ্যেই ফলন্ত হয়। কিন্তু গাছের গোড়ার শিকড় হইতে যে চারা জন্মায় তাহারা প্রথম বৎসরেই ফলবতী হয় ও ফল বড়, সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত হয়।

পুরাতন গাছের গিট চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ৫% পারম্যাঙ্গানেট্ অব পটাসের দ্রাবনে ৮।১০ মিনিট ভিজাইয়া রাখিয়া বীজতলাতে সেগুলি পুতিয়া দিলে তাহা হইতে গাছ বাহির হয়। আজকাল এই প্রথায় জায়েণ্ট কিউ আনারসের চারা তৈয়ারী সর্ব্বত্র অনুসৃত হয়। কারণ এই গাছে বেশী চারা জন্মায় না। পুরাতন গাছের পাতা ছিঁড়িয়া ভিজা বালিতে গাছ পুতিয়া দিলেও অনেক চারা বাহির হয়। ছোট ছোট চারা দূর দূরান্তরে লইয়া গেলে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু বৃহৎ চারা দূরস্থানে লইয়া গেলে ভাল হয় না।

অপরিণত বয়সে গাছে ফল ধরিতে দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে যে কেবল ফলের আকার ছোট হয় তাহা নহে ফলের আস্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। চারাগুলিকে প্রথম প্রথম নাইট্রোজেন ঘটিত সার দ্বারা খুব বাড়াইয়া দিতে হয়। এই সময় প্রয়োজন মত জমিতে গোশালাজাত সার, হাড়ের গুঁড়া, নাইট্রেট অব সোডা প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া জলসেচন করিতে

হয়। তৎপর বর্ষার পরে জমি শুষ্ক করিয়া দিতে হয়। রসাভাবে খাদ্য কম হইয়া যাওয়াতে গাছে মোচা বাহির হয়। মোচাতে আনারস দেখা গেলেই পুনরায় জল সেচ করিতে হইবে।

সাধারণের বিশ্বাস যে ছায়াযুক্ত অন্ধকারময় বাগানের নিভৃত স্থানেই আনারস ভাল জন্মায়। এরূপ স্থানেও ইহারা জন্মায় সত্য কিন্তু ইহাতে ফল টক ও বিস্বাদ হয়। প্রকৃতপক্ষে চাষ করিতে হইলে প্রখর রৌদ্রের সময় ও ফল পাকিবার কাল ব্যতীত কোন সময়ে গাছের ছায়া করিবার প্রয়োজন হয় না। ঈষৎ ছায়াযুক্ত রৌদ্র সারাদিন ব্যাপী গাছের গায়ে লাগা প্রয়োজন। ফল শেষ হইলেই পুরাতন গাছটি নষ্ট করিয়া দিতে হয়।

চারা রোপণ—বর্ষা আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বেই চারা রোপণ প্রশস্ত। বর্ষায় চারা রোপণ করিলে প্রায়ই গাছ পচিয়া মরিয়া যায় কিন্তু উপযুক্তরূপ শিকড়সহ গাছ একটু শুষ্ক করিয়া লইয়া রোপণ করিলে গাছ কম মরে। রোপণের সময় গাছের সর্বনিম্ন ২।৪টি পাতা ছিঁড়িয়া মোথা একটু বাহির করিয়া লইলে, তথা হইতে শিকড় বাহির হইতে সুবিধা হয় ও গাছ ভাল হয়। মোথার যে স্থান মাটিতে ঠেকিবে সেই স্থানে দু চার মুঠা বালি বিছাইয়া তাহার উপর চারা রোপণ করিলে সহজে শিকড় ছাড়ে। সদা সর্ব্বদা জমি হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলিতে হইবে ও জীবজন্তুতে যাহাতে গাছ নাড়াইয়া না দেয় কিংবা ইঁদুরে গর্ত্ত করিয়া গাছ কাটিয়া না দেয় সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

সার প্রয়োগ—গাছ জমিতে ধরিয়া গেলেই সার দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। এ সময় প্রতি গাছের গোড়ায় হাড়ের গুঁড়া ও খইল গুঁড়া প্রত্যেকটি এক তোলা করিয়া প্রয়োগ করিয়া মাটি খুসিয়া দিতে হয়। তিন মাস পরে নিম্নলিখিত মিশ্রিত সার এক পাউণ্ড প্রস্তুত করিয়া প্রতি ১০টি গাছে একবার দিতে হইবে ও ছয় মাস পরে আরও এক পাউণ্ড দিতে হইবে।

হাড়ের গুঁড়া	—ছয় আউন্স
খইল	—পাঁচ আউন্স
সালফেট্ অব পটাশ	—তিন আউন্স
নাইট্রেট অব সোডা	—তুই আউন্স
মোট	—এক পাউণ্ড

নাইট্রেট্ অব সোডা বেশী ব্যবহার করিলে ফল বড় হইলেও ফলের গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়।

আনারস অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভাল জাতীয় আনারস প্রায়ই বিদেশ হইতে আনীত। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ফল পাকিয়া থাকে। প্রকৃত যত্নের অভাবে ইহারা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক বাংলার কোন নাম করা জাতি নাই। তবে কাজলী আনারস চেষ্টা ও যত্ন করিলে খুব ভাল

হয় বলিয়া জানা যায়। বাংলার কাজলীর আকার বেশ বড় ও সুগন্ধযুক্ত। কিন্তু টক ও গভীর চোকযুক্ত। চৈত্র মাসে ফলে ও আষাঢ় মাসে পাকে।

আসামের জল ঢুপ—ছোট আকার কিন্তু সুগন্ধযুক্ত ও খুব মিষ্ট। বাজারে ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে।

কুইন—ফল বড় ও সুমিষ্ট। ব্যবসায়ের জন্য উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল, প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। ইহার রঙ তত ভাল নহে। ওজনে ১।০ সের—৩ সের হয়।

সিলোন--আনারসের মধ্যে ইহা একটি উৎকৃষ্ট জাতি। শ্রাবণ মাসে পাকে, ওজনে ১ পোয়া—২॥ সের পর্য্যন্ত হয়।

'জায়াণ্ট-কিউ' বা "স্মুথকুইন"—ইহার পাতায় কাঁটা নাই; ইহারা শ্রাবণের প্রথম হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত একবার ফলে ও পাকে, আর একবার ফলে কার্ত্তিক মাসে, পাকে ফাল্গুন মাসের মধ্যে, ফল খুব বড় /৪ হইতে /৬ সের পর্য্যন্ত হয়।

মরিশাস্ বা রিপ্লেকুইন—ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফলিতে থাকে। ফলগুলি যথার্থ কিউএর মত বড় ও ভারী। গ্রীষ্মকালে যে সমস্ত আনারস ফলে সেইগুলিই সব চেয়ে ভাল; বর্ষার ফল ভাল মিষ্ট হয় না আর শীতকালের ফলের শাঁস একটু নীরস ও ঈষৎ অম্লগন্ধ হয়।

ফল সংগ্রহ—ফলবাত্তি হইলেই অর্থাৎ গোড়ার দিকে সামান্য রং ধরিলেই বোঁটা সমেত সংগ্রহ করিয়া ঘরে পাকাইয়া বাজারে পাঠান কর্ত্তব্য। দূর বাজারের জন্য পাকাইবার পূর্ব্বেই

চালান দিতে হয়। বাড়ীর ব্যবহারের জন্য গাছে পাকাইয়া লওয়া ভাল।

বাংলায় জায়েন্ট কিউ, সিংলোন, কুইন, মরিশাস ও কাজেলী খুব ভালভাবেই জন্মায়।

আজকাল এই ফলের ব্যবসা বেশ চলতি হইয়াছে এবং চিনির রসে পাক করিয়া টীনে ভর্ত্তি করিয়া নানাদেশে চালান হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলায় এই শিল্প এখনও কেহ গ্রহণ করেন নাই।

আখ বা ইক্ষু (Sugar cane)

প্রধানতঃ গুড় বা চিনির জন্য ইক্ষুর প্রসারলাভ ঘটিলেও কাঁচা বা ফল হিসাবে ইক্ষুর ব্যবহার নিতান্ত কম নহে। ইক্ষুর বহু বিভিন্ন জাতি আছে এবং এদেশেও অনেক জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ফল-মূলাদির ন্যায় খাইবার পক্ষে পুঁড়ি ধলসুন্দর, কাজলি, শামসাড়া প্রভৃতি পুরাতন আখ এবং কৃষি বিভাগের আবিষ্কৃত B 208 এবং B 147 খুব উপযোগী।

সরস উচ্চ দোআঁশ মৃত্তিকায় ইক্ষু উত্তম জন্মিয়া থাকে। যেস্থান বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় অর্থাৎ জলা জমি ইক্ষু চাষের অনুপযুক্ত। ইক্ষুর জমিতে জল সেচনের সুবন্দোবস্ত করা উচিত।

আশ্বিন-কাত্তিক মাসে ইক্ষুর জমিতে চাষ দিয়া মাটি গুঁড়া করিয়া ফেলিতে হয়। জমি প্রস্তুত করিবার সময় গোময়, গোয়ালের আবর্জ্জনা, খইলচূর্ণ ও অস্থিচূর্ণ মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। পরে ফাল্গুন—চৈত্র মাসে জমিতে দুই হাত অন্তর ৬।৭ ইঞ্চি চওড়া এবং ৮।৯ ইঞ্চি গভীর নালা করিয়া লাইন দিয়া এক বিঘত অন্তর এক একটি ইক্ষুর চারা লাগাইতে পারা যায়। এইভাবে বিঘাপ্রতি প্রায় ৩০০০ ইক্ষুর চারা বা কলম লাগে।

ইক্ষুর অগ্রভাগ পুতিয়া যে গাছ জন্মান হয় তাহা কম মিষ্ট ও পানসে হইয়া থাকে এজন্য ইক্ষুদণ্ডের অগ্র ও নিম্নভাগ

হইতে এক হস্ত পরিমিত স্থান বাদ দিয়া সমগ্র ইক্ষুদণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া (প্রতি খণ্ডে যেন ২।৩টি করিয়া চোক থাকে) হাপোরে দিতে হয়, হাপোরের মাটি উত্তমরূপে চূর্ণিত হওয়া আবশ্যক। যে স্থানে হাপোর প্রস্তুত করা হইবে সেই স্থানের মাটি আধ হাত গভীর করিয়া খনন করিয়া উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হয়, পরে উহাতে সেচ দিয়া ভিজাইয়া কাদার মত হইলে কর্ত্তিত ইক্ষু খণ্ড আড়ভাবে এক ইঞ্চি ব্যবধানে সজ্জিত করিয়া ও উহার চোকগুলি ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া রাখিয়া কর্ত্তিত খণ্ডগুলি অর্দ্ধেক মাটির মধ্যে প্রোথিত করিয়া ও উপরে খড় বিছাইয়া দিতে হয়। হাপোরে ইক্ষু খণ্ড লাগাইবার ৩।৪ দিন পরে উহার উপরে জল সেচন করিতে হয়। চোখ হইতে চারা বাহির হইলে হাপোর হইতে তুলিয়া জমিতে লাগাইতে পারা যায়। চারা লাগাইবার পর ১০।১২ দিনের মধ্যে জমিতে উহা লাগিয়া যায়। জমির অবস্থাভেদে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত সেচ দিয়া মাটি সরস রাখিতে হয়। সেচ দিবার পর গাছের গোড়া নিড়াইয়া আলগা করিয়া দিতে হয়। ইহার পর গাছের গোড়ায় মাটি চাপাইয়া গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া ও গাছ বেশ বড় হইয়া উঠিলে পাতা বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার চাষে অন্য কোন পাট আবশ্যক করে না।

অন্যান্য ফসলের ন্যায় ইক্ষুরও নানাবিধ শত্রু আছে। শৃগালাদি পশু, উই, পিঁপড়া, মাজরা, ছাতরা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ ইক্ষুর বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে, এজন্য পূর্ব্ব হইতে

সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। হাপোরে দিবার সময় নীরোগ ইক্ষুদণ্ড বীজ হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। জমিতে ইক্ষুর কলমগুলি লাগাইবার পূর্ব্বে অল্প চূণ ও তুঁতে মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া লইলে অনেক রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। কীটগ্রস্ত গাছে কেরোসিন প্রয়োগ করিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

আতা (Custard apple)

ইহার আদি জন্মস্থান আমেরিকা, কিন্তু আজকাল ভারতবর্ষের অনেকাংশে ইহা জন্মিতে দেখা যায়। এই গাছ ৮।১০ হাত দীর্ঘ হয়। ইহা পার্ব্বত্য-অঞ্চলে জন্মে না।

বাংলার যে কোন জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। তবে সারযুক্ত হালকা দোআঁশ জমিতে ইহা খুব ভাল জন্মে। জমিতে ৭।৮ হাত অন্তর লাইন দিয়া ১০।১২ হাত ব্যবধানে ২ হাত গভীর ও ১॥ হাত গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনা আদি পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া চারাগুলি প্রায় এক বৎসরের বড় হইলে উহা জমিতে স্থায়ীভাবে লাগান চলে। বর্ষাকালে চারা লাগান প্রশস্ত। চারা লাগাইবার পর মধ্যে মধ্যে আবশ্যক অনুযায়ী গাছে জলসেচন করা দরকার ও গাছের মাটি নিড়ানি দিয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। এই গাছ খুব দ্রুত বর্দ্ধিত হয় এবং ৪।৫ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গাছে ফুল ধরে এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে। আতাফলের গাত্রস্থ খোপ ছাড়িলে অর্থাৎ একটু ফাঁক ফাঁক হইলে উহা পক্ক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এ সময় উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া খড়ের মধ্যে দিলে

২।৪ দিনের মধ্যেই পাকিয়া যায়। গাছের ফল শেষ হইলে উহার ডাল ছাঁটিয়া দিতে পারা যায়। গাছে ফল ধরিবার পূর্ব্বে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিয়া ৮।১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া লইতে হয়, পরে গোড়ায় সার মাটি প্রয়োগ করিতে হয়। গাছের গোড়ায় মাটি চাপাইবার পর যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচন করা দরকার। গাছে ফল না ধরা পর্য্যন্ত ডাল ছাঁটা উচিত নয়।

আঁশফল

(Nephelium longanum)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। এই গাছ লিচু গাছের স্থায় দীর্ঘ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

এদেশে যে কোন মৃত্তিকায় ইহার গাছ জন্মাইতে পারা যায়। বর্ষাকালে ইহার চারা রোপণ করা চলে। সাধারণতঃ ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান হইয়া থাকে।

আঁশফল সাধারণতঃ দুই প্রকার—একপ্রকার বড় ফল, অন্য জাতীয় ফল ক্ষুদ্রাকৃতি। ফল আকারে লিচু অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও গোলাকৃতি। ফলের উপরিভাগ লিচুর স্থায়। ফলের মধ্যে মাঝখানে একটি বড় গোলাকৃতি বীজ থাকে এবং তাহার উপরিভাগে শাঁস থাকে। উহা মিষ্ট, সাধারণতঃ ৬।৭ বৎসরে গাছে ফল ধরে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ফল পাকে। এক একটী থোলোতে প্রচুর ফল ধরিয়া থাকে। ২০।২৫ হাত ব্যবধানে গাছ রোপণ করিতে হয়। ইহা ৭।৮ বৎসরেই ফল দেয়, কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর ইহার গোড়ায় পাঁকমাটী দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাদুড় ইহার প্রধান শত্রু, ফল পাকিলে ঐ গাছে বাদুড় আসিয়া ফলের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, তাই চাষীরা ফল পাকিলে গাছের উপর জাল দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ইহা একটি আয়কর গাছ। ইহা একবার সৃষ্টি করিলে বহু বৎসর ফল পাওয়া যায়।

দেশী আমড়া (Hog Plum)

ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান। ইহার বীজ হইতে যেখানে সেখানে চারা জন্মিয়া থাকে এজন্য যত্ন করিয়া কেহ ইহার চাষ করে না। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। চারার গাছ ৬।৭ বৎসরে ফলবান হইয়া থাকে। পৌষ মাঘ মাসে গাছে মুকুল হয় এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে ছোট ছোট কড়া ধরে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে দেশী আমড়া পাকিয়া থাকে। আমড়া গাছ মুকুলিত হইবার সময় উহার সমস্ত পাতা ঝরিয়া পড়ে। ইহার ফল অম্লস্বাদ বিশিষ্ট এবং ইহাতে চাটনি ও আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাকা আমড়া বেশ সুগন্ধযুক্ত। গাছের উচ্চতা ১৫।১৬ হাত।

বিলাতী আমড়া (Hog Plum)

ওটেহাইট এবং ফ্রেণ্ডলি দ্বীপ ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান; কিন্তু আজকাল এদেশে অতি সহজেই জন্মিয়া থাকে। পার্ব্বত্য জমিতে ইহা জন্মে না। ইহার বীজ হইতে এবং দেশী আমড়ার সহিত জোড় কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত করা যায়। ইহা অত্যন্ত সহজ প্রাপ্য এবং কম দামী বলিয়া সাধারণতঃ কেহ কলম করে না। বর্ষাকালে চারা রোপণ করা শ্রেয়ঃ। চারা ৫।৬ বৎসরের

হইলে তাহাতে ফল ধরে। চৈত্র বৈশাখ মাসে গাছে ফুল ধরে এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে। ঈষৎ অম্লস্বাদ বিশিষ্ট হইলেও ইহা বেশ মুখরোচক বলিয়া যথেষ্ট আদৃত হইয়া থাকে। ইহার পক্ক ফল হইতে মুখরোচক চাটনি ও আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেকে পক্ক ফল খাইতে ভালবাসে। গাছের উচ্চতা ১৫।১৬ হাত।

আমলকী

(Phyllanthus embelica)

এই গাছ ২৫।৩০ হাত দীর্ঘ হয়। গাছের পাতা দেখিতে অনেকটা তেঁতুল পাতায় ন্যায়। ইহা সমতল ও পার্ব্বত্য উভয় স্থানে জন্মাইতে পারা যায়।

বাংলাদেশের যে কোন মৃত্তিকাতেই ইহা জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে ১৫।১৬ হাত অন্তর ব্যবধানে ইহার চারা লাগাইতে পারা যায়। ইহার পক্ক বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। বর্ষাকালে চারা লাগাইলে গাছ সহজে মরিবার সম্ভাবনা থাকে না। গাছ এক হাত আন্দাজ বড় না হইলে জমিতে লাগান উচিত নয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ইহার গাছে ফুল ধরে এবং পৌষ মাসে ফল পাকে। কাশীর আমলকী আকারে অন্য

জাতি অপেক্ষা বড় হয়। ইহার বহু গুণ থাকায় ঔষধ হিসাবে বিশেষ প্রচলন আছে। ফল কষায়, অম্ল-মধুররস। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট আচার এবং মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আম পীচ (Wampee)

ইহা ক্ষুদ্রাকৃতি সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক চির সবুজ গাছ। জন্মস্থান চীনদেশ। গাছ ১০।১২ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার পাতায় ও ফুলে বেশ সুগন্ধ আছে। ইহার পাতা, তরকারী সুবাসিত করিবার জন্য মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। লিচুর ন্যায় থোলো থোলো বিস্তর ফল জন্মে।

ভারতের নানা স্থানে ইহা জন্মে। বাংলা দেশেও ইহার গাছ ফলবতী হইতে দেখা যায়। সমতল স্থানে ইহা ভাল জন্মে, পার্ব্বত্য অঞ্চলে জন্মে না। যে কোন সারযুক্ত উর্ব্বর মৃত্তিকায় ইহা জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে ৮।১০ হাত অন্তর ব্যবধানে ইহার গাছ লাগান চলে। বর্ষাকালে বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া চারাগুলি প্রায় ১ বৎসরের বড় হইলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ইহা জমিতে স্থায়ীভাবে লাগাইতে পারা যায়। গাছ লাগাইবার পর উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচন করা

দরকার। চৈত্র বৈশাখ মাসে গাছে ফুল ধরিবার প্রায় মাসাধিক পূর্ব্বে গাছে গোড়া খুঁড়িয়া গোময়াদি সার প্রয়োগ করিতে হয়। গাছ লাগাইবার পর চারি বৎসরের মধ্যে ফলবতী হইয়া থাকে। আষাঢ় শ্রবাণ মাসে ফল পাকে। ইহার ফল হইতে উৎকৃষ্ট আচার বা মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আখরোট (Walnut)

ইহার জন্মস্থান পারস্য দেশে। উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। ইহা উপাদেয় এবং পুষ্টিকারক মেওয়া ফল। ইহা বাংলা দেশে ভাল জন্মে না।

বেলে দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে ১৪।১৫ হাত অন্তর এক একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। পরে প্রতি গর্ত্তে এক একটি করিয়া চারা লাগাইতে হয়। শীত ও বর্ষা উভয় ঋতুতেই চারা লাগান চলে। ইহার বীজ হইতেই চারা জন্মাইতে হয়। বীজ হইতে চারা জন্মিতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ইহার ফল ধরে।

অলুচা (Plum)

উত্তর প্রদেশে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা খুব ভাল জন্মে। ইহা নিম্ন বাংলার উপযোগী নহে। ইহার গাছ খুব দীর্ঘ হয় না। ১৪।১৫ হাত অন্তর ইহার গাছ লাগাইতে হয়। শীত ও বর্ষায় উভয় ঋতুতে ইহার গাছ লাগান চলে। পৌষ-মাঘ মাসে গাছের ডাল ছাটিয়া দিতে হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফুল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ফল পাকে।

আলুবখরা (Bokhra Plum)

ইহা অতি সুপরিচিত ফল, পাহাড়ে এবং সমতল স্থানে জন্মে। বিলাতী কয়েকটি জাতি ব্যতীত অন্য সমস্ত জাতি সমতল স্থানে জন্মে। নিম্ন বাংলায় ইহা জন্মে না। শীতকালে অর্থাৎ পৌষ-মাঘ মাসে ইহার গাছ লাগাইলে ভাল হয়। বর্ষা কালেও চারা লাগাইতে পারা যায়। ১৫।১৬ হাত অন্তর পৃথক ভাবে ইহার চারা লাগাইতে হয়। জমিতে ২ হাত গভীর ও ২॥ হাত গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোবর, গোয়ালের অবর্জ্জনা ও নূতন মাটি প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া গর্ত্ত বুজাইয়া দিতে হয়। ইহার এক মাস পরে প্রতি গর্ত্তে এক একটী করিয়া চারা লাগাইতে পারা যায়। গাছকে

সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট করিতে হইলে চতুর্থ বৎসর হইতে উহার ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার। গাছ লম্বা অথবা রুগ্ন হইলে মাটি হইতে ২ হাত ২॥ হাত মাত্র রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে ছাঁটিয়া দিতে পারা যায়। গাছ ছাঁটাই কার্য্য পৌষ-মাঘ মাসে করা চলে। এই সময়ে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। কিছুদিন এইভাবে রাখিয়া কিছু গোময় সার, পটাস, অস্থিচূর্ণ মাটির সহিত মিশাইয়া গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিতে হয়। সার দিবার পর ৭।৮ দিন অন্তর নিয়মিতভাবে গাছে জল দেওয়া দরকার। বীজ, জোড়কলম এবং শাখা কলম হইতে ইহারা চারা জন্মাইতে পায়া যায়। বীজের গাছে ফল ধরিতে খুব বিলম্ব হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বীজ হইতে চারা উঠান চলে। বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিছু বিলম্ব হয়। শাখা কলম হইতে পৌষ-মাঘ মাসে এবং জোড় কলম হইতে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে চারা জন্মাইতে হয়।

গাছ লাগাইবার পর ৪।৫ বৎসরেব মধ্যে ইহার ফল হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ফল পরিপক্ক হইয়া থাকে।

আভোকাডো বা আলিগেট

(Avocado Pear)

আমেরিকায় গ্রীষ্মপ্রধান স্থান সমূহে ইহা স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। মধ্য আমেরিকা, ফ্লোরিডা, ব্রেজিল, মেক্সিকো, ক্যালি-ফোর্ণিয়া, কুইনস্‌ল্যাণ্ড ও হাওয়াই দ্বীপে ইহার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে। ইহার গাছ ৩০।৩২ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হয়।

ভারতে এবং অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ইহার চাষ করা যাইতে পারে। বাংলা দেশে উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহার গাছ লাগাইতে পারা যায়। ইহার বীজ হইতে ও চোক কলম দ্বারা চারা উৎপাদন করা যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষ দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয় পরে বর্ষারম্ভেই জমিতে ১৫।১৬ হাত ব্যবধানে এক একটী চারা লাগন চলে, চারার প্রতি একটু যত্ন লইতে হয় এবং চারা বেশ বড় না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকালে উপরে আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়। ইহার বীজ হইতে প্রস্তুত চারা গাছে চোক বসান চলে। কলমের গাছে ৪।৫ বৎসরেই ফল ধরে। আঁটির চারা গাছে ফল ধরিতে কিছু বিলম্ব হয়। আভোকাডো ফলের নিম্নভাগ গোল এবং উপরের দিক ন্যাসপাতির ন্যায় ঈষৎ লম্বা।

সাধারণতঃ ফলের বর্ণ সবুজ কিন্তু পক্ক অবস্থায় হরিদ্রা ও সবুজ বর্ণ ধারণ করে। ফলের মধ্যস্থলে একটি বড় গোলাকার বীজ থাকে। ফল আকারে বেশ বড় হয় এবং এক পোয়া হইতে আধসের ওজনের হইয়া থাকে। ফলের শস্য মাখনের ন্যায় কোমল, সুস্বাদু ও সুগন্ধ বিশিষ্ট। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে।

কলা (কদলী)

(.Banana or Plantain)

ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী উদ্ভিদ। হিমালয়ের দক্ষিণ প্রদেশে নীলগিরি পাহাড়ে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতেও কদলীর নমুনা পাওয়া যায়। হিমালয়ের ৬৫০০ ফুট উচ্চ পার্ব্বত্য স্থানেও কলা জন্মে। আজকাল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ইহার চাষ পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নারিকেলের ন্যায় সমুদ্র বায়ু ইহার চাষের পক্ষে অনুকূল। কলা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত (১) Musa paradisiaca বা kela—আমরা যে সব কলা পাকিয়ে খাই; (২)Musa nana (অপর নান Musa Cavendishii) বা Dwarf Banana—ইহা দক্ষিন চীন, বারমুদা ও ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জেই প্রভুত পরিমানে দৃষ্ট হয়; (৩) Musa sapientum বা Plantain ইহাই কাঁচকলা যাহা তরকারী করিয়া খাওয়া হয়। কথিত আছে কদলী ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে আরব, পারস্য ও পরে ইউরোপে নীত হয়। ইউরোপীয়গণ প্রথমে আরবের অন্তর্গত প্যালেষ্টাইন নগরে কলা দেখিতে পান ও উহার নাম রাখেন Fig of Paradise. পূর্ব্বে কদলীর সাধারণ নাম ছিল মোচা। আরব ও পারস্য দেশে ইহা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুঝা বা মুছা নামে প্রচলিত হয়।

ইউরোপে ইহা নীত হইবার পর Musa নামে পরিচিত হয়। Latin ভাষায় Sapiens এই নাম হইতে কলার অপর এক বৈজ্ঞানিক নামকরণ হইয়াছে Musa Sapientum.

যে স্থানে বায়ু আদ্র অথচ উষ্ণ, ভূমি সরস ও দোআঁশ এবং যে মাটিতে সামান্য পরিমাণে লৌহ ও লবণ মিশ্রিত থাকে এরূপ জমি কলা চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপোযোগী। যে স্থানে বর্ষার জল দাঁড়ায় তথায় কলা ভাল জন্মে না। স্রোত জল কলাগাছ অনেকটা সহ্য করিতে পারে কিন্তু বদ্ধজল ইহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এইজন্য কলা চাষের জমি সাধারণ জমি অপেক্ষা একটু উচ্চ হওয়া আবশ্যক। এঁটেল, নিরেট বালি ও কঙ্কর মৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। বালিপড়া চর জমিতে ইহা সতেজে বৃদ্ধি লাভ করে। লাল দোআঁশ এবং দাক্ষিণাত্যের মসিবর্ণের মৃত্তিকাতেও কলা গাছ ভাল জন্মে। এঁটেল মাটির সহিত ছাই, বালি, আবর্জ্জনা ও কিছু উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা এবং বেলে মাটিতে ছাই, পাঁক উদ্ভিজ্জ ও গোশালার আবর্জ্জনা মিশ্রিত করিলে উহা কলা চাষের উপযোগী হইতে পারে। এদেশে সাধারণতঃ কলা গাছের ও ইহার জমির কোন পাট করা হয় না। জমি ভালরূপ পাট না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ইহার জমি প্রস্তুত করিবার সময় প্রায় একহাত গভীর করিয়া সমস্ত জমির মাটি কর্ষণ করিয়া বা কোদালি দ্বারা কোপাইয়া মুগুর দ্বারা ঢেলা গুঁড়াইয়া দিতে হয়। পরে জমিতে ২।৩ বার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি ধূলার

মত গুঁড়া ও সমতল করিলে চাষের উপযোগী হয়। প্রতিবার লাঙ্গল দিবার পর জমি হইতে আগাছা, ইট পাটকেল, শিকড় প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিতে হয়। ইহার মাটি সরস রাখিবার জন্য উত্তমরূপে চূর্ণ করা দরকার। মাঘ-ফাল্গুন মাসে ইহার জমি প্রস্তুত করিতে হয়।

জমি প্রস্তুত হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া ১৫ দিন রৌদ্র লাগান উচিত। পরে প্রতি গর্ত্তে প্রায় /৫ সের ছাই ২ ঝুড়ি গোবর সার দিতে হইবে। গোবর সার অভাবে পাতাপচা, গোয়ালের আবর্জনা ইত্যাদি ব্যবহার করা চলে। সাধারণ জমিতে একর প্রতি ২০০ পাউণ্ড সালফেট অফ পটাস, ২৫০ পাউণ্ড সালফেট অফ এমোনিয়া এবং ৪৫০ পাউণ্ড সুপার ফস্ফেটর সহিত ৫০/ মণ ছাই ও ১০০/ মণ গোবর সার মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। অস্থিচূর্ণ ব্যবহারে ফলের আকার ও মিষ্টতা বর্দ্ধিত হয় কিন্তু উহা চারা লাগাইবার ৩।৪ মাস পূর্ব্বে ব্যবহার করা আবশ্যক। খইল সারও কলা গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রতি বৎসর কলার জমিতে এক ফুট করিয়া পাঁক মাটি দিতে পারিলে জমিতে আর কোন সার দিবার আবশ্যক করে না। প্রতি ৩।৪ বৎসর অন্তর ইহার চাষের জমি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসই কলার চারা বা তেউড় রোপণের উপযুক্ত সময়। এ সময়ে চারা রোপণ করিলে ২।৪ সপ্তাহের মধ্যেই উহা লাগিয়া যায় এবং বর্ষা আগমনে উহারা সতেজে

বৃদ্ধিলাভ করে। সাধারণতঃ বর্ষাকালই কলাগাছের স্ফূর্তির সময়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চারা লাগাইলে উহা প্রায় এক বৎসরের মধ্যেই ফলপ্রদ হয়। আষাঢ় ও আশ্বিন মাসেও কলার তেউড় লাগাইতে পারা যায়, কিন্তু ইহাও রোপণের ঠিক উপযুক্ত সময়ে নহে। আষাঢ় মাসে চারা রোপণ করিলে চারা জমিতে লাগিয়া যাইবার পূর্ব্বে বর্ষা আসিয়া পড়ে, ইহাতে চারা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আশ্বিন মাসে চারা রোপণ করিলে সম্মুখে শীত আসিয়া পড়ায় গাছের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে। অতিরিক্ত শীতের প্রকোপে ইহা মরিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এজন্য দেখা যায় যে, শীত প্রধান স্থানে কলাগাছ ভাল জন্মে না। শীতের কলা পক্ক হইতে অধিক বিলম্ব হয় এবং ইহা কঠিন হয় ও ইহার স্বাদের ব্যতিক্রম ঘটে। গ্রীষ্মের চারা বর্ষাকালে সত্বর বর্দ্ধিত হয় এবং পূর্ণবিকাশ লাভ করে। এ সময়ের কলা সুপুষ্ট ও সুস্বাদু হয় এবং শীঘ্র পাকে। খনার মতে ফাল্গুন মাসে চারা রোপণ করা সঙ্গত, কিন্তু এ সময়ে চারা লাগাইলে যদি সম্মুখে বৃষ্টি না পাওয়া যায় তাহা হইলে চারা বাঁচান বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। এ সময়ে চারা রোপণ করিয়া বাঁচাইতে পারিলে গাছ খুব তেজাল ও ঝাড়বিশিষ্ট হয় এবং উহার ঝাড় খুব বড় হয় সত্য কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মে জলসেচন ব্যতীত ভাল ফল হয় না।

সাধারণ হিসাব অনুসারে জমিতে আট হাত অন্তর ব্যবধানে কলাগাছ রোপণ করা হইয়া থাকে। সমস্ত কলা-

গাছের আকৃতি সমান নহে সুতরাং কলাগাছের আকার অনুযায়ী ও জাতি হিসাবে উহাদিগকে সেইরূপ ব্যবধানে লাগাইতে পারা যায়। নেপালী, কাবুলী প্রভৃতি খর্ব্বজাতীয় কলাগাছ ৪-৫ হাত—এবং শবরী, অগ্নিশ্বর, মর্ত্তমান প্রভৃতি জাতীয় গাছ ৬-৮ হাত অন্তর লাগান চলে। কলাগাছ খাসী করিয়া রোপণ করার প্রথা এদেশে বিশেষ প্রচলিত নাই। গাছ খাসী করিলে অপেক্ষাকৃত কম স্থানে ইহাদের সন্নিবেশিত করা চলে, কারণ খাসী করা কলাগাছ ও পাতা সাধারণ রোপিত কলাগাছ ও উহার পাতা অপেক্ষা কিছু ছোট হয়। মাটির ২-২॥ হাত উপরে গাছের মস্তক ভাগ চক্রাকার ছেদন করাকে খাসী করা বলে। যাহা হউক জমিতে ৬ হইতে ৮ হাত অন্তর ব্যবধানে ১২ হাত গভীর ও ১ হাত গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে উপযুক্ত সময়ে চারা লাগান উচিত। চারা লাগাইবার পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত চারাগুলির শিকড় ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। চারার গোড়ায় পচা দাগ দেখিলে ছুরি দ্বারা পচা অংশ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। চারাগুলি এক সাইজের হইলে ভাল হয়। চারা বা তেউড় খুব বড় বা খুব ছোট না হইয়া মাঝারী সাইজের হওয়াই ভাল। কোন দূরদেশে পাঠাইবার পক্ষে ছোট চারাই উপযোগী। চারার গোড়ার শিকড়াদি পরিষ্কার করিয়া ২।৩ দিন উহা কোন ছায়াযুক্ত স্থানে জাগ দিয়া সাজাইয়া রাখবার পর জমিতে লাগান উচিত। চারাগুলি

যেন সতেজ ও নীরোগ হয়। সাধারণতঃ ২-২॥ হাত কলার তেউড় জমিতে লাগাইবার পক্ষে উপযোগী।

চারা লাগাইবার পর দুই কি তিন সপ্তাহের মধ্যেই চারা বসিয়া যাইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ সময়ে উহাদের নূতন শিকড় ও কচি মাজ পাতা বাহির হয়। এ সময়ে গাছের গোড়ার মাটি কোপাইয়া আলগা করিয়া দিতে হয়। চারা ভালভাবে জমিতে লাগিয়া যাইবার পর ২।৩ মাসের মধ্যে গাছের দুইদিক হইতে মাটি টানিয়া গোড়া উচু করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। প্রবল বাতাস বা ঝড়ে কলাগাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। এজন্য জমির ধারে ধারে বাতাস আটকাইবার মত গাছের বেড়া থাকিলে ভাল হয়। জমির ধারে বীচে কলাগাছ লাগাইলে উভয় কার্য্যই সাধিত হয়। মনে রাখিবেন জমির ধারে ধারে বড় জাতীয় গাছ লাগাইলে জমিতে আলো, রৌদ্র ও বাতাস উপযুক্তরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। কলাগাছের পাতা কোন ক্রমেই কাটা উচিত নয়, ইহাতে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শীতকালে গাছের পাতা কাটিলে অনেক সময় গাছ মারা পড়ে। চারা লাগাইবার পর বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে একবার সেচ দেওয়া আবশ্যক। এই সময়ে গাছের শুষ্ক পাতা ও পচা খোলাগুলি কাটিয়া দিতে হয় ও আগাছা মারিয়া ফেলিতে হয়। বৎসরে তিনবার মাটি কোপাইয়া দিলে ভাল হয়। বৈশাখে চারা লাগাইবার পর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে একবার ও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পুনরায় জমি কোপাইয়া দিতে হয়। গাছ বড় হইয়া মোচা নামিবার সময় উপস্থিত হইলে ঠেকা

দিতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই ইহা করা যাইতে পারে। বড় কাঁদি নামিলে ঝড়ে কলাগাছ পড়িয়া যাইতে পারে, এজন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকা দরকার। দুই খণ্ড বাঁশ পরস্পর বিপরীত ভাবে হেলাইয়া পুতিয়া গাছের সহিত বাঁধিয়া দিতে হয়। বর্ষা-কাল ব্যতীত অন্যসময়ে মোচা বাহির হইলে গাছে জলসেচন করিতে হয়। মোচা হইতে কলার ছড়া বাহির হইলেই যখন দেখা যাইবে আর কোন ভাল ছড়া বাহির হইতেছে না তখন মোচাটী কাটিয়া ফেলা দরকার। গাছের ফলন হইবার পরই মুথা সমেত গোড়া হইতে বড় গাছটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। চারা রোপণের পরবর্ত্তী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের গোড়ায় একটী মাত্র তেউড় রাখিয়া বাকী চারাগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। কলাগাছ তিনবার খাসী করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। রামপাল কলার জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এইস্থানে সাধারণতঃ তিন বার কলাগাছ খাসী করিয়া দেওয়া হয়। বৈশাখ মাসে চারা লাগাইবায় পর শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে একবার, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে আর একবার এবং মাঘ-ফাল্গুন মাসে আর একবার এই তিনবার খাসী করিয়া দেওয়া চলে। প্রথমবার জমি হইতে ২-২৷৷০ হাত ঊর্দ্ধে ও দ্বিতীয়বার প্রথমবারের ৪।৬ অঙ্গুলি উপরে টেরচাভাবে কাটিয়া দিতে হয়। খাসী করিয়া দিলে অনেক উপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ অধিক দীর্ঘ গাছকে পোষণ করিতে হইলে গাছের যে পরিমাণ রস আবশ্যক, খাসী করা খর্ব্বাকৃতি গাছে তাহা অপেক্ষা অল্পতেই কার্য্য সাধিত হয়।

এইরূপ গাছের ফল অনেক সময় বড় হয় এবং স্বাদে উৎকর্ষ লাভ করে, গাছ সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হয়। ঝড় সাধারণতঃ বড় কলাগাছের যেরূপ ক্ষতি করে খর্ব্বাকৃতি গাছের সেরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। অনেক জাতীয় কলাগাছ খাসী করিলে প্রায় বাঁচে না, এরূপ গাছ খাসী না করাই ভাল। চাঁপা, অগ্নিশ্বর, দুধসাগর, শবরী, কাঁচকলা প্রভৃতি চারা খাসী করিলে ভাল হয়। বীচে কলা, মর্ত্তমান, কানাইবাঁশী, অমৃতসাগর প্রভৃতির চারা খাসী না করাই ভাল।

সাধারণতঃ কলার তেউড় লাগাইবার পর এক বৎসরের মধ্যেই কলাগাছের ফলন আরম্ভ হয়। বীচে কলা, অগ্নিশ্বর, দুধসাগর প্রভৃতি কলা পাকিতে, চারা রোপনের পর দেড় হইতে দুই বৎসর সময় লাগে। অধিকাংশ স্থানে বৈশাখ মাসে চারা রোপণ করিলে পরবর্ত্তী বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যেই কলা জন্মে। গ্রীষ্মকালের রোপিত গাছে পরবর্ত্তী গ্রীষ্মে বা বর্ষায় এবং বর্ষাকালের রোপিত গাছে পরবর্ত্তী বর্ষা বা শরৎ-কালে ফল ধরিয়া থাকে। কিন্তু মাটির গুণাগুণ এবং গাছের স্বাস্থ্য অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

কলা বাত্তি বা পুষ্ট হইলেই গাছের ডগা বা পাতাগুলি সমস্ত কাটিয়া লইয়া কেবল কাঁদিসমেত কলাগাছটী রাখিয়া চট বা থলে দিয়া সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। এই-ভাবে রাখিলে ফল শীঘ্র পাকিয়া থাকে। মোচা কাটিয়া দিলে কলা শীঘ্র পুষ্ট হইয়া থাকে। সুপুষ্ট কলা কাঁদিসমেত কাটিয়া

আনিয়া ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিলেও উহা শীঘ্র পাকে। শবরী, মর্ত্তমান প্রভৃতি কলা গাছে পাকিতে না দিয়া পক্ক হইবার পূর্ব্বে কাটিয়া আনিতে হয়। এই কলা গাছে পাকিতে দিলে উহা শক্ত ও গুটীযুক্ত হয় এবং সরস, মিষ্ট ও মোলায়েম হয় না। মোচা নামিবার পর হইতে ৪।৫ মাসের মধ্যেই কলা বাত্তি বা পুষ্ট হইয়া থাকে। কলা বাত্তি হইলেই উহার গাত্রস্থ শিরা লোপ পাইয়া উহার আকার গোল হইয়া থাকে। কলা পক্ক হইলে জাতি হিসাবে কোনটি ফিকে পীত, কোনটি বা গাঢ় পীত, কোনটি পীতাভ লাল, কোনটি সবুজাভ পীত এবং কোনটি বা সিন্দুরে লাল বর্ণ ধারণ করে।

কলাগাছের কাণ্ড নাই। উহা কতকগুলি খোলের সমষ্টি মাত্র। এই খোলাগুলিই দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া কাণ্ডের কার্য্য সাধন করে। মোচা নামিবার বা পুষ্পিত হইবার সময় গাছের মধ্যস্থল হইতে একটী দণ্ড বহির্গত হয় উহাতে মোচা থাকে, উহাই কলাগাছের পুষ্পদণ্ড নামে অভিহিত। এই পুষ্পদণ্ডের আভ্যন্তরীণ অংশ থোড় ব্যতীত আর কিছুই নহে। কচি অবস্থায় অর্থাৎ কলা জন্মিবার পূর্ব্বে থোড় ও মোচা বেশ নরম থাকে। ইহা এদেশে তরকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শবরী ও বীচে কলার থোড় ও মোচা উৎকৃষ্ট। কাঁচকলা ও বীচেকলা আনাজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা পক্ক অবস্থায় তত সুস্বাদু হয় না এবং পাকিতে অধিক বিলম্ব হয়, এজন্য ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারীতে ব্যবহৃত করা লাভজনক। কলা গাছের

প্রত্যেক অংশই কাজে লাগে। কলাগাছের শুষ্ক পাতা, খোল ও বাকল পোড়াইলে যে ছাই হয় তাহাতে ক্ষার থাকায় উহা সাজিমাটির ন্যায় ব্যবহার করা চলে, এই ক্ষার দ্বারা কাপড় চোপড় পরিষ্কার করা চলে। কলার পাতা, মোচা, থোড় এবং ফল বিক্রয় দ্বারা বেশ অর্থাগম হইতে পারে। কলার খোল হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম আঁইস পাওয়া যায় উহা হইতে কাপড় প্রস্তুত করা চলে। পূর্ব্বে কলার আঁইশ হইতে বস্ত্র বয়ন প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানে উক্ত শিল্প লোপ পাইয়াছে। কলাগাছ হইতে একরূপ মোটা আঁইশ বা সূত্রাংশ পাওয়া যায় উহাকে Manilla fibre বলে। ইহা খুব শক্ত ও টেকসই বলিয়া জাহাজের কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কাঁচকলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া উহা শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইলে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। সুপক্ক কলা হইতে পিষ্টক ও কলার রস হইতে সিরাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফল হিসাবেও নানাজাতীয় পক্ক কলা বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে।

কলার বহু বিভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে মর্ত্তমান, অগ্নিশ্বর, দুধসাগর, অমৃতসাগর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, বীচজবা, শবরী, রামকলা, কাবুলী, অনুপম, গ্রস মাইকেল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয়। অমৃতসাগর, অগ্নিশ্বর, দুধসাগর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, মর্ত্তমান, অনুপম প্রভৃতি ঢাকার রামপাল নামক স্থানের কলা। ইহা আকারে বড়, বীজশূন্য, সুগন্ধযুক্ত, মোলায়েম ও উৎকৃষ্ট। কেবল বাংলাদেশেই বহু বিভিন্ন জাতীয় কলা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত

দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, নেপাল ও চীন দেশে বহু বিভিন্ন জাতীয় কলা পাওয়া যায়। কলাতে শ্বেতসার ও নাইট্রোজেনের ভাগ অধিক আছে বলিয়া ইহা পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত। এক পাউণ্ড কলার শস্যে তিন পাউণ্ড মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে কলাগাছের কোন যত্ন লওয়া হয় না, এদেশে হাটে বাজারে যে সমস্ত কলা বিক্রয় হয় উহা পরিচর্য্যা বিহীন ও অযত্ন রক্ষিত ভাবে জন্মিয়া থাকে। পরিচর্য্যা দ্বারা ফলের আকার, স্বাদ ও গুণের উৎকর্ষতা সাধন করান যায়। ইহার চাষ বেশ লাভজনক। কলিকাতার বাজারে সাধারণ বড় কলা প্রত্যেকটি ৴১০ এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় বড় সাইজের কলা এক একটী ⁄০ আনা মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে প্রায় ১৫০।১৬০টি কলাগাছ লাগান যাইতে পারে। যদি প্রত্যেক কাঁদিতে ৮ছড়া করিয়া কলা থাকে এবং প্রতি ছড়ায় ১২টি করিয়া কলা ধরা যায় এবং প্রতি কলা গড়ে ১ পয়সা হিসাবে ধরা হয় তাহা হইলে প্রতি গাছ হইতে ১৷৷০ টাকা কেবল কলা বিক্রয় করিয়া পাওয়া যায়। এই হিসাবে ১৫০টী গাছ হইতে ২২৫৲ টাকার কলা পাওয়া যায়। কলার মোচা, থোড় এবং চারা বিক্রয় দ্বারাও এক বিঘা জমিতে খুব কম ২৫৲ টাকা পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি খরচ খুব বেশী করিয়া ১০০৲ টাকা ধরিলেও এক বিঘা জমি হইতে ১৫০৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

কলার জমিতে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত বাদুড়, পক্ষী এবং বানরেও বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। কেঁচোর উপদ্রব কলা বাগানে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গাছের মূলে সুড়ঙ্গ করিয়া মূল খাইয়া উহা একেবারে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলে। শীত-কালে সাধারণতঃ গাছ দুর্ব্বল থাকে এবং এই সময়ে ইহাদের উপদ্রব হওয়ায় গাছ ক্রমশঃ নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ ছায়াযুক্ত স্যাঁতা জায়গায় কেঁচোর উপদ্রব অধিক হইয়া থাকে। জমিতে রৌদ্রকিরণ পড়িলে এবং মাটি উত্তমরূপে কর্ষণ করিলে ইহার উপদ্রব হয় না। তামাকের জল প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়।

বাদুড়েরা পাকা ও কাঁচা কলা খাইয়া বিশেষ অনিষ্ট করে। মোচার রস পর্য্যন্ত চুষিয়া খায়। বাদুড়েচোষা কলা অন্তঃসার শূন্য হয় ও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া থাকে। খট্‌খটী অথবা শামুকের মালা জমির মধ্যে বাঁশে লাগাইয়া একটী দড়ির সহিত সংযোগ রাখিয়া রাত্রে মধ্যে মধ্যে ইহা নাড়িলে বাদুড় পলাইয়া যায়। সূতোর জাল টাঙ্গাইয়া দিতে পারিলে ঐ জালে পড়িয়া অনেক বাদুড় ধরা পড়ে ও বাদুড়েরা ভয় পায়।

মশকও কলার বিশেষ শত্রু। ইহারা যে সমস্ত কলার রস শোষণ করে তাহাতে এক প্রকার ছিট ছিট দাগ হয় এবং উহা সুপক্ক হয় না, পাকিলেও উহা শক্ত থাকে। সেজন্য কলার কাঁদিতে ঢাকা দেওয়া হয় ইহাতে মশা লাগিয়া কলা খারাপ

হয় না। জমিতে ঘনভাবে গাছ লাগাইলে উহার পাতায় জমি ঢাকিয়া থাকে, ফলে উপযুক্ত রৌদ্র ও বাতাস খেলিতে পায় না এবং দিবাভাগেও জমি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ঘনভাবে গাছ না লাগাইয়া রৌদ্র ও বাতাসের জন্য উন্মুক্ত রাখিলে এবং জমি পরিষ্কার রাখিলে মশকের উপদ্রব হয় না। মধ্যে মধ্যে পাতা জ্বালাইয়া ধূম প্রয়োগ দ্বারাও ইহার উপদ্রব দমন করা চলে। বানর কলার শত্রু। ইহারা অতিশয় কদলী-প্রিয়। ইহারা দল বাঁধিয়া কদলীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ক্ষেত্রের সমুদয় গাছের ও ফলের কিছু না কিছু অনিষ্ট করিবেই। এমন কি ২।৩ বানরে এক কাঁদি পক্ক কলা উদরসাৎ করিয়া ফেলে। কড়া পাহারা ছাড়া ইহাদের উপদ্রব দমন করা দুঃসাধ্য।

জোনাকী পোকা, ইঁন্দুর, শালিক এবং কাক প্রভৃতি পক্ষী কাঁচা ও পাকা কলার বিশেষ অনিষ্ট করে।

মাইজ বা ডগা আটকাইয়া যাওয়া কলাগাছের একটী বিশেষ মারাত্মক রোগ। সাধারণতঃ শীতকালেই রস সঞ্চার কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিলেই কলাগাছ ইহাতে আক্রান্ত হয়। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটী চূর্ণ করিয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া এবং জমিতে রৌদ্র ও বাতাস যাহাতে খেলে তাহার ব্যবস্থা করিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়।

কলার জমিতে সুর্য্যমুখী লঙ্কা বা আনারসের চাষ করা যায়, এবং ইহাতে কোন আলাদা সারের প্রয়োজন হয় না, আনারসের চাষ করিলে কলা গাছের ব্যবধান কমপক্ষে ১৪।১৫ হাত করিতে হইবে।

কমলা লেবু (Orange)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতের প্রায়ই সর্ব্বত্রই ইহা চাষ করা যাইতে পারে। আসামের খাসিয়া পাহাড়, দার্জ্জিলিং, কুর্গ, নাগপুর প্রভৃতি স্থানই কমলার উৎপত্তি স্থল। সাধারণতঃ কলিকাতা হইতে ১৫০ দেড় শত মাইলের মধ্যে এবং যেস্থানে বৃষ্টির পরিমাণ গড়ে ৯০ ইঞ্চি হইতে কম সে স্থানে কমলা ভাল জন্মে না। মৃত্তিকার গুণাগুণ, প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপরেই কমলা চাষের সফলতা নির্ভর করে। উঁচু বেলে দোআঁশ জমিতে কমলা গাছ লাগাইতে পারা যায়। সাধারণতঃ কঙ্করময় মৃত্তিকায় এবং যে স্থানের মাটিতে চূণ ও পটাস যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে সেই সমস্ত স্থানের কমলা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

এদেশে পরিত্যক্ত কমলার বীজ হইতে গাছ জন্মিতে দেখা যায়। কমলার বীজ হইতে যে গাছ জন্মে তাহার ফল সময় সময় অতি নিকৃষ্ট ও তীব্র অম্লস্বাদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। চেষ্টা করিলে উৎকৃষ্ট জাতীয় কমলার বীজ হইতে চারা উৎপাদন পূর্ব্বক ফলের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়, কিন্তু বীজের গাছের ফল যে মাতৃবৃক্ষের ফলের অনুরূপ হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। মৃত্তিকা ও জলবায়ুর অনুকূলতা বশতঃ বীজোৎপন্ন গাছের ফল হয়ত কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট হইতে পারে কিন্তু সকল স্থানে যে সুফলপ্রদ

হইবে এরূপ আশা করা যায় না, এজন্য বীজ অপেক্ষা কলম প্রস্তুত দ্বারাই গাছের বংশবৃদ্ধি করা লাভজনক। চোক কলম ও গুল বা গুটি কলম দ্বারা কমলার চারা জন্মাইতে পারা যায়। পাশ্চাত্য দেশে বিশেষতঃ ক্যালিফোর্ণিয়ার জোড় কলম ও চোক কলম দ্বারা চারা উৎপাদন করিবার প্রথা সমধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ আমের যেরূপ জোড় কলম এবং লিচুর গুল কলম প্রস্তুত করা হয় ইহারও সেইভাবে জোড় কলম ও গুল কলম প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ আমের বীজোৎপন্ন বা আঁটির গাছ পোষাক গাছ হিসাবে পালন করিয়া উহা উপযুক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে নির্দ্দিষ্ট ও নির্ব্বাচিত আম্রশাখার সহিত উহার কলম বাঁধিতে হয়। কমলার পক্ষেও এরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলে জম্বুরা ও বাতাবিলেবুর চারাকে কমলার পোষক গাছ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, যে কমলা লেবুর চারায় কমলার চোক বা কুড়ি (bud) সংযোগে উৎপন্ন গাছের ফল ভাল হয় না।

বাতাবি, জম্বুরা বা কোন মিষ্ট লেবুর চারার গাত্রে কমলার চোক সংযোগে উৎপন্ন বৃক্ষের ফল মিষ্ট হয়। বাংলা দেশে সাধারণতঃ কমলার গুল কলমই অধিক প্রচলিত। চোক কলম প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে উহার বীজ হইতে চারা জন্মাইতে হয়। পূর্ব্ব হইতেই বীজতলা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয় এবং সুপক্ক কমলার পুষ্ট বীজ বপন করা দরকার। বীজতলার মাটি দোআঁশ ও হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন। কমলার বীজের অঙ্কুরোৎ-

পাদিকা শক্তি খুব কম, এজন্য টাট্‌কা বীজ সংগ্রহ করিয়াই বপন করিতে হয়। বীজ শুষ্ক হইয়া গেলে সেই বীজে প্রায় গাছ হয় না। বীজগুলি পাতলা করিয়া বপন করা দরকার এবং বীজ বপন করিবারর পর উহার উপর এক ইঞ্চি পরিমাণ ঝুরা মাটি চাপা দেওয়ার দরকার। মাটি খুব নীরস বা শুষ্ক হইলে জল সিঞ্চনের আবশ্যক হয়। ১৫।২০ দিনের মধ্যে উহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। চারাগুলি এক বৎসর বয়স্ক হইলে তুলিয়া আনিয়া হাপোরে এক হাত অন্তর অন্তর লাগাইতে হয়। হাপোরের মাটিও বেশ চূর্ণ এবং হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন। হাপোরে চারাগুলি ঐভাবে এক বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিলে উহারা কলম প্রস্তুতের উপযোগী হইয়া থাকে। বর্ষার ঠিক প্রারম্ভে এবং বর্ষাশেষে চোক কলম বাঁধা যাইতে পারে। চারাগাছের কাণ্ডের উত্তর দিকে চোক লাগাইলে ইহা শীঘ্র লাগিয়া যায়। কমলার মনোনীত প্রশাখা হইতে চোক উঠাইয়া সদ্য কলম বাঁধা উচিত নহে। চোক উঠাইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে চোক সমেত প্রশাখাগুলি কাটিয়া আনিয়া সিক্ত মস বা শ্যাওলার মধ্যে জাগ দিয়া রাখিতে হয়। প্রশাখাগুলি যেন জল অভাবে বা বাতাসে শুষ্ক হইয়া না যায়। মাটি হইতে আন্দাজ চার পাঁচ ইঞ্চি উর্দ্ধে চারার গাত্রে চোক লাগাইতে হয়। চোক লাগিয়া গেলেই চোকের উপরিভাগস্থ এক ইঞ্চি বাদ দিয়া কাণ্ডের অগ্রভাগ কাটিয়া দিতে হয় এবং ঐ চোক ব্যতীত কাণ্ডের অন্য কোন শাখা-প্রশাখা পত্রাদি থাকিলেও

তাহা পরিষ্কার করিয়া কাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার। (চোক কলম দেখুন)

ভারতবর্ষ কমলার জন্মস্থান হইলেও এদেশে কমলার ৩।৪টি মাত্র জাতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইউরোপে সঙ্কর প্রথায় বহু বিভিন্ন জাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীহট্ট—আসামের খাসিয়া পাহাড় হইতে যে কমলার আমদানি হয় তাহাই সাধারণতঃ শ্রীহট্টের কমলা বলিয়া পরিচিত। সুপক্ক কমলার গাত্রের বর্ণ রক্তাভ পীত, খোসা পাতলা। অন্যান্য জাতির কমলা অপেক্ষা ইহাতে রস অধিক, ফলের আকারও বড়। এদেশীয় কমলার মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থানীয়।

দার্জ্জিলিং—জন্মস্থানের নাম অনুযায়ী ইহার ঐরূপ নাম-করণ হইয়াছে। দার্জ্জিলিং পাহাড়ের মধ্যে কালিম্পং এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই অধিক পরিমাণে ইহা উৎপন্ন হয়। দার্জ্জিলিংজাত কমলার আকার শ্রীহট্টের কমলার অপেক্ষা ছোট এবং রসও অল্প।

নাগপুরী—ভারতের মধ্য প্রদেশের নাগপুর নামক স্থান-জাত ফল বলিয়া নাগপুরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দার্জ্জিলিংয়ের কমলা অপেক্ষা ইহার আকার বড়, পক্ক অবস্থায় গাত্রবর্ণ পীতাভ হয়। ইহার খোসা পুরু কিন্তু রস খুব বেশী। সুপক্ক অবস্থায় রস খুব মিষ্ট হয়, কিন্তু খাসিয়া পাহাড় জাত লেবুতে যেরূপ সুগন্ধ অনুভূত হয় ইহাতে সেরূপ কিছুই পাওয়া

যায় না। শ্রীহট্ট বা দার্জ্জিলিংজাত কমলা শীতবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া যায় কিন্তু নাগপুরী কমলা গ্রীষ্মকালে এমন কি বৎসরের সকল সময়েই অল্পাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

সান্তারা—আকার বড়, খোসা আলগা ও হরিদ্রাভ কমলা রঙের, মধ্যস্থল ফাঁপা, কোয়া খুব আলগা, ফল সুমিষ্ট ও রসাল।

সিকিম—নেপাল ও সিকিম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। বর্ণ সান্তারার ন্যায়, খোসা পাতলা, মধ্যস্থল ফাঁপা, আকার সান্তারা অপেক্ষা ছোট কিন্তু সুমিষ্ট ও রসাল।

মাল্টা—ফল বড়, সুমিষ্ট ও অধিক রসপূর্ণ। গাত্রাবরণ হাত দিয়া খোলা যায় না, বাতাবী লেবুর ন্যায় সংযুক্ত থাকে। ফলের বর্ণ লালচে হলদে।

ওয়াসিংটন নেভেলে ও লেট ভেলেনসিয়া—জন্মস্থান ব্রেজিল, সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক জাতি। কমলালেবুর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফলে বীজ নাই বলিলেও চলে। ফল মিষ্ট এবং রসে পূর্ণ। বহুদিন রাখা চলে, ব্যবসার পক্ষে ভাল। ফলের বহিরাবরণ বাতাবীর ন্যায় সংযুক্ত থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যেস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক তথায় ভাল কমলা জন্মে, কারণ কমলার চাষের পক্ষে জল অত্যাবশ্যক। এদেশের মধ্যে দার্জ্জিলিং এবং শ্রীহট্টের কমলা উৎকৃষ্ট এবং ঐ সমস্ত স্থানেই অধিক পরিমাণে বারিপাত

হইয়া থাকে। নাগপুর প্রদেশে বারিপাতের পরিমাণ ঐ সমস্ত স্থানের তুলনায় অল্প হইলেও তথাকার মৃত্তিকার জল ধারণশক্তি অধিক বলিয়া তথায় অধিক পরিমাণে কমলা জন্মিতে দেখা যায়! যেস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম তথায় জলসেচন দ্বারা এই অভাব পূরণ করিতে হয়। আমেরিকার অন্তর্গত ক্যালি-ফোর্ণিয়ার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম, কিন্তু সেচন প্রণালীর সুবিধা আছে বলিয়া তথায় যথেষ্ট পরিমাণে কমলার চাষ হইয়া থাকে যেস্থানের মৃত্তিকায় চূণ, পটাস, ও ফস্ফরাসের ভাগ অধিক বিদ্যমান থাকে তথাকার কমলা খুব সুমিষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নবঙ্গে সার মিশ্রিত উচ্চ বেলে দোআঁশ জমিতে কমলা চাষ করা যাইতে পারে। চূণ বহুল এঁটেল এবং অতিরিক্ত বেলে মাটিতে ইহার চাষ করা চলে না। কমলার চাষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলের আবশ্যক হইলেও যে জমিতে জল বসে তথায় কমলা গাছ বাঁচে না। কমলার চাষ করিতে হইলে ২।৩ মাস পূর্ব্ব হইতে বিঘা প্রতি ৩০।৩৫ সের গুঁড়া চূণ প্রয়োগ করিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। পরে নির্ব্বাচিত জমিতে ১৪।১৫ হাত অন্তর লাইন দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে এক একটি গর্ত্ত করিতে হয়। গর্ত্তগুলি দুই হাত প্রশস্ত এবং দেড় হাত গভীর হওয়া দরকার। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসই কমলার চারা বা কলম রোপনের উপযুক্ত সময়। বর্ষাকালেও উহা রোপণ করা চলে। চারাগুলি মাটিতে বসিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করা দরকার, এজন্য অল্প ছায়ার ব্যবস্থা করিতে

হয়। গাছের গোড়া বৎসরে অন্ততঃ দুইবার খুঁড়িয়া দেওয়া এবং আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জলসেচন প্রয়োজন। ইহার জমিতে যাহাতে আগাছা জন্মিতে না পায় এবং গাছের গোড়ায় যাহাতে উপযুক্ত রৌদ্র ও সূর্য্যালোক পায় সে বিষেয় লক্ষ্য রাখা দরকার। এজন্য আবশ্যক হইলে গাছের নীচের দিকের যে সমস্ত শাখা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং মাটির দিকে নত হইয়া থাকে সেগুলি কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এদেশে কমলার চারা ফলপ্রসূ হইতে ৮।১০ বৎসর সময় লাগে, কলমের গাছ ৩।৪ বৎসরে ফল ধারণ করে। ৪।৫ বৎসরের কম বয়সের গাছ হইতে ফল লওয়া উচিত নয়। কমলার জমিতে জলসেচনর বিশেষ আবশ্যক। স্থানটী ১৪।১৫ দিন অন্তর বা আবশ্যক অনুযায়ী জলসেচন করিতে হয়। বিস্তীর্ণ বাগানে কলসী করিয়া জল তুলিয়া গাছে ঢালা সম্ভবপর হয় না। জমির মধ্যে পুষ্করিণী, কূয়া বা কোন জলের উৎস থাকা দরকার। জল উত্তোলনের জন্য পাম্প মেসিন বা বলদের দ্বারা পরিচালিত কল ব্যবহার করা যাইতে পারে। জমির মধ্যে একটী বড় নালা কাটিয়া তাহা হইতে ছোট ছোট নালা বাহির করিয়া জমির মধ্যস্থ শ্রেণীবদ্ধ গাছের প্রত্যেকটীকে বেষ্টন করিয়া এক একটী নালা আংটীর আকারে ঘুরাইয়া আনিতে হয়। পাম্প দ্বারা বড় নালার জল ঢালিলে উহা ক্রমে ক্ষুদ্র নালা বাহিয়া জমির চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গাছে চারা বা ক্ষুদ্র অবস্থায় এই ভাবে নালা দিয়া জলসেচনকে ring method

পচা গোবর	...	১৫ সের
অস্থিচূর্ণ	...	২ সের
গুঁড়া চূণ	...	½ সের
কাঠের ছাই	...	৫ সের

কমলালেবু একটী ভাইটামিন প্রধান ফল। অজকাল সর্ব্বত্রই ইহার যথেষ্ট প্রচলন ও চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সার এবং পরিচর্য্যা দ্বারা চাষ করিলে ফল আকারে বড়, মিষ্ট এবং রসাল হইয়া থাকে। ফল ধারণের প্রথমাবস্থায় প্রতি গাছ হইতে ২।৩ শত এবং পরে ৭।৮ শত পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ৩৫।৩৬টি গাছ লাগান চলে। বড় সাইজের উৎকৃষ্ট কমলালেবু কলিকাতায় খুব সস্তার বাজারেও প্রতি কুড়ি ৷৷৵০ আনার কম বিক্রয় হয় না। তাহা হইলে একবিঘা জমি হইতে প্রায় ৮।৯ শত টাকা পাওয়া যায়। খরচ—খরচা বাবদ ৩০০৲ টাকা বাদ দিয়া প্রায় ৫।৬ শত টাকা লাভ থাকে।

অন্যান্য গাছের ন্যায় কমলা গাছও নানাপ্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। চারা বা একটু বড় অবস্থায় কমলা গাছের ডাল সময় সময় শুকাইয়া যাইতে দেখা যায়, ইহা এক প্রকার রোগ। এরূপ হইলে সেই শাখার গোড়া হইতে কাটিয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ মিষ্ট কমলা গাছে এক প্রকার আটা নির্গমন রোগ জন্মিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ গাছের প্রধান মূল এই রোগে আক্রান্ত হয়, এজন্য অনেকেই ইহাকে

গাছের পা-পচা রোগও বলিয়া থাকে। গাছের কাণ্ডের যে কোন স্থান হইতে আটা বাহির হইতে দেখিলে সেই স্থান বেশ করিয়া চাঁচিয়া ফিনাইল বা ক্রূড্ অয়েল ইমালসান জল দ্বারা ধুইয়া দিতে হয়। ক্ষতস্থানে বেশ পুরু করিয়া আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া চলে। এই রোগে গাছ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। উহার ফলধারণ শক্তি কমিয়া যায় এবং ফলের আকারও ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসে।

কমলার মধ্যে একপ্রকার পচাধরা রোগ দৃষ্ট হয়। এই রোগে প্রথমতঃ কমলার গাত্রে কোন কোন স্থানে ক্ষত দৃষ্ট হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উহাতে পচ ধরে। পচ ধরিলে কমলা বিস্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত, বিবর্ণ এবং গাত্র নরম হইয়া যায়। পচধরা কমলা লেবুর সহিত অন্য ভাল কমলা থাকিলে স্পর্শদোষে উহাতেও পচ ধরে, এজন্য পচা কমলা দেখিবামাত্র বাছিয়া ফেলা দরকার।

সময়ে সময়ে এক জাতীয় পোকা কমলা গাছের পাতা খাইয়া অনিষ্ট করে, ইহাতে গাছের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় এবং ফলনের ব্যাঘাত ঘটে। কেরোসিন ইমালসান পিচকারী দ্বারা গাছে প্রয়োগ করিতে পারিলে এই পোকার উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে।

কমলার মধ্যে যে কয় প্রকার রোগ দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে শল্ক রোগই প্রধান। সাধারণতঃ শল্ক রোগ দুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। যথা—কৃষ্ণশল্ক ও রক্তশল্ক। কৃষ্ণশল্ক রোগে ফলের

উপরে ছাতাধরা রোগের ন্যায় কাল কাল গুঁড়া দৃষ্ট হয়, ইহাতে ফলেরই বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু রক্তশল্ক রোগে গাছের কাণ্ড, শাখা, পত্র, ফল প্রভৃতি সমুদয় অংশই বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগে গাছের পত্রগুলি খসিয়া পড়ে, ফল বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সময় সময় গাছ মারা পড়ে। প্রথম অবস্থায় গন্ধকের ধূম দিতে পারিলে এবং পিচকারী দ্বারা ক্রুড্ অয়েল ইমালসান, ফিনাইল জল, কেরোসিন জল প্রভৃতি ছিটাইতে পারিলে আর বিশেষভাবে সংক্রামিত হইতে পারে না।

খরমুজা

(Musk melon)

খরমুজা এদেশীয় ফল নহে, ইহার আদি জন্মস্থান মধ্য এশিয়া। এইস্থান হইতে উহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ু খরমুজা চাষের উপযোগী বিবেচনায় তথায় বিস্তৃতভাবে ইহার চাষ হইয়া থাকে। আমেরিকায় গিয়া ইহা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভারতের মধ্যে লক্ষ্ণৌ ও সাহারাণপুরজাত খরমুজা আকারে, স্বাদে ও গুণে উৎকৃষ্ট। আকারভেদে ইহার বহু বিভিন্ন জাতি আছে।

হালকা দোআঁশ জমি খরমুজা চাষের উপযোগী। চটচটে, এঁটেল ও বালুকাপ্রধান মৃত্তিকায় ইহা চাষ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পলিযুক্ত চরজমি খরমুজা চাষের পক্ষে উপযোগী। গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা ও রেড়ির খইল খরমুজার সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া বা উহাতে লাঙ্গল দিয়া মাটি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া লইতে হয়। জমিতে ৩ হাত অন্তর লাইন দিয়া ঐরূপ ব্যবধানে এক একটি মাদা করিয়া প্রত্যেকটীতে ৩।৪টী করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। চারা বাহির করিতে হইলে সবল চারা রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। বিঘাপ্রতি ৬।৭ তোলা বীজ লাগে। ইহা জমির উপরে লতাইয়া ফল প্রসব করে, গাছগুলি বড় হইয়া লতাইতে

আরম্ভ হইলে খড় বিছাইয়া দেওয়া উচিত। মাটির উপরে খড় বিছাইয়া তাহার উপর গাছ লতাইতে বা বিস্তৃত হইতে দেওয়া উচিত। স্থান বিশেষে অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করা চলে।

খেজুর

(Arabian Date)

বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর, সিন্ধু, রাজপুতানা, বরোদা, কাবুল প্রভৃতি স্থানে ইহা সাধারণ বৃক্ষের ন্যায় জন্মিতে দেখা যায়। উষ্ণপ্রধান স্থানে এবং শুষ্ক টান জমিতে ইহা ভাল জন্মে। ইহার জন্মস্থান আরব। মরু প্রদেশের গাছ হইলেও ইহার শিকড় মাটি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। বেলে দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। চূণ বহুল পাথুরে মাটী এই গাছের পক্ষে উপযোগী।

সাধারণতঃ ৬।৭ বৎসর হইতেই গাছের গোড়া হইতে কোঁক বাহির হয়। ইহার বীজ ও গাছের গোড়া হইতে বহির্গত কোঁক হইতে চারা জন্মান চলে। কোঁক বা চারা ৩।৪ বৎসরের বড় না হইলে লাগান উচিত নয়। বর্ষাকালে চারা নাড়িয়া লাগাইতে পারা যায়। জমিতে ১০।১২ হাত অন্তর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ২ হাত

গভীর ও ২ হাত গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়, পরে প্রতি গর্ত্তে একটী করিয়া চারা লাগাইতে পারা যায়। চারা লাগাইবার প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে জমির পাট সমাধা করিয়া রাখিতে হয়। চারা লাগাইবার পর গাছে নিয়মিতভাবে জল সেচন করা দরকার। কোঁক হইতে যে গাছ জন্মান হয় উহা সাধারণতঃ চারি বৎসর বয়সেই ফলবতী হইয়া থাকে। বীজের গাছ ফলবতী হইতে ৬।৭ বৎসর সময় লাগে। খেজুর গাছের মধ্যে আবার পুরুষ এবং স্ত্রী গাছ (Male and female plant) আছে। পুরুষ গাছে ফুল হয় কিন্তু ফল ধরে না। আবার পুরুষ গাছ না থাকিলে স্ত্রী গাছ ফলবতী হইতে পারে না, এজন্য প্রতি ১০০ স্ত্রী গাছের মধ্যে অন্তত ১টী করিয়া পুরুষ গাছ রাখা আবশ্যক।

প্রতিবৎসর শীতের পূর্ব্বে গাছের মস্তকস্থ অতিরিক্ত শাখা ছাঁটিয়া আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ৫।৬ বৎসর বয়স হইতেই গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিতে পারা যায়। ডাল ছাঁটিবার পর গাছে সার প্রয়োগ করিতে হয়। গোময়, গোয়ালের আবর্জ্জনাদি এবং অস্থিচূর্ণ সার হিসাবে প্রয়োগ করা চলে। পৌষ-মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরে। এক একটী গাছে, গাছের আকার ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী ৬ হইতে ১০।১২টী পর্য্যন্ত পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয়। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে বহু ছড় বাহির হয় এবং ইহাতে অসংখ্য ফল জন্মে। এইরূপে এক একটী

থোলো হইতে ১২।১৪ সের পাকা খেজুর পাওয়া যায়। ফুল ধরিবার পর হইতে প্রায় ৪ মাসের মধ্যে খেজুর পক্ক হয়। খেজুর গাছ প্রায় ৮০ হইতে ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই জাতীয় খেজুরের আঁটি ছোট, ফল মিষ্ট এবং শাঁসে পূর্ণ। খেজুর গুড় বাঙ্গালীর একটী প্রিয় খাদ্য। শীতকালে এই গাছ হইতে রস পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে সুস্বাদু গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

খেজুর দেশী

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা অনায়াসে জন্মিয়া থাকে। বাংলা দেশে ইহা অযত্ন রক্ষিত ভাবে যেখানে সেখানে জন্মিতে দেখা যায়। দেশী খেজুর পাকা অবস্থায় আরবদেশীয় খেজুরের ন্যায় মিষ্ট হয় না, অধিকন্তু ইহার আঁটি বড়, এজন্য খাদ্য হিসাবে দেশী খেজুরের তত আদর নাই। সাধারণতঃ শীতের প্রারম্ভে এই গাছ মুড়া দিয়া উহা হইতে রস বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই রস জ্বাল দিয়া গুড় ও গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করা হয়। নলিন খেজুরের গুড় বেশ সুগন্ধ এবং উপাদেয়, এজন্য ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এই গাছ খুব বড় হয় এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

ইহার চারার জায়গা পরিবর্ত্তন করা চলে না, কেননা স্থান পরিবর্ত্তন করিলে ইহা মরিয়া যায়।

করমচা

(Carissa Carandas)

ইহার সাধারণতঃ দুইটি জাতি আছে—দেশী ও চীনের। গাছ সাধারণতঃ ২।৩ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং খুব ঝোপ বিশিষ্ট হয়। এই গাছের গায়ে খুব কাঁটা আছে এজন্য জমির ধারে ধারে এই গাছ রোপণ করিলে উত্তম বেড়া হইতে পারে। সাধারণ সরস মাটিতে বর্ষাকালে ইহার বীজ বপন করিয়া চারা জন্মাইতে পারা যায়। এই গাছের বিশেষ কোন পরিচর্য্যা করিবার আবশ্যক করে না। তিন বৎসর বয়সে গাছে প্রচুর ফল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত পক্কফল পাওয়া যায়। ইহার ফল ক্ষুদ্র। পক্ক অবস্থায় ইহা হইতে উৎকৃষ্ট আচার বা চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কয়েৎ বেল

(Wood Apple)

ইহা এদেশীয় ফল। হিমালয়ের এবং দার্জ্জিলিং-এর তেরাই অঞ্চলে ইহা বন্যভাবে জন্মিতে দেখা যায়। ইহার গাছ ২০।২৫ হাত দীর্ঘ হয়।

এদেশে যে কোন জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। বর্ষাকালে বীজ হইতে চারা

উঠাইয়া উহা এক হাত আন্দাজ বড় হইলে অথবা পরবর্ত্তী বর্ষার সময় জমিতে ১২।১৪ হাত অন্তর লাগান চলে। ৮।১০ বৎসরে গাছে ফল ধরে। ফাল্গুন মাসে ফল ধরে এবং ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পক্ক ফল পাওয়া যায়। ইহার ফল ছোট এবং গোলাকার। ফল পাকিলে একপ্রকার সুগন্ধ বহির্গত হয়। ইহার খোলা বা আবরণ শক্ত। পক্ক ফলের স্বাদ অম্লমধুর। ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট মুখরোচক চাট্‌নি, জেলি ও জ্যাম প্রস্তুত হয়। অরুচির পক্ষে ইহার চাট্‌নি উপাদেয়। ঔষধ হিসাবেও ইহার ব্যবহার আছে।

কাওয়া

(Cawa Mangosteen)

মাদ্রাজের উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ ইহার জন্মস্থান বলিয়া অভিহিত। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই ইহা জন্মাইতে পারা যায়। আসাম অঞ্চলে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। এই গাছ ২৫।৩০ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

দোআঁশ মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। জমিতে ১৪।১৫ হাত অন্তর ব্যবধানে ইহার গাছ লাগাইতে হয়। বর্ষাকালে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। চারাগুলি বড় হইলে পরবর্ত্তী বর্ষাকালে জমিতে স্থায়ীভাবে লাগান প্রশস্ত। গ্রীষ্মকালে এবং আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে গাছে জলসেচন করা দরকার

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফল হয় এবং আষাঢ়-শ্রাবণে ফল পাকে। ইহা সেরূপ উৎকৃষ্ট ফল নহে এজন্য ইহার আদর নাই।

কাঁঠাল (Jack Fruit)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গেই অধিক পরিমাণে কাঁঠাল জন্মিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত নাম রসাল, পণস, কণ্টকি ফল, মূলফলদ, অপুষ্পফলদ ইত্যাদি। ইহার প্রত্যেকটি নাম ইহার আকৃতি, রূপ ও গুণের পরিচায়ক। এই গাছ প্রায় ৩০।৩৬ হাত দীর্ঘ হয় এবং ইহার কাণ্ড প্রায় ৭।৮ হাত পরিধি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সমুদ্রোপকূল হইতে প্রায় ২,০০০ ফিট উচ্চ স্থানেও ইহা জন্মিতে পারে। শীতপ্রধান বা পার্ব্বত্য স্থানে ইহা জন্মে না। ইহা সমতল ও গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের উপযোগী; নিম্ন জলা বা জলবসা জমিতে ইহা জন্মে না। উচ্চ শুষ্ক জমিই ইহার পক্ষে উপযোগী। অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে ইহা ভাল জন্মে। দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল ও কঙ্কর মৃত্তিকাতে ইহার চাষ করা চলে। জমিতে ২৪।২৫ হাত অন্তর ব্যবধানে এক একটী চারা লাগাইতে হয়। বর্ষাকালই চারা লাগাইবার প্রশস্ত সময়। জমিতে ২৪।২৫ হাত অন্তর ৩ হাত গভীর ও ৩ হাত গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোবর, গোয়ালের

আবর্জ্জনা প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়। বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে এক একটি করিয়া চারা লাগাইতে হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। ইহার বীজের উৎপাদিকা শক্তি অধিক দিন থাকে না এজন্য ইহার বীজ হইতে শীঘ্র শীঘ্র চারা জন্মাইতে হয়। কখন কখন ফলের মধ্যে ইহার চারা জন্মিতে দেখা যায়। সুপক্ক কাঁঠাল হইতে বীজ বাহির করিয়া উহাতে ছাই মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়, পরে যথা সময়ে উহা হইতে চারা জন্মাইতে হয়। প্রবাদ আছে যে যেরূপ স্থূল কাণ্ড বা শাখার ফল হইতে চারা জন্মান হয় উহা সেরূপ স্থূল না হইলে তাহাতে ফল ধরে না। ইহারও বীজোৎপন্ন গাছে মাতৃবৃক্ষের অনুরূপ ফল হয় না। সেজন্য উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছের জোড় কলম করিলে প্রকৃত কার্য্য হয়। কিন্তু এই ফলের আদর কম বলিয়া কেহ কলম করেন না। অন্যভাবে ইহার চারা জন্মাইতে পারা যায়, ইহাতে অল্প দিনের মধ্যে ফল ধরে। কোন গর্ত্তের মধ্যে একটি আস্ত সুপক্ক কাঁঠাল পুতিয়া উহার বৃন্ত উপরিভাগে মুখ করিয়া রাখিয়া কিছু চূর্ণ মৃত্তিকা উহাতে চাপা দিতে হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার যেন শিয়ালে উহা তুলিয়া না লয়। পরে একটি বড় হাঁড়ি তলায় অল্প ছিদ্র করিয়া উহার উপর উপুড় করিয়া চাপা দিতে হয়। ৭।৮ দিন পরে হাঁড়ি তুলিলে দেখা যাইবে যে বোঁটার চারিধার হইতে অসংখ্য লম্বা লম্বা চারা বাহির হইয়াছে। ঐ চারাগুলিকে পাট বা ঐরূপ কোন নরম পদার্থ

দ্বারা একত্রে জড়াইয়া বাঁধিয়া তাহাতে কাদা মাটির প্রলেপ দিতে হয়। চারাগুলি সমস্ত একত্র হইয়া একটি স্থূল কাণ্ডে পরিণত করাই ইহার উদ্দেশ্য। চারাগুলি সমস্ত একত্রিত হইলে হাঁড়ি ঢাকিয়া রাখিবার আবশ্যক করে না। এরূপ গাছে অল্প দিনের মধ্যে অধিক সংখ্যক ফল ধরিয়া থাকে এরূপ শুনা যায়। জমিতে এরূপভাবে একটি গাছ প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল। কাঁঠাল গাছ যত সরল ও স্থূল হয় ততই ভাল। চারা রোপণের ৫।৭ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বীজ হইতে চারা জন্মান হয়; চারা লাগাইবার পর আবশ্যক মত গাছে জল দেওয়া ও গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। ইহার কোন মূল শিকড় নাই। ইহার শিকড়গুলি মাটির মধ্যে চারিধারে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল শিকড় না থাকায় গাছ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না। এজন্য অল্প ঝড়ে কাঁঠাল গাছ পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। ইহার কাণ্ডের মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষের প্রতি শাখায় ফল ধরিয়া থাকে। গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে গাছের গোড়ায় কাঠ বা ঘুঁটের ছাই, গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা এবং অস্থিচূর্ণ সার দিতে হয়। ইহার ডাল ছাঁটিবার আবশ্যক করে না।

এদেশে ঢাকা জেলায়, ভাওয়াল পরগণা, ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলাতেই অত্যধিক পরিমাণে কাঁঠাল গাছ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ দুই জাতীয় কাঁঠাল দৃষ্ট হয়—(১) খাজা এবং (২)

নেওয়া বা গিলা কোয়া বিশিষ্ট। গোলাপ গন্ধ নামক আর এক প্রকার কাঁঠাল আছে উহাতে গোলাপের গন্ধ অনুভূত হয়।

স্থান বিশেষে এবং পরিচর্য্যা অনুসারে এক একটি কাঁঠাল ৬।৭ সের হইতে ৩০।৪০ সের পর্য্যন্ত হইতে শুনা যায়। ইহার বীজ বেশ সুখাদ্য ও পুষ্টিকর। রীতিমত যত্ন, পরিচর্য্যা ও সার প্রদান করিতে পারিলে এক একটি গাছ হইতে ৬০।৭০টী কাঁঠাল অনায়াসে পাওয়া যায়। কাঁঠালের আকৃতি অনুসারে উহা কলিকাতার বাজারে এক একটী ৵০ আনা হইতে ॥০ আনা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। গড়ে প্রতি কাঁঠাল।০ আনা করিয়া ধরিলে এক বিঘা জমির ১৮টী গাছ হইতে ৩২৮৲ টাকা পাওয়া যায়। খরচ-খরচা বাবদ ১০০৲ টাকা ধরিলেও ২২৮৲ টাকা লাভ পাওয়া যায়।

কাঁঠাল খাজা ও নেওয়া বা গিলা এই দুই প্রকারের আছে। খাজা কাঁঠালের গাত্র সহজ এবং পাকিলেও অল্প সবুজ থাকে। এই কাঁঠাল পাকিলেও খুব বেশী নরম হয় না। নেওয়া কাঁঠালের গায়ে কাঁটা তীক্ষ্ণ, পাকিলে ইহা নরম হয় এবং গাত্র বিবর্ণ হইয়া যায়। ইহা অতি গুরুপাক ফল। কাঁঠাল খাইয়া লবণ ও কলা খাইলে উহা শীঘ্র হজম হইয়া যায়।

পুরাতন কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি চিরিয়া যে তক্তা বাহির হয় তাহা ঠাণ্ডা বা ছাওয়া জায়গায় রাখিয়া দিলে অধিক দিন স্থায়ী হয়। জলে বা রৌদ্রে ইহা শীঘ্র খারাপ হয়। কাঁঠালের তক্তা

হইতে চেয়ার, টেবিল, প্রভৃতি বহু আসবাবপত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শৃগাল কাঁঠালের পরম শত্রু। অনেক সময় কাণ্ডের গোড়াতেই কাঁঠাল ফলে, এজন্য শৃগালেরা ইহার বিশেষ অনিষ্ট করে। কাঁঠাল পক্ক হইবার পূর্ব্বে গোড়ার কাঁঠালগুলি চট বা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হয়। কাঁঠাল ধরিবার সময় গাছের গোড়ার দিকে তালপাতা, কুল কাঁটা, খেজুরের ডাল প্রভৃতি দিয়া ঘিরিয়া দিতে হয়। পোকা কাঁঠাল গাছের বিশেষ ক্ষতি করে। সাধারণতঃ (১) কৃমি ও (২) পক্ষ বিশিষ্ট দুই জাতীয় কীট কাঁঠাল গাছের বিশেব অনিষ্ট করে। ইহারা গাছের ত্বক ভেদ করিয়া ক্রমে গাছের মধ্যে প্রবেশ করে। এই পোকা লাগিলে গাছের গাত্রের সেই স্থান হইতে লাল রস বাহির হয় এবং কাষ্ঠের গুঁড়ার ন্যায় পদার্থ গর্ত্তের মুখ হইতে নির্গত হইতে থাকে। এই গর্ত্তের মধ্যে গরম জল, কেরোসিন ইমালসান বা লেড আর্সিনিয়েট জল পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে পতঙ্গ নষ্ট হয়।

ছোট অবস্থায় কাঁঠালের ফল ঝরা রোগ দৃষ্ট হয়। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া যদি শিকড়ে কোন কীট বা পোকা আক্রমণ করিয়াছে দেখা যায় তাহা হইলে পাতায় ফিনাইল বা তুঁতের জল পিচকারী দ্বারা গাছের গোড়া ধুইয়া গোড়ায় মাটি চাপা দিতে হয়। গাছের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে তরল সার দিতে হয়।

কালজাম (Black Berry)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহা আম গাছের ন্যায় দীর্ঘ ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সমতল স্থানে ইহা ভাল জন্মে। পার্ব্বত্য স্থানে ইহা জন্মে না।

এদেশে যে কোন জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে ২৫ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গোবর সার ও গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার প্রয়োগ করিতে হয়। বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে এক একটি করিয়া চারা বা কলম লাগাইতে পারা যায়। বর্ষাকালে ইহার বীজ হইতে অথবা গুল-কলম বা শাখা-কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত করা চলে। বীজের গাছে ফল ধরিতে ৮।১০ বৎসর সময় লাগে। কলমের গাছে ৩।৪ বৎসরে ফল ধরে। চারা বা কলম এক বৎসরের বড় না হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে লাগান উচিত নয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে। গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে প্রতি বৎসর শীতের পূর্ব্বে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখিয়া পরে সার প্রয়োগ করিয়া মাটি চাপা দিতে হয়।

সাধারণতঃ ইহার দুইটী জাতি দৃষ্ট হয়। একজাতির ফল বড় এবং অন্য জাতির ফল অতি ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। যে জাতির ফল ছোট উহা কিছু বিলম্বে পাকে। ফলের বর্ণ গাঢ় লাল। পক্ক ফল হজমীকারক। ঔষধ হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। হেঁড়ে জাম বৈশাখ হইতে আষাঢ়, ক্ষুদে জাম ভাদ্র মাস এবং টক জাম আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পাকে।

কামরাঙ্গা

(Averrhoa Carambola)

ইহার জন্ম মালাক্কাস উপদ্বীপ। গাছ ১২।১৩ হাত দীর্ঘ হয়। ইহার সাধারণতঃ দুইটী জাতি দৃষ্ট হয়—দেশী ও চীনের। এক জাতীয় ফল মিষ্ট এবং অন্য জাতি অম্লস্বাদ বিশিষ্ট। আজকাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইহা জন্মিতে দেখা যায়।

প্রায় সকল প্রকার জমিতেই ইহা জন্মে, হবে হাল্কা দোআঁশ জমি ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জমিতে ১০।১২ হাত অন্তর ২ হাত গোলাকার ও ১॥০ হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার প্রয়োগ করিতে হয়। পরে প্রতি গর্ত্তে এক একটী করিয়া চারা লাগাইতে হয়। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। চারাগুলি প্রায় এক বৎসরের বড় হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করা চলে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে

গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার মাটি প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। বীজের গাছ প্রায় ছয় বৎসরে ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাছে ফুল হয় এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। পৌষ-মাঘ পর্য্যন্ত ইহার ফল পাওয়া যায়। পক্ক কামরাঙ্গা হইতে সুন্দর চাটনি বা আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চীনের কামরাঙ্গা

ইহার ফল দেশী কামরাঙ্গা অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। দেশী কামরাঙ্গার চারার সহিত জোড় কলম দ্বারা ইহার চারা উৎপন্ন করা চলে। বর্ষাকালে চারা রোপণ করিতে হয়। ফলের স্বাদ অম্লমধুর। দেশী কামরাঙ্গা পাকিলে ঈষৎ হরিদ্রাভ বিশিষ্ট হয় কিন্তু এই জাতীয় পক্ক ফলের বর্ণ ঘন সবুজ।

কুইন্‌স (বিহি)

(Quince)

ইহা একপ্রকার আপেল জাতীয় ফল, গাছ ১০।১২ হাত উচ্চ হয়। সমতল এবং পার্ব্বত্য উভয় স্থানেই হয়, তবে সমতল স্থান অপেক্ষা পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভাল জন্মে। নিম্ন বাংলায় এই গাছ ফলবতী হয় না।

সাঁরযুক্ত উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। জমিতে ৮।১০ হাত অন্তর ইহার চারা লাগাইতে পারা যায়। শীত ও বর্ষা উভয় ঋতুতেই চারা জন্মান চলে। ইহার বীজ হইতে এবং শাখা কলমে (cutting) চারা জন্মান চলে। চারা লাগাইবার পর আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা এবং গাছের গোড়ায় মাটি নিড়াইয়া আলগা করিয়া দেওয়া উচিত। পৌষ-মাঘ মাসে গাছের ডাল ছাঁটিয়া গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকের মাটি উঠাইয়া ৮।১০ দিন অনাবৃত অবস্থায় রাখিতে হয় এবং পরে সার মাটি দিয়া গোড়া ভরাইয়া দিতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গাছে ফল পাকে। ৭।৮ বৎসর বয়সে গাছে ফল ধরে।

কুল—দেশী

(Plum Zizyphus Vulgaris)

ইহাকে সাধারণতঃ 'টোপা কুল' বলে। ইহার জন্মস্থান সাইবেরিয়া, গাছ ২০।২৫ হাত দীর্ঘ হয়।

বাঙ্গালাদেশে যে কোন জমিতে ইহা সচরাচর জন্মিতে দেখা যায়! ইহা ১৫।২০ হাত ব্যবধানে বসাইতে হয়। বর্ষাকালে বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। দেশী কুলগাছে ৫।৬ বৎসর বয়সে ফল ধরিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ইহার ফুল হয় এবং মাঘ মাসে ফল পাকে।

সাধারণতঃ ইহার দুইটী জাতি দৃষ্ট হয়। এক জাতির ফলে বালির ন্যায় পদার্থ বেশী থাকে, অন্য জাতি পিচ্ছিলবৎ। ইহার ফল টক; পক্ক ফল হইতে চাট্‌নি, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বেশ মুখরোচক।

কুল—নারকেলী

(Plum Zizyphus Jujuba)

ইহার গাছ ২০।২২ হাত দীর্ঘ হয়। বাংলা দেশের নানা-স্থানে ইহা জন্মিতে দেখা যায়। বাংলা দেশ অপেক্ষা কাশী, গয়া ও যুক্ত প্রদেশের কুল আকারে বড় ও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ২।৩টি বিভিন্ন জাতি আছে। এই গাছ উঁচু ও নিচু উভয় জমিতেই হয়।

জমিতে ১৫।১৬ হাত অন্তর ইহার চারা বা কলম লাগান চলে। বর্ষাকালে বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া চারাগুলি প্রায় এক বৎসরের বড় হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে লাগাইতে পারা যায়। ইহার চোক কলম করা যায়। কলমের গাছে ২।৩ বৎসরে ফল ধরে। গাছে ফল আরম্ভ হইলে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি তুলিয়া ফেলিয়া ১০।১২ দিন ঐ অবস্থায় রাখিতে হয়। ইহার ডাল পৌষ-মাঘ মাসে ছাঁটিয়া দিতে হয়। পরে গাছের ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় এই সময় সার প্রয়োগ করিতে হয়। এই সময় গাছে প্রচুর জলসেচন করিতে হয়। বর্ষাকালে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছে ফুল হয় এবং পৌষ মাস হইতে ফল আহারের উপযোগী হইয়া থাকে। এই ফল অধিক পক্ক অপেক্ষা ডাঁসা অবস্থায় অধিক মুখরোচক হয়।

কেশুর

(Scirpus kysoor)

ইহা জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্যাঁতা জমিতে ভাল জন্মে। আদ্র জমিতে ইহার মূল লাগাইলে সহজেই চারা বাহির হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে ইহা পাওয়া যায়। চীন দেশে ইহার যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। দেশী অপেক্ষা চীনদেশের কেশুর বড় ও

উৎকৃষ্ট। ঔষধ ও পথ্য হিসাবে ইহার ব্যবহার আছে। বাংলায় বিল বাওড়ে ফাল্গুন-চৈত্রমাসে কেশুর পাওয়া যায়। তাহাই বাংলায় স্বাভাবিক কেশুর। ইহার কোন যত্ন না লওয়ায় ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। চেষ্টা করিলে ইহার উন্নতি করা সম্ভব ও অর্থনৈতিক হিসাবে ইহার উন্নতি করা প্রয়োজন।

খোবানী (Apricot)

ইহার জন্মস্থান ককেসাস্। সমুদ্রোপকূল হইতে ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ পার্ব্বত্য স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। পার্ব্বত্য স্থানে ইহা বন্য ভাবে জন্মে; কিন্তু সমতল স্থানে ইহার চাষ হয়, তবে খুব কম। ইহার চাষ অনেকটা পীচের ন্যায়।

খোবানী গাছ ২৫।৩০ ফিট উচ্চ হয়। সারযুক্ত দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মান চলে। ইহার জমিতে চূণের ভাগ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। চূণের ভাগ কম থাকিলে উহা প্রয়োগ করিয়া অভাব পূরণ করিতে হয়। শীতকালে পৌষ-মাঘ মাসে চারা লাগাইলে ভাল হয়, অথবা বর্ষাকালে চারা লাগান যাইতে পারে। জোড় ও চোক কলম দ্বারা ইহার চারা উঠান হয়। জমিতে ১২।১৪ হাত অন্তর চারা লাগাইবার পর যতদিন না গাছ ভাল ভাবে বসিয়া যায় ততদিন জলসেচন করা দরকার।

গাছ লাগাইবার পর ৬।৭ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত গাছে জল দেওয়া স্থগিত রাখিতে হয়। পৌষ-মাঘ মাসে যখন গাছে পাতা থাকে না তখন গাছ ছাঁটাই করা দরকার; এই সময়ে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কিছুদিন রৌদ্র খাওয়াইয়া গাছের গোড়া সার মাটি দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হয় এবং প্রচুর জল দিতে হয়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল ধরে এবং ১৫ দিনের মধ্যে ফলের গুটি বাঁধে। গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে গাছে রীতিমত জল দিতে হয়। ফল পাকিবার সময় পর্য্যন্তও জল দেওয়া দরকার। এক একটি গাছ হইতে কিঞ্চিদধিক ৮।৯ সের ফলন পাওয়া যায়।

গাব—বিলাতী (Persimmon)

ইহার জন্মস্থান জাপান ও চীনদেশ। এই গাছ ১৫।২০ হাত দীর্ঘ হয়, দেখিতে অনেকটা আপেল গাছের ন্যায়। এদেশের সকল স্থানেই ভালরূপ জন্মাইতে পারা যায়। ইহা অল্প আর্দ্র ও শীতল বায়ুযুক্ত স্থানে জন্মিতে ভালবাসে; ইহা সমতল স্থানেই ভাল জন্মে।

বাংলার সকল মাটিতেই ইহা ভাল জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে ১২।১৪ হাত ব্যবধানে ২ হাত গভীর ও ২ হাত

গোলাকার ভাবে এক একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি সার প্রয়োগ করিতে হয়। পরে পৌষ-মাঘ মাসে প্রতি গর্ত্তে এক একটী করিয়া চারা লাগাইতে হয়। বর্ষাকালেও ইহার চারা লাগান চলে। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া উহা এক বৎসরের বড় হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে লাগাইতে পারা যায়। জোড় কলম দ্বারাও ইহার চারা জন্মান চলে। গাছ লাগাইবার পর জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচন করা দরকার। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে। গাছে ফুল ধরিবার প্রায় মাসাধিক কাল পূর্ব্বে গাছের গোড়ার চতুষ্পার্শ্বের মাটি খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিয়া শিকড় বাহির করিয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। ১০।১২ দিন পরে উক্ত শূন্য স্থান সার মাটি দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হয় ও যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচন করিতে হয়। গাছে মুকুল দেখা দিলে জল দেওয়া কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হয় এবং ফল ধরিতে আরম্ভ করিলেই পুনরায় জল দেওয়ার কাজ আরম্ভ করা দরকার। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ করে এবং পৌষ-মাঘ পর্য্যন্ত পক্ক ফল পাওয়া যায়। চারা লাগাইবার পর ৫।৬ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। পক্কাবস্থায় ফল খাইতে হয়। ফল মিষ্ট এবং সুগন্ধ-বিশিষ্ট।

গুজবেরী (Hill Gooseberry)

ইহা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। পার্ব্বত্য স্থানে জন্মে। নীলগিরির পার্ব্বত্যময় অরণ্যপ্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার ফিকে হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাকার ফল হয়। ফল ঈষৎ অম্লরস-বিশিষ্ট। ইহা হইতে একপ্রকার মুখরোচক চাট্‌নি বা আচার প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইতে হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বপন করা চলে। বাংলার নিম্নভূমিতে জন্মে না।

গ্রেপ-ফ্রুট (Grape Fruit)

আমেরিকার বাতাবী লেবু (Pumelo) পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে গ্রেপ-ফ্রুট নামে অভিহিত হয়। এই ফল এক বৃন্তে অনেকগুলি করিয়া থোলো আকারে আঙ্গুর ফলের ন্যায় ঝুলিয়া থাকে, সেজন্য ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। ফল প্রায় ৪ ইঞ্চি গোলাকার, শাঁস ঈষৎ অম্লমধুর। ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক ও বলকারক বলিয়া খ্যাতি আছে। দেশে ও বিদেশের বাজারে ক্রমশঃ ইহার চাহিদা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেজন্য কমলালেবুর মত বিস্তৃত স্থানে ইহার চাষ লাভজনক হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইহার চাষ প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ

ফ্লোরিডা, ওয়েষ্ট ইনডিস্, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ইহার চাষ চলিতেছে। পার্ব্বত্য ক্ষেত্রসমূহে ইহার চাষ উত্তমরূপে চলিতে পারে। সেজন্য বাংলার ও আসামের বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে ও দেশের চাহিদা মিটাইয়া দিতে পারে।

সারযুক্ত হালকা দোআঁশ মৃত্তিকা ইহার চাষের বিশেষ উপযোগী। মাটি বেশ রসাল অথচ ঝুরঝুরা হইলে উত্তম ফল জন্মায়। যে সমস্ত স্থানে বাৎসরিক ৬০-১২০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় সে সমস্ত স্থানে ইহারা পুরামাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করে। যে সকল স্থানে ৬০" ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয় সে সকল স্থানে জল-সেচন প্রয়োজন হয়। কিন্তু ১২০" ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হইলে আবশ্যক মত পয়ঃপ্রণালী রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। অতি বৃষ্টিতে গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

নানা জাতীয় লেবুর ফুল-রেণু অতি সহজেই এই ফুল-রেণুর সহিত মিশ্রিত হয় সেজন্য যে সমস্ত ফল জন্মায় তাহার বীজ হইতে যে চারা জন্মায় তাহা প্রায়ই নিকৃষ্ট হয়। সেজন্য সাধারণতঃ কেহই বীজোৎপন্ন চারা লাগায় না। প্রায় সমস্ত স্থানেই চোখ-কলম দ্বারা গাছ জন্মান হয়। সময় সময় বীজোৎ-পন্ন গাছও উত্তম ফল প্রদান করে সত্য, কিন্তু তাহার সংখ্যানু-পাতিক হিসাব অত্যন্ত নগণ্য। সেজন্য চোখ-কলমই প্রশস্ত ও কার্য্যকরী। চোখ-কলম প্রস্তুতও অতি সহজ।

নীরোগ ও সতেজ বৃক্ষের উত্তম সুপরিপক্ক ফল হইতে

বীজ বাহির করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দানাগুলিই জলদ্বারা ধুইয়া লইয়া ভিজা থাকিতে বীজতলায় ২।৩ ইঞ্চি দূরে দূরে বসাইয়া দিতে হয়। যতদিন বীজ অঙ্কুরিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ছায়া করিয়া রাখিতে হয়। চারা ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলেই তুলিয়া নার্শারীতে ৫˝ ব্যবধানে লাগাইতে হয়। প্রয়োজন মত জলসেচন দ্বারা মাটি সরস রাখিতে হয়। এই সময় ১।২ সপ্তাহ গাছগুলিকে ছায়াতে রাখিতে হয়। চারা ১০।১২ ইঞ্চি বড় হইলেও বাগানে স্থায়ীভাবে বসান যাইতে পারে। যদি চোক-কলম করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে চারাগুলির কাণ্ড ৫।৬ ইঞ্চি মোটা শীস্‌পেনসিলের মত হইলেই চোক-কলম করা যায়। অবশ্য গাছের কাণ্ড আরও একটু মোটা হইলেই ভাল হয়। চোক-কলম করিবার ৩।৪ মাস পরে জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। গাছ রোপণের দূরত্ব গাছের স্বভাবানুযায়ী ২০ × ২০ ফিট হইতে ৩০ × ৩০ ফিট পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।

জমি প্রস্তুত করিবার সময় বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া উহা মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। পরে ৮।১০ হাত অন্তর লাইন দিয়া দেড় হাত গভীর ও দুই হাত পরিধি বিশিষ্ট এক একটি গর্ত্ত করিয়া গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা ১০ সের, অস্থিচূর্ণ ১৷৷০ সের ও কাঠের ছাই ৫ সের, মাটির সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

পশ্বাদির পচা মল-মূত্র সার হিসাবে গাছে ফুল হইবার

পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। শুকার সময় শুকনা ঘাস পাতার দ্বারা 'জো' বাঁধিয়া দিলে খুবই ভাল হয়। গাছের ডালপালা অতিরিক্ত ঘন হইলে মধ্যবর্ত্তী সরু রুগ্ন ডালপালা কয়েকটি কাটিয়া গাছ ফাঁক করিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত গাছ ছাঁটিবার প্রয়োজন নাই।

এই গাছেও অন্যান্য লেবুজাতীয় গাছের ন্যায় পোকা ধরে ও রোগ জন্মায়। অন্যান্য গাছের ন্যায় ঔষধ ব্যবহারে রোগ সারে। সাধারণতঃ বাংলায় ও আসামে মার্গের বীজশূন্য, ডানকান, ট্রায়ামু, কানায়াম ও প্রেলিফিক চাষের উপযুক্ত। শেষোক্তটি আসামের উচ্চ স্থানের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

গোলাপ জাম

(Rose Apple)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। এই গাছ ৮।১০ হাত দীর্ঘ হয়। আম, জাম প্রভৃতি গাছের ন্যায় ইহার কাণ্ড সেরূপ মোটা হয় না। এই গাছের ডাল খুব সরু। এঁটেল অপেক্ষা দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। পার্ব্বত্য জমিতে বা অধিক উঁচু অথবা নিম্ন জমিতে ইহা ভাল হয় না। সরস দোআঁশ মৃত্তিকাই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জমিতে ১০।১২ হাত অন্তর ইহার চারা লাগাইতে হয়। ইহার বীজ হইতে বা গুটি-কলম

দ্বারা চারা উৎপন্ন করিতে পারা যায়। কলমের গাছে শীঘ্র ফল ধরে কিন্তু বীজের গাছে ফল ধরিতে কিছু বিলম্ব হয়। বর্ষাকালে ইহার গাছ লাগাইতে হয়। কলমের গাছ ৩।৪ বৎসরে ও বীজের গাছ ৮।১০ বৎসরে ফলপ্রসূ হয়। ফাল্গুন হইতে চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিতে হয়। ইহার ফলে গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়। ফল মিষ্ট ও সুস্বাদু।

চাল্‌তা

(Dilenia Speciosa)

ইহার জন্মস্থান সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা না থাকিলেও ভারতবর্ষের জল হাওয়া যে ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহা সহজেই বুঝা যায়। এদেশে ইহার গাছ অতি সহজেই জন্মিয়া থাকে, বিশেষ কোন পরিচর্য্যার আবশ্যক করে না। সাধারণতঃ ইহার বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা চলে। চাল্‌তা গাছ বেশ বড় ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। গাছের পাতা বড় এবং ধার খাঁজকাটা বলিয়া বেশ শোভাবর্দ্ধক। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে গাছে ফুল হয় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল পাকে। আমরা সাধারণতঃ চাল্‌তার যে অংশ ফল বলিয়া

ব্যবহার করি তাহা প্রকৃতপক্ষে উহার বীজ আবরণ মাত্র। চাল্‌তা অম্লরস বলিয়া উহা হইতে বেশ মুখরোচক চাট্‌নি বা আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। একজাতীয় চাল্‌তা আছে তাহার গাছ লতানে। এই লতাজাতীয় চালতার জন্য মাচা করিয়া দিতে হয়।

চেরী (Cherry)

ইহা একপ্রকার কুলের ন্যায় ফল। ইহার গাছ নাতিদীর্ঘ সমতল প্রদেশে জন্মে না।

ইহার কয়েকটী বিভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে ২।১টি জাতি ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে সমতল ভূমিতে জন্মিয়া থাকে।

দোআঁশ বেলে জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। শীত অথবা বর্ষা উভয় ঋতুতেই লাগান চলে। জমিতে ১০।১২ হাত অন্তর চারা লাগাইতে পারা যায়। বর্ষাকালে বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া উহা একটু বড় হইলে জমিতে স্থায়ী ভাবে লাগান চলে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফুল ধরে এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল পাকিয়া থাকে। গাছে ফুল ধরিবার পূর্ব্বে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় সার প্রয়োগ করিতে হয়। গাছের গোড়ায় রীতিমত জলসেচন করা দরকার।

জলপাই (Olive)

অনেকের মতে ইউরোপের দক্ষিণ ভাগ ইহার জন্মস্থান। ভারতের অনেক স্থানে এবং বাংলা দেশে ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহার গাছ আমড়া গাছের ন্যায় দীর্ঘ হয়। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা জন্মে না। ইহার ফল দেখিতে অনেকটা নারিকেলী কুলের মত। উচ্চ দোআঁশ বা এঁটেল মৃত্তিকায় ইহা জন্মিয়া থাকে। বীজ ও গুটি-কলম হইতে চারা জন্মান চলে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ও মুখরোচক আচার বা চাট্‌নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার বীজ হইতে মূল্যবান অলিভ তৈল (Olive Oil) প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় জলপাই হইতে তৈল নিষ্কাষণ হয় না। ইহার ফলন খুব বেশী, কাত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফল পাকে।

জামরুল (Star Apple)

ভারত মহাসাগরের উপকূলস্থ দ্বীপসমূহ্‌ ইহার জন্মস্থান। এই গাছ প্রায় ২০।২২ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হয়। সমতল স্থানে ইহা ভাল হয় কিন্তু পার্ব্বত্য স্থানে ইহা জন্মে না।

এদেশে যে কোন মাটিতে ইহা জন্মান চলে, তবে দোআঁশ

মাটিতে ইহা ভাল হয়। জমিতে ১২।১৪ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে একটী করিয়া চারা বা কলম লাগাইতে হয়। ইহার কেঁকড়ি বা ডাল এবং গুটী কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত করা যায়। বর্ষাকালে বীজ হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায়, এসময়ে কলম বাঁধা চলে। কলমের গাছে ২।৩ বৎসরে ফল ধরে। ফল ও ফুল ধরিবার পূর্ব্বে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ১০।১২ দিন ফেলিয়া রাখিয়া গোড়ায় সার মাটি দিয়া গর্ত্ত ঢাকিয়া দিতে হয়। বৎসরে ইহার দুইবার ফল হয়। একবার মাঘ মাসে ফুল হইয়া বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে, অন্যবার চৈত্র মাসে ফুল হইয়া আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল পাকে। শেষোক্ত সময়ের ফল আকারে বড় হয় ও রসপূর্ণ থাকে কিন্তু প্রথম ফলনের ফল যেরূপ মিষ্ট হয়, এসময় সেরূপ হয় না।

সাধারণতঃ ইহার লাল ও সাদা ফল হিসাবে দুইটী জাতি দৃষ্ট হয়; এতদ্ভিন্ন মালাক্কা, কেগ প্রভৃতি আরও কয়েকটী বিভিন্ন জাতি আছে।

টেঁপারি

(Cape Gooseberry)

ইহা বহুবর্ষজীবী লতানিয়া স্বভাব-বিশিষ্ট গুল্ম-জাতীয় গাছ। কিন্তু বার্ষিক উদ্ভিদ হিসাবেই ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা জন্মাইতে পারা যায়। বাংলা দেশে জন্মান চলে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে জন্মে না।

যে কোন মাটিতে ইহা জন্মে, তবে দোআঁশ জমিতে ভাল হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইতে হয়। জমি প্রস্তুত করিবার সময় গোময়াদি সার মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হয়। পরে চারাগুলি ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে জমিতে ১ হাত অন্তর লাইন দিয়া একহাত ব্যবধানে এক একটী করিয়া চারা লাগাইতে হয়। বিঘাপ্রতি ১ তোলা বীজ লাগে। চারাগুলি প্রায় এক হাত আন্দাজ বড় হইয়া উঠিলে উহাদের ডালগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, ইহাতে গাছের বহু সংখ্যক শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়া ঝাড়-বিশিষ্ট হয়। ইহার পর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গাছে জল-সেচন করিতে হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ করে। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। উহা অম্লমধুর রস-বিশিষ্ট ও মুখরোচক। ইহাদ্বারা অতি সুন্দর আচার, জেলী, চাট্নী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফল ছোট ছোট ছেলেদের অতি প্রিয়।

টেঁপারির সহিত সটী চাষ ও লঙ্কার চাষ করা যায়।

ডালিম ও বেদানা

(Pomegranate)

ইহার গাছ ৮।১০ হাত দীর্ঘ হয়, ইহা স্থান বিশেষে আনার। ডালিম ও বেদানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আরব ও আফগানিস্থানে যে ফল জন্মে উহা বেদানা এবং বাংলায় ও বিহারে যাহা জন্মে তাহা ডালিম নামে পরিচিত। ইহার অভ্যন্তরস্থ দানা সরস, সুমিষ্ট ও উৎকৃষ্ট। পাটনা অঞ্চলে যে ডালিম জন্মে তাহা মন্দ নহে, কিন্তু নিম্ন বাংলার ফল অতি নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। ডালিম মেওয়া ফলের মধ্যে গণ্য। এদেশে সমতল স্থানে ইহা জন্মে এবং যত্ন ও পরিচর্য্যা করিলে ফল অনেকাংশে উৎকর্ষতা লাভ করে সত্য, কিন্তু পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে ইহা স্বভাবতঃ বন্য ভাবে জন্মিয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত ফল আকারে ও গুণে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্যাঁতসেঁতে, জল-বসা বা নীচু ঠাণ্ডা জমিতে ইহা জন্মে না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে-সমস্ত স্থানে ইহা ভাল জন্মে তথাকার মাটি টান ও নীরস হইয়া থাকে। ডালিম গাছের শিকড় মাটির মধ্যে নিম্নদিকে প্রসারিত হয় না, ইহার শিকড় ভাসা অবস্থায় থাকে; এজন্য এদেশে গাছ লাগাইবার সময় কিছু গভীর ও প্রশস্ত গর্ত্ত খুঁড়িয়া নিম্নে টালি বিছাইয়া দিলে ও তদুপরি সার

মিশ্রিত মাটি প্রয়োগ করিয়া গাছ রোপণ করিলে গাছ ঠাণ্ডা বা স্যাঁতা লাগিতে পায় না এবং ইহাতে গাছের পাট করিবারও বিশেষ সুবিধা হয়।

জমিতে ১২।১৪ হাত অন্তর লাইন দিয়া পৃথক্ ভাবে ইহার চারা বা কলম লাগান উচিত। শীত বা বর্ষা ঋতুতেই ইহার গাছ লাগান চলে। যে জমিতে চূণের ভাগ বিদ্যমান আছে তাহাতে ডালিম গাছ ভাল হয়। এজন্য জমি প্রস্তুত করিবার সময় বিঘাপ্রতি ৫।৬ মণ চূণ প্রয়োগ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট জমিতে ২॥ হাত গভীর ৩॥ হাত গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে সার মাটি প্রয়োগ করিয়া উপযুক্ত সময়ে কলম লাগান উচিত। গাছের গোড়ায় সুরকি বা পুরাতন রাবিসের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। চারা বা কলম রোপণ করিবার পর জলসেচন করা উচিত, বর্ষাকালে উহা রোপণ করিলে জল প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। বীজের চারা রোপণ করিতে হইলে উহার মূল শিকড় কাটিয়া বসাইলে ফলের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

বীজ এবং গুটী হইতে দাবা বা জোড়-কলমে ইহার চারা উৎপন্ন করা চলে। দাবা বা গুটী-কলম বর্ষাকালে প্রস্তুত করিতে হয়। জোড়-কলমে চারা জন্মাইতে হইলে আষাঢ় হইতে মাঘ মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে করা যাইতে পারে। কলম প্রস্তুত করিয়া একবৎসর হাপোরে রাখিতে হয়, পরে উহা নির্দ্দিষ্ট জমিতে স্থায়ীভাবে লাগান চলে।

গাছ ফলবতী হইবার পূর্ব্বে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রায় এক পক্ষ কাল এইরূপ ভাবে রাখিয়া কিছু গোয়ালের আবর্জ্জনা পচা গোবর ও কিছু অস্থিচূর্ণ সার মাটির সহিত মিশাইয়া গাছের গোড়ায় গর্ত্তে প্রয়োগ করিতে হয়। সার প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে গাছের ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার; গাছের কাণ্ডস্থ পত্রের নীচের দিকে যে সমস্ত শাখা থাকে সেগুলি উত্তমরূপে ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। গাছের রুগ্ন ও শুষ্ক শাখাগুলি সর্ব্বপ্রথমেই ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছে সার প্রয়োগ করিবার পর মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা দরকার। কিন্তু গাছে ফুল আসিবার সময় হইতে ফল ধরিবার সময় পর্য্যন্ত জল না দিয়া, ফল ধরিবার পর হইতেই উহা পুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত প্রচুর জলসেচন করা দরকার। ডাঁশা বা পরিপুষ্ট ফল প্রচুর জল পাইলে ফাটিয়া যায়।

সাধারণতঃ ডালিমের তিনটী জাতি দৃষ্ট হয়। ডালিমের ফল নিটোল, গোলাকার কিন্তু বেদানার গাত্র অনেকটা তোবড়ান ধরণের। বেদানার বীজ ছোট এবং উহা সুমিষ্ট, রসাল ও কোমল কিন্তু মস্কট ও ডালিমের দানা বড় ও শক্ত। আরবের সামী ও তুর্কী বেদানা অতি উৎকৃষ্ট।

এদেশে ডালিম সেরূপ উৎকৃষ্ট না হইলেও যত্ন ও পরিচর্য্যা করিলে যে ফল পাওয়া যায় তাহা বাজারে ।৶০—॥০ আনা সেরের কম বিক্রয় হয় না। এক একটী গাছ হইতে প্রায়

শতাধিক ফল পাওয়া যায়। প্রতি সেরে ৪টী হিসাবে ধরিলে এক একটী গাছ হইতে ২৫ সের ফল পাওয়া যায়। এক বিঘায় ৫০টী গাছ বসান চলে, তাহা হইলে সের হিসাবে ১২৫ সের ফলের দাম ৪৬৮৲ টাকা। খরচ খরচা বাবদ ১৬৮৲ টাকা বাদ দিলে ৩০০৲ টাকা লাভ হওয়া অসম্ভব নয়।

ডালিম গাছের কাণ্ডে ও শাখায় সময় সময় ঝুলের মত কেশর ঝুলিতে দেখা যায়। একপ্রকার পোকা উহার শাখার মধ্যে ছিদ্র করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক ঐরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে। সুবিধা থাকিলে ঐ রোগাক্রান্ত শাখার গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া দেওয়া ভাল। নতুবা যে স্থানে ঐরূপ হইতে দেখা যায় তথায় ভালরূপে চাঁচিয়া ফিনাইল জল বা কেরোসিন ইমালসান প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ডালিম ফলের গায়ে এক প্রকার প্রজাপতি ডিম পাড়িয়া যায়। ডিমগুলি ফাটিলে কীড়ারা ফলের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। ইহাতে ফলের ভিতরটি নষ্ট হইয়া যায়। ঐ কীড়াগুলি ফলের ভিতরাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে ও পরে একপ্রকার শোঁয়া পোকার আকারে বাহির হয়। ঢিলা করিয়া ন্যাকড়া বাঁধিয়া রাখিলে পোকার উপদ্রব হয় না।

ড্যাফল বা মাদার

(Monkey Jack)

স্থান বিশেষে ইহা মাদার, ডেও বা ড্যাফল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশ ইহার জন্মস্থান। এই গাছ প্রায় ৩০।৩২ হাত দীর্ঘ ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

যে কোন জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে ১৫।১৬ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। পরে বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে একটী করিয়া চারা লাগাইতে হয়। ইহার বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া চারাগুলি এক বৎসরের বড় হইলে নির্ব্বাচিত জমিতে স্থায়ীভাবে লাগাইতে পারা যায়। বীজের গাছ প্রায় ৫।৬ বৎসরে ফল ধারণ করে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং বর্ষাকালে ফল পাকে। ফল ঈষৎ অম্লরস বিশিষ্ট। উহা হইতে এক প্রকার আচার বা চাটনি প্রস্তুত হয়।

ডুরিয়ান (Durian)

মালয় উপদ্বীপ সমূহ ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান। এখান হইতে উহা ব্রহ্মদেশ, জাভা, সিলন, সিঙ্গাপুর, মরিসাস, আফ্রিকা, আমেরিকা, য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দোআঁশ জমিতে এবং আর্দ্রবায়ু বিশিষ্ট স্থানে ইহা ভাল জন্মিয়া থাকে। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায় কিন্তু বীজের উৎপাদিকা শক্তি অল্পক্ষণ স্থায়ী এজন্য কাঁঠালের ন্যায় সদ্য সদ্য বীজ পুঁতিতে হয়। চারা দুই বৎসরের হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে নাড়িয়া বসাইবার উপযোগী হইয়া থাকে। ২০।২৫ হাত অন্তর পৃথক্‌ভাবে ইহার চারা লাগাইতে হয়। গাছ রোপণের পর ১০।১২ বৎরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। কাঁঠালের সহিত ডুরিয়ান ফলের আকৃতিগত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কাঁঠালের ন্যায় এই ফলের গাত্র কণ্টকাবৃত এবং ইহার বীজ কাঁঠালের ন্যায় তরকারিতে ব্যবহার করা চলে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফল ধরে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকিয়া থাকে। ফল পাকিলে অনেকটা হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের নিকট এই ফলের গন্ধ মোটেই উপভোগ্য নহে।

তরমুজ

(Water melon)

ইহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ্। ফল হিসাবে ইহার বেশ আদর আছে। বাংলা দেশে গোয়ালন্দ ও আমতায় যথেষ্ট পরিমাণে তরমুজ জন্মিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন ভাগলপুর ও ফরেক্কাবাদে যথেষ্ট তরমুজ পাওয়া যায়। উহাদের আকার বড় ও উৎকৃষ্ট।

পলিপড়া নদীর চর জমিতে অথবা বেলে দোআঁশ জমিতে তরমুজ ভাল জন্মে। চট্‌চটে আঁটাল জমিতে তরমুজ ভাল জন্মে না এবং আকারে বড় ও উৎকৃষ্ট হয় না। গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা এবং অস্থিচূর্ণ ইহার জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। পৌষ হইলে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বে জমি উত্তমরূপে লাঙ্গল দিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। জমিতে ৫।৬ হাত অন্তর ব্যবধানে ৩।৪টি করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। চারা জন্মিলে সবল চারা রাখিয়া বাকীগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। স্থান বিশেষে বৈশাখ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত তরমুজ পাওয়া যায়। আজকাল অনেক বিভিন্ন উৎকৃষ্ট জাতীয় বিদেশী তরমুজ এদেশে চাষ করা হইতেছে। গুণে, স্বাদে ও আকারে উহারা উৎকৃষ্ট। বিঘাপ্রতি ১০।১২ তোলা বীজ লাগে।

তাল (Palm)

ভারতের সর্ব্বত্রই ইহা জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে ইহা সাধারণ বৃক্ষ মধ্যে গণ্য। দেশী তালগাছ অতি সহজে বাংলার সর্ব্বত্র জন্মে। তালগাছ জংলা পতিত জায়গা ও সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার জন্য কোন জল-সেচ বা সার দরকার হয় না। উহা প্রায় ৪০।৪৫ হাত দীর্ঘ হইয়া সরল ভাবে উঠে। বাঙ্গালাদেশে ইহা অযত্ন অরক্ষিতভাবে জন্মিলেও ইহা মানবের বহু উপকারে আসে। তালের বহু বিভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে বিলাতী পাম সাজাইবার জন্যই (decorative purpose) অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তালগাছ ৮ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে তাল দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এই গাছ ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং রস দিয়া থাকে। এই গাছ মদ্দা (পুরুষ) ও মাদী (ফলওয়ালা) দুই রকমের হয়। রস প্রধানতঃ পুরুষ জাতীয় গাছ হইতে অধিক পাওয়া যায়। ফলওয়ালা গাছ হইতেও রস পাওয়া যায় কিন্তু তাহলে ফল পাওয়া যায় না। অনেকে ফলওয়ালা গাছের কিছু তালের জন্য রাখিয়াও রস গ্রহণ করিয়া থাকেন।

প্রধানতঃ এই গাছ হইতে রস বাহির করিয়া লইয়া তাহা দ্বারা গুড়, পাটালি, মিছরি ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। যে প্রণালীতে খেজুর গাছ হইতে রস বাহির করিয়া লওয়া হয় তালগাছ হইতে সেই ভাবে রস বাহির করা হয় না।

তালগাছ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উহার অগ্রভাগে অনেকগুলি করিয়া মোচা বাহির হয় এবং নারিকেলের কাঁদির ন্যায় উহাতে বহু ফল ধরে। ইহার ফল ধরিতে ২০।২৫ বৎসর সময় লাগে। তালের রস পাইতে হইলে ক্ষুদ্রাবস্থায় অর্থাৎ ফল ধরিবার পূর্ব্বে মোচার অগ্রভাগ .কাটিয়া তাহাতে চূণ লাগাইতে হয়। অল্পদিন পরে পুনরায় উহা চাঁচিলে তাহা হইতে রস বাহির হইয়া থাকে।

কচি অবস্থায় তালের মধ্যে এক প্রকার পাতলা কোমল শাঁস জন্মে, উহা সুমিষ্ট জলে পূর্ণ থাকে এবং উহা অতি উপাদেয়। পক্ক অবস্থায় তালের মধ্য হইতে একপ্রকার ঘন ক্ষীর পাওয়া যায়। উহা দ্বারা নানাবিধ পিষ্টকাদি প্রস্তুত করা হয়। সুপক্ক তালের আঁটি কিছুদিন স্যাঁতসেঁতে জায়গায় রাখিয়া দিলে উহাতে অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে। অঙ্কুর বাহির হইলে উহার মধ্যে একপ্রকার নরম ও মিষ্ট ফোঁপল জন্মে, উহা খাইতে বেশ মুখরোচক। তালপাতা হইতে পাখা তৈয়ারী হইয়া থাকে। অধিক দিনের পুরাতন পক্ক গাছের কাণ্ড চিরিয়া উহা গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে আড়কাট রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাল-গাছের গোড়ার দিকের খানিকটা অংশ লইয়া উহা ডোঙ্গা প্রস্তুত কার্য্যে আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায় অযত্নবর্দ্ধিত সামান্য তালগাছ হইতেও যে আয় হয় তাহা নিতান্ত উপেক্ষিত নহে। পক্ক তালের আঁটি হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে ১৫।১৬ হাত অন্তর ইহা লাগাইতে পারা যায়। এই গাছ শাখা-প্রশাখা

বিহীন হইয়া সরলভাবে উর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য বিশেষ কোন পরিচর্য্যার আবশ্যক করে না। প্রতিবৎসর গাছের মাথা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ও শুকনা পত্রাদি ছাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

তুঁত
(Mulberry)

কাহারও মতে ইহার জন্মস্থান পারস্যদেশে এবং কেহ কেহ ইহা উত্তর ভারতের উদ্ভিদ্ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

ইহার গাছ ১৫।১৬ হাত উচ্চ এবং বেশ ঝাঁকড়াল হইয়া থাকে। ইহা সমতল স্থানে এবং প্রায় ৫,০০০ ফিট উচ্চ পার্ব্বত্য জমিতে জন্মাইতে পারা যায়।

প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই ইহা জন্মান চলে। তবে দোআঁশ জমিতে ভাল হয়। জমিতে ১২।১৪ হাত অন্তর ব্যবধানে দেড় হাত গভীর ও তুই হাত গোলাকার ভাবে এক-একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে এক একটী চারা লাগাইতে পারা যায়। ইহার বীজ হইতে বৈশাখ মাসে এবং খণ্ড শাখা হইতে পৌষ-মাঘ মাসে চারা জন্মান চলে। অন্যথা বর্ষাকালে চারা উৎপাদন করিতে পারা যায়। জমিতে চারা লাগাইবার পর ৩।৪ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল হয়।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল পক্ক হয়।

সাধারণতঃ ইহার কয়েকটি জাতি দৃষ্ট হয়; সাদাবর্ণ বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণের তুঁতই অধিক প্রচলিত। তুঁতফলের আকার অনেকটা পিপুলের মত, কিন্তু উহা অপেক্ষা বড় ও মোটা হয়। পক্ক অবস্থায় যে তুঁতফল শ্বেতবর্ণের হয় উহা সা-তুঁত নামে পরিচিত। ফল অম্লমধুর স্বাদ বিশিষ্ট হয়।

তুঁত গাছের পাতা পলু নামক একপ্রকার রেশম-কীটের খাদ্য, এইজন্য রেশমের কীট পালনের নিমিত্ত তুঁত গাছের বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

তেঁতুল

(Tamarind)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহার বীজ হইতে অতি সহজেই যেখানে সেখানে চারা জন্মিতে দেখা যায়। এ দেশে যত্ন করিয়া কেহ ইহার চাষ করে না।

তেঁতুল গাছের বাতাস দূষিত, এজন্য উহা বাসস্থানের সন্নিকটে রাখা উচিত নহে। কিন্তু পল্লীগ্রামে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কোথাও কোথাও ইহা গৃহস্থের প্রাঙ্গণে এবং কোথাও বা বসতবাটীর সংলগ্ন কোন স্থানে অযত্নরক্ষিত ভাবে জন্মিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া

থাকে। এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। ইহার গাছ দীর্ঘ-প্রসারী এবং খুব স্থূল হইয়া থাকে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে গাছে ফুল ধরে এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফল পাকে। তেঁতুল স্বভাবতঃ টক, এজন্য ফল হিসাবে ইহার আদর না হইলেও বাংলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিক দিনের পুরাতন তেঁতুল খুব বেশী দামে বিক্রয় হয়, ইহা আহার ও ঔষধ উভয় হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ধনী অপেক্ষা গরীবের পক্ষে ইহা অতি আবশ্যকীয় দ্রব্য এবং আয়করও বটে।

সাধারণতঃ দুই জাতীয় তেঁতুল দৃষ্ট হয়। এক প্রকার টক তেঁতুল, অন্য প্রকার লাল। তেঁতুলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, ইহা জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। তেঁতুল গাছ অধিক দিনের পুরাতন হইলে গুঁড়ি খুব মোটা হইয়া থাকে এবং এক একটী গাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানি কাষ্ঠ পাওয়া যায়।

নারিকেল

(Co-coa-nut)

আধুনিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে, নারিকেল, তাল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি গাছ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের

প্রাচীন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে মধুর বর্গের বা তৈলযোনি ফল-বর্গের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তালজাতীয় বৃক্ষের সহিত ইহাদের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকায় তালের আদর্শ ধরিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে তালীবর্গের পর্য্যায়-ভুক্ত করা যাইতে পারে।

নারিকেলের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ কুক্‌ সাহেবের মতে নারিকেলের উৎপত্তিস্থল আমেরিকা, কিন্তু উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ এম, ডি ফ্যান্‌ডোসির মতে ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জই নারিকেলের আদি জন্মস্থান। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী "মার্কোপোলো" ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকে নারিকেলকে ভারতের ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "কম্‌মস্‌" নামক জনৈক ভ্রমণকারী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে নারিকেল দেখিয়াছেন। নারিকেলের জন্মস্থান সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ মতভেদ আছে। বৈদিকযুগে একশুঙ্গা জাতীয় ফলের মধ্যে নারিকেলের নাম দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ও অমরকোষ পুস্তকে নারিকেলের উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুদের মাঙ্গলিক কার্য্যে নারিকেল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় রাজপুতদের বিবাহের সময় ঘটক দিয়া নারিকেল পাঠাইয়া বিবাহের পাকা কথা হইত। প্রাচীন ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই যে নারিকেলের জন্মস্থান ছিল, তাহা ইহার দাক্ষিণাত্য নামকরণ হইতে বেশ প্রতীয়মান হয়।

নারিকেলের উৎপত্তি স্থান যে দেশেই হউক, সে দেশ যে সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী তাহা নারিকেলের ধাতুগত অর্থ করিলে বেশ বুঝা যায়। ইহার সংস্কৃত নাম নারিকেল নার (জল) + ষ্ণিক = নায়িক (জলময় বা জল সন্নিহিত স্থান) + ঈর (গমন করা বা বৃদ্ধি পাওয়া) + অ = নারিকের। নারিকের শব্দ হইতেই নারিকেল নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহে এবং লবণাক্ত আর্দ্র বায়ুতে নারিকেল গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয়, এবং গাছ অধিককাল জীবিত থাকে। এইরূপ স্থানের গাছগুলি অনেক দিন জীবিত থাকিয়া অধিক ফলপ্রসূ হইয়া থাকে এবং ফলের আকারও বড় হয়। সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী সরস স্থান সমূহে নারিকেল গাছ জন্মে কিন্তু সমুদ্রতীর হইতে যতই দূরে যাইতে থাকে ততই ফলের স্বাদ, আকার ও ফলনের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। শীতপ্রধান স্থানে বা পার্ব্বত্য প্রদেশে নারিকেল গাছ জন্মিতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূল হইতে ২০০ মাইল দূরবর্ত্তী ভূখণ্ডে এবং প্রায় আড়াই হাজার ফিট উচ্চ স্থানেও নারিকেল জন্মিয়া থাকে। আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের উষ্ণ স্থান সমূহেও নারিকেল গাছ জন্মে। সাধারণতঃ ভারত মহাসাগরে, সিঙ্গাপুর, পিনাং লঙ্কাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে সুমাত্রা, জাভা, ম্যানিলা, মালাক্কা, ফিলি-পাইন, সেলিবিস, বোর্ণিয়ো দ্বীপে এবং মালয়, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে অত্যধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যে, দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজের গোদাবরী জেলা, মালাবার উপকূলে, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অধিক পরিমাণে নারিকেল চাষ হইয়া থাকে। বাংলা দেশের অনেক স্থানে নারিকেল জন্মিলেও ইহার সেরূপ চাষ দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্ব্ব বঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় অল্প-বিস্তর নারিকেল গাছ জন্মিয়া থাকে। ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও বরিশাল জেলায় ব্যবসা হিসাবে নারিকেল চাষ প্রচলিত আছে। উত্তর বঙ্গে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় নারিকেল গাছ খুব কম দৃষ্ট হয়। পশ্চিম বঙ্গে যশোহর, খুলনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল গাছ জন্মে, কিন্তু মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে এবং বীরভূম ও বাঁকুড়ায় বড় একটা নারিকেল গাছ দেখা যায় না। বিহার এবং আসাম প্রদেশে কম সংখ্যক নারিকেল গাছ দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যা প্রদেশের সমুদ্র সন্নিহিত স্থানেও বিস্তর নারিকেল জন্মে।

নারিকেল গাছকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,(১) দীর্ঘাকার ও (২) হ্রস্বাকার। দীর্ঘাকার নারিকেল গাছে ৮।১০ বৎসর পর হইতেই ফল ধরিতে আরম্ভ করে এবং প্রায় ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। হ্রস্বাকার নারিকেল গাছে ৪।৫ বৎয়র বয়স হইতে ফল দিতে আরম্ভ করে এবং প্রায় ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। হ্রস্বাকার নারিকেল গাছগুলির ফল ছোট হইলেও শীঘ্র ফল প্রদান

করে এবং অধিক ফল হয় বলিয়া অনেকে এইপ্রকার গাছের আবাদ করেন।

স্থানভেদে এবং মৃত্তিকা ও জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের নারিকেল দৃষ্ট হয়। প্রকার ভেদে ঈষৎ চ্যাপ্টা, গোল ও বাদামের আকৃতি বিশিষ্ট; আকৃতি ভেদে ছোট, বড়, মধ্যম এবং বর্ণভেদে পীত, শ্বেত, লোহিত, কমলাবর্ণ এবং পীত, শ্বেত ও লোহিতের মধ্যে পরস্পর মিশ্রবর্ণের নারিকেল দৃষ্ট হয়।

মধ্যবয়স্ক গাছের দক্ষিণ দিকের কাঁদির সুপক্ক (ঝুনা) বা কাঁকলি নারিকেল বীজের জন্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। যে ফল গাছে পাকিয়া ঝুনা হইয়া যায় এরূপ ফলগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক কোন আদ্র´ ছায়াযুক্ত স্থানে স্তুপীকৃত করিয়া অঙ্কুরোদ্গমের জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। ঝুনা নারিকেল গাছ হইতে খসিয়া পড়িয়া গেলে সেই ফল হইতে সরস ও সুস্থকায় গাছ জন্মে না, সুতরাং যাহাতে ফলে আঘাত না লাগে এরূপ ভাবে সুপক্ক ফল-গাছ হইতে সাবধানে নামাইতে হইবে। আঘাতপ্রাপ্ত ফলের গাছ সাধারণতঃ বক্র, ক্ষীণজীবী ও রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং ঐ গাছে ফল জন্মিতে বিলম্ব হইয়া থাকে। অনেকের মতে বীজের জন্য কাঁকলি গাছের ফল নির্ব্বাচন করা উচিত। খুব বৃদ্ধ গাছের ফলকে চল্‌তি ভাষায় "কাঁকলি" কহে। কাঁকলি গাছের ফলের চারার ফলও বড় হয় এবং ফল অল্পদিনে হয়। ছোট ছোট নারিকেল গাছের ফল বীজরূপে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ

এরূপ গাছের ফল বড় হয় না ও অধিক ফল দেয় না এবং গাছ দীর্ঘকাল বাঁচে না। বয়ঃপ্রাপ্ত, মধ্যবয়স্ক বা অল্পবয়স্ক যেরূপ গাছের ফলই বীজরূপে ব্যবহার করা যাক না কেন, সেই গাছের ফল মাতৃবৃক্ষের প্রকৃতির অনুরূপই হইয়া থাকে।

শীতকাল ব্যতীত অন্য সব ঋতুতেই নারিকেল চারা লাগান চলে; সাধারণতঃ বর্ষাকালেই (আষাঢ় মাসে নারিকেলের চারা অতি উত্তম) এই কার্য্য প্রশস্ত। চারা লাগাইবার ১ বৎসর পূর্ব্বে ইহার বীজ বপন করা উচিত। বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইতে অধিক সময় (কম পক্ষে ২।১ মাস) লাগে। বীজ নারিকেল চারাইবার পূর্ব্বে ২৪ দিন উহা জলে ভিজাইয়া লইলে ভাল হয়। যেস্থানে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বীজ নারিকেলগুলি রাখা হইবে তাহা যেন ছায়াযুক্ত হয়, এবং সেখানকার মাটি যেন ভিজা থাকে। নারিকেলগুলি গায়ে গায়ে সোজা অর্থাৎ মুখ বা বোঁটার দিক উপরে করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা উহা হইতে সরল চারা বাহির হয় না। নারিকেলের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি প্রায় এক বৎসরকাল বিদ্যমান থাকে, সুতরাং এক বৎসর কালের মধ্যেই কিছু আগুপিছু উহার চারা বাহির হয়। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, নারিকেল স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলেও তাহা হইতে চারা বাহির হয়, কিন্তু এরূপ চারা হইতে গাছ না জন্মান উচিত। লবণের স্তূপের উপর রাখিয়া দিলে অল্পদিনের মধ্যেই নারিকেলের কল বাহির হইতে শুনা যায়। লবণ গাদায় রাখিয়া কল বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাড়াতাড়ি কল বাহির হইলেও শেষ পর্য্যন্ত গাছ

বাঁচে না। নানা ভাবে ৫০টা নারিকেল লইয়া লবণ গাদায় পরীক্ষা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে অতিরিক্ত লবণ গাছের পক্ষে মারাত্মক। পরীক্ষার সময় দেখা গিয়াছে লবণ গাদা হইতে নারিকেল কল সমেত সরাইয়া লইলেই কিছুদিন মধ্যে গাছে পচ ধরে ও মরিয়া যায়। আবার বেশীদিন গাছ রাখিয়া দিলেও লবণে খোলা জরিয়া যায় ও গাছ মরিয়া যায়। উক্ত ৫০টা গাছের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত যে ২।১টা বাঁচিয়া ছিল তাহারাও ২।১ বৎসর পর মরিয়া গিয়াছিল ও সেই সময় পর্য্যন্ত তাহারা বরাবরই রুগ্ন ছিল।

নারিকেলের ভিতরে যতদিন শাঁস ও জল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত উহার অঙ্কুরোৎপাদনের ক্ষমতা থাকে। অঙ্কুর বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে নারিকেলের মধ্যে ফোঁপল জন্মে এবং যতই অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই ফোঁপল বড় হয় এবং ভিতরের জল ও শাঁসের ক্ষয় হইতে থাকে। অবশেষে ফোঁপল মালার সমান হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ভিতরে শাঁস ও জল লুপ্ত হয়। এই জল ও শস্য অঙ্কুরের খাদ্য। এই খাদ্য ফুরাইয়া গেলে শিকড় ফলের দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া নূতন খাদ্যের সন্ধানে বহির্গত হয়। এই সময় উহা উঠাইয়া আনিয়া হাপোরে রোপণ করিতে হয় এবং কিছু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ স্থানে রাখা চলে। হাপোরের স্থান ছায়াযুক্ত দেখিয়া নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। উপরোক্ত চারা প্রস্তুত না করিয়া বীজ নারিকেলের চারা হাপোরে প্রস্তুত

করিতে পারা যায়। হাপোরের মাটি অন্ততঃ একহাত গভীর করিয়া কোপাইয়া মাটি খুব গুঁড়া করিয়া ফেলিতে হইবে, পরে উহাতে জল ঢালিয়া মাটি কাদার ন্যায় করিয়া সুপক্ক বড় ঝুনা নারিকেল এক-একটী সোজাভাবে এক হাত অন্তর করিয়া পুঁতিয়া দিতে হইবে। হাপোর শীতল ছায়াযুক্ত স্থানে নির্ব্বাচন করা এবং উহার মাটি সর্ব্বদা ভিজা থাকা আবশ্যক। হাপোরের জমিতে পরিমাণ মত কাঠের ছাই ও লবণ ব্যবহার করিলে চারার বিশেষ উপকার হয়। অঙ্কুরিত চারাগুলি ১ বৎসরের মধ্যে আড়াই হাত হইতে তিন হাত পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। অন্য উপায়েও নারিকেলের কল বাহির করিতে পারা যায়। নির্ব্বাচিত বীজ নারিকেলগুলি ৮।১০ দিন জলে ভিজাইয়া লইয়া উহার মুখ বা বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া শিকায় ঝুলাইয়া রাখা চলে। এই উপায়েও ঠিক সময়ে কল বাহির হইলে সতেজ চারাগুলি জমিতে বসান চলে।

"গুয়া নারিকেল নেড়ে রো" এই প্রবাদ বাক্যটীর বিশেষ সার্থকতা দেখা যায়, কারণ নারিকেলে চারা না রাখিয়া স্থায়ী ভাবে জমিতে বসাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২।৩ বার স্থানান্তরিত করিলে উহারা সতেজে জন্মে ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে এবং দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। এ সময় উহাদিগকে একটু ছায়াযুক্ত স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

বেলে মাটি নারিকেল বৃক্ষ রোপণের অনুকূল নহে। বেলে অপেক্ষা দোআঁশ মাটি ইহার পক্ষে ভাল, কিন্তু এঁটেল মাটি

ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী। মোট কথা, যে স্থানে বার্ষিক উষ্ণতার পরিমাণ গড়ে ৫০ হইতে ৭৫ ডিগ্রী এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০" ইঞ্চি হইতে ৬০" ইঞ্চি, এরূপ স্থানই নারিকেল চাষের উপযোগী।

"নারিকেল ষোল, সুপারী আট"—কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শিনী জ্যোতিষ-রাজ্ঞী খনা, নারিকেল গাছ যোল হাত অন্তর রোপণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জমিতে ১২ হাত অন্তর উহা বসান চলে। বার হাত অন্তর এক হাত গভীর ও দেড় হাত প্রশস্ত এক একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে আধসের পরিমাণ লবণ এবং কাঠের ছাই ও গোময় দ্বারা বাকি স্থানটি পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হইতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি কাল নারিকেলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের অন্ততঃ দেড়মাস দুইমাস পূর্ব্বে কাজ সম্পূর্ণ করিয়া রাখা দরকার এবং পরে উপযুক্ত সময়ে চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। নারিকেলের মধ্যে কোন কোন জাতি আছে যাহাদের গাছ একটু খর্ব্বাকৃতি হয়, সেগুলি একটু ঘন করিয়া বসান চলে। মোট কথা, নারিকেল গাছ পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উহাদের একটি গাছের পত্রশাখা যাহাতে অপরের গাত্র স্পর্শ করিতে না পারে এরূপ পৃথকভাবে চারা বসাইতে হইবে। অতিরিক্ত ঘন ঘন বসাইলে গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, গাছ রোগগ্রস্ত হয় এবং ফল দিবার ক্ষমতা অধিককাল থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, নারিকেল গাছ গুচ্ছমূলক উদ্ভিদ, ইহার শিকড়

মাটির নিম্নভাগে অধিক দূরে প্রবিষ্ট হয় না। ইহার শিকড় মাটির অনতিনিম্নে পার্শ্বদেশে অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হয়। এবং একের শিকড় অপরের সহিত জড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং শোষণের অসুবিধা ঘটায়। ইহাতে গাছ উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে না, ফলতঃ ফলের আকার ছোট হয়; এজন্য নারিকেল গাছ ঘন সন্নিবেশিত করা উচিত নয়।

বাগানে চতুর্ভুজ আকারে ২৫ ফুট অন্তর প্রতি গাছ রোপণ করিলে ১ একর জমিতে ৭০টী; ৩০ ফুট অন্তর রোপণ করিলে ৪৮টী গাছ বসান যাইতে পারে। ত্রিভুজাকারে ২৫ ফুট অন্তর করিয়া বসাইলে ১ একরে ৮০টী; এবং ৩০ ফুট অন্তর করিয়া লাগাইলে ৬০টী গাছ রোপণ করা যায়। সুতরাং ত্রিভুজাকারে রোপণ করাই লাভজনক।

নারিকেল চারা অন্ততঃ দুই হাত বড় হইলে উহা জমিতে বসান যুক্তিসঙ্গত। নারিকেল চারা বসাইবার সময় উহাদের অতিরিক্ত শিকড় ছাঁটিয়া বসাইয়া দিলে গাছ তেজাল হয় এবং শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। যে গাছ শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না, তাহাদের তুলিয়া শিকড় ছাঁটিয়া পুনরায় বসাইয়া দিলে বিশেষ কার্য্যকরী হয়। চারা রোপণ করিবার সময় গর্ত্তটি সম্পূর্ণ বুজাইয়া না দিয়া গাছটীর গোড়ায় ৪।৫ ইঞ্চি আন্দাজ স্থান খালি করিয়া রাখিলে ভাল হয়। ইহাতে স্বাভাবিক উপায়ে গাছ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই গর্ত্ত বুজিয়া যাইবে এবং ইহাতে গাছ ভাল থাকিবে ও গাছের তেজ হইবে। জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণের পর

চারাগুলির উপর একটু আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়, কারণ ছোট অবস্থায় উহারা দারুণ রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে পারে না। গাছের গোড়ায় কোন আঁগাছা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয় এবং জন্মিলে উহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। চারা অবস্থায় ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত গাছের গোড়ায় জলসেচন করা বিশেষ প্রয়োজন। চারা অবস্থায় ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে গাছ হেলিয়া পড়িলে উহার পাশে বংশখণ্ড বা কোন গাছের মোটা ডাল সোজাভাবে পুঁতিয়া গাছের সহিত বাঁধিয়া দিলে উহা সরলভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। গাছ সরল, স্থূল ও স্বাস্থ্যবান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বক্র গাছে উপযুক্তরূপে এবং অধিককাল ফল জন্মে না।

বাংলাদেশে নারিকেল গাছে সাধারণতঃ কোন সার দেওয়া হয় না, এজন্য গাছে ফল ধরিতে অধিক বিলম্ব হয়, ফল ছোট ও কম হয় এবং ফল দিবার শক্তি অধিক দিন থাকে না। বাংলা দেশে প্রতি গাছ হইতে বৎসরে প্রায় ১০০।১৫০ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য স্থানে যেখানে নারিকেলের আবাদ হয়, তথায় প্রতি গাছে বৎসরে ২৫০।৩০০ ফল দেয়। আমাদের দেশেও সার ব্যবহার করিলে অধিক ফলনের আশা করা যায়।

“খনায় ডাকিয়া বলে—
চিটা দিলে নারিকেল মূলে
গাছ হয় তাজা মোটা,
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা।”

কৃষিবিদ্যায় অভিজ্ঞা বিদুষী খনার মতে ধানের চিটা নারিকেল গাছের উৎকৃষ্ট সার। গাছের গোড়ায় ধানের চিটা দিলে গাছ সতেজে বৰ্দ্ধিত হয় এবং ফল প্রসব করে। ধানের চিটা প্রয়োগের পর জলসেচন প্রয়োজন; ইহাতে সেগুলি পচিয়া মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া সারের কাজ করে।

"গাছে দিলে নুন মাটি
শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটী।"

গাছের গোড়ায় লবণ প্রয়োগে বিশেষ সুফল ফলে। কিন্তু উহা পরিমাণ মত দিতে হয়। অধিক প্রয়োগে উপকারের পরিবের্ত্তে অপকারই অধিক হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ৫।৬ বৎসরের কমে নারিকেল গাছে ফল ধরে না। নারিকেল গাছে ফল ধরিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বর্ষান্তে গাছের বয়স হিসাবে উহার গোড়ায় /॥০ সের হইতে /১ সের পর্য্যন্ত লবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পোড়ামাটি, পাঁকমাটি, কচুরিপানা, কাঠের ছাই ও পচা মাছ নারিকেল গাছে সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সাধারণতঃ নারিকেল চারা রোপণের ৩।৪ বৎসর মধ্যে গাছে গুঁড়ি ধরে; প্রথম অবস্থায় গুঁড়ি না জন্মান পর্য্যন্ত উহা অতি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় কিন্তু গুঁড়ি জন্মাইবার পর হইতেই ২।৩ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। কোন কোন গাছে একটু বলিম্বে ধরে। ৮।১০ বৎসরেও গাছে ফল না জন্মিলে উহার

অফলা দোষ নিবারণের জন্য ধানের চিটা এবং লবণ ও কাঠের ছাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের উদ্যানে গত দশ বৎসর ধরিয়া বহুরূপ সার পরীক্ষা করিয়া শেষে নিম্নলিখিত প্রথায় সার প্রয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছি। বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে প্রতি গাছের চতুর্দ্দিকে দুই হাত স্থান ছাড়িয়া দুই হাত চওড়া ও দেড় হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া রাখা হয়। আষাঢ়ের বৃষ্টি আরম্ভ হইলে কাঁচা টাট্‌কা গোবর প্রত্যহ গোয়াল ঝাঁটাইয়া আনিয়া উপরোক্ত গর্ত্তে ঢালিয়া সম্পূর্ণরূপে ভর্ত্তি করিয়া উপরে মাটি লেপিয়া দিতে হয়। তাহার পর ভাদ্র মাসে নদী-নালাতে যে সমস্ত কচুরিপানা ভাসিয়া আসে তাহা সংগ্রহ করিয়া উক্ত গোবরের উপর (মাটি সরাইয়া) চাপা দেওয়া হয়। ক্রমশঃ উক্ত গোবর ও পানা পচিয়া গাছের প্রভূত উন্নতি হইতে দেখা যায়। অনেকের ধারণা, কাঁচা গোবর প্রয়োগে গাছের ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু উক্ত ধারণা ভুল। কারণ যে সমস্ত গাছে পোকা ধরিয়া মরিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহারা উক্ত সার প্রয়োগের ফলে সতেজে বর্দ্ধিত হইয়াছে ও প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করিতেছে। উপরন্তু যে সমস্ত স্থানে ভাল ভাবে নারিকেল ফলে না—গোবরে-পোকার উপদ্রবে গাছ মরিয়া যায় ; মাটি ও জল মিষ্ট, নোনা নাই—সে সমস্ত স্থানে এই প্রথা এতদূর কার্য্যকরী যে আমি পাঠকদিগকে এবিষয়ে খুব জোরের সহিত সুপারিশ করিতে পারি। পাটা

শেওলা নদী বা পুকুর হইতে তুলিয়া বৈশাখ মাসে গর্ত্তে দিয়া তাহার উপর গোবর দিলে নারিকেল অত্যন্ত নরম হয়, তৈল বা স্নেহ বেশী হয় ও নারিকেল মিষ্ট হয়। এইরূপ ভাবে নারিকেল গাছের পরিচর্য্যা করিলে যে সমস্ত স্থানে নারিকেল গাছ ভাল হয় না, যে সমস্ত গাছের নারিকেল ঝরিয়া পড়ে, ফাটিয়া যায় কিংবা শুধু খোলা জন্মায়, তাহাও উত্তম ফলপ্রসূ হইতে দেখা যায়।

গাছ বড় হইলে গুঁড়ির চতুষ্পার্শ্ব স্থান হইতে শিকড় বাহির হয়। মাটি হইতে প্রায় দেড় হাত উচ্চ পর্য্যন্ত গুঁড়ির চতুষ্পার্শ্ব স্থান হইতে যে শিকড় বহির্গত হয় তাহাকে অস্থানিক মূল বলে। সাধারণতঃ দেখা যায় এই শিকড় বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত গাছ ফলপ্রসূ হয় না, সুতরাং এই শিকড় নারিকেল বৃক্ষের যৌবনের পরিচায়ক ইহা হইতেই অনুমান করা যায়। নারিকেল গাছ দীর্ঘে ৫০।৬০ ফিট পর্য্যন্ত হয় এবং এদেশে একশত বা তদূর্দ্ধ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

গাছ ১৪।১৫ বৎসরের বড় হইলে গাছের গুঁড়ির মোথায় ১-১॥ হস্ত উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক অস্থানিক শিকড় বহির্গত হয়। অধিকাংশ সময় এই সমস্ত শিকড় মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। আবার অনেক সময় অতি বৃষ্টির জন্য মোথার চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যাওয়ায় শিকড় মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। সেজন্য গাছের পক্ষে এরূপ শিকড় কোন কার্য্যেই আসে না। কিন্তু এ সমস্ত শিকড়ে যদি মাটি চাপা দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা নিজেরা যদিও বাড়ে

না কিন্তু প্রত্যেক শিকড়ের অগ্রভাগের কিঞ্চিৎ উপর হইতে অসংখ্য সম মোটা শিকড় বাহির হইয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে। এই সমস্ত নূতন শিকড় গাছের জন্য প্রচুর খাদ্য আহরণ করে ও গাছ ইহাতে সতেজ হয়। তাহারা ঝড়-ঝাপটে গাছকে মাটির সহিত শক্ত করিয়া রাখে।

সাধারণ জ্ঞানে ও অনুশীলনে দেখা যায় যে গাছের শিকড় সংখ্যা বেশী হইলে গাছের খাদ্য যোগান বেশী হয় ও বেশী খাদ্য পাইলে গাছ সতেজ হয় ও ফল প্রদান করে বেশী। বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ে বহু পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন, অধিক সংখ্যক শিকড় উৎপাদনে বৃক্ষ অধিক সংখ্যক ফল উৎপাদন করে; আরও জানা গিয়াছে যে, মোথার গোড়ায় পুরাতন শিকড়ের উপরই নূতন শিকড় গজায়। শিকড় একটি পরিণত বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া মরিয়া যায়, সেজন্য মোথার গোড়ায় যে নূতন শিকড় বাহির হয় তাহাদিগকে বাড়িতে সাহায্য করিলে পুরাতন মৃত শিকড়ের স্থান তাহারা দখল করিতে পারে। কিন্তু যদি অস্থানিক শিকড়গুলি শূন্যে থাকিয়া যায় তাহা হইলে মৃত্তিকামধ্যে যে সমস্ত শিকড় মরিয়া যায় তাহাদের স্থান অপূর্ণই রহিয়া যায়। ফলে যে সামান্য পরিমাণে শিকড় বর্ত্তমান থাকে তাহাতেই গাছের পুষ্টি ও ফলপ্রদান করিতে হয়। সেজন্য গাছের তেজ ও ফলসংখ্যা কমিয়া যায়।

অনেক বিস্তৃত চাষ হইলে এরূপ ভাবে মৃত্তিকা চাপা দেওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তবে গৃহস্থঘরের ২।৩ ডজন গাছের গোড়ায়

এরূপ ভাবে মাটি দেওয়া অসম্ভব নহে। বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলিতে নারিকেলের ছোব্ড়া ও ডালপালা ঢাকা দিলেও মাটি চাপা দেওয়ার ফল পাওয়া যায় ও কার্য্য সমান হয়। অনেকের ধারণা গাছের গোড়ায় ছোব্ড়া প্রভৃতি জমাইলে পোকা লাগে, সে কথা সত্য নহে।

ফলের অবস্থাভেদে নারিকেল বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কচি অবস্থায় ইহাকে মুচি বলে, এসময় উহা কোন কাজে লাগে না, উপরন্তু এই সময় অনেক ফল ঝরিয়া পড়িয়া যায়। উহার পরের অবস্থাই ডাব। এই অবস্থায় ফলের ভিতর জল হয়, শাঁস জন্মে না এবং সে জল তেমন মিষ্ট হয় না, অল্প লবণাক্ত থাকে। ইহার পরের অবস্থায় ডাবের মধ্যে পাতলা হড়হড়ে শাঁস জন্মিতে আরম্ভ হয়। এই সময় উহাকে শাঁসে-জলে ডাব বলে। এই অবস্থায় ডাবের জল অত্যন্ত সুপেয় ও স্নিগ্ধ। ইহার পরের অবস্থাকে ঢুর্মা বা দোমালা বলে। এসময় হইতে শাঁস একটু কঠিন হইতে থাকে, তাহা হইলেও শাঁস খাইতে বেশ ভাল লাগে; কিন্তু এই সময় হইতে নারিকেলের জল অল্প ঝাল হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পরের অবস্থার নাম ঝুনা, এসময়ে শাঁস শক্ত হইয়া যায়। ঝুনা নারিকেলের জল ডাবের ন্যায় স্নিগ্ধ, সুপেয় ও উপকারক। প্রবাদ আছে, বক্তিয়ার খিল্‌জী তাঁহার সহচরগণকে বাংলা দেশ পর্য্যটন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। বাংলা দেশ পরিদর্শন করিয়া তাহারা যখন ফিরিয়া গেল তখন ব্যক্তিয়ার খিল্‌জী জিজ্ঞাসা

করিলেন, বাংলা কেমন দেখলে? তাহারা বলিল, "প্রভু! বাংলা দেশ খোদার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে দেশের লোকের জন্য খোদা এমন ফলগাছের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যে, একটি ফল কাটিলেই এক গেলাস শীতল পানীয় ও দুইখানি রুটী পাওয়া যায়।"

কথায় আছে "দাতার নারিকেল, বখিলের (কৃপণের) বাঁশ"; অর্থাৎ নারিকেল পাড়িয়া লইলে বেশী ফলন হয় এবং বাঁশ না কাটিলে অধিক জন্মে। গাছে ঝুনা নারিকেল অধিক জন্মিতে দিলে ফলন কম হয়, কিন্তু ডাব অবস্থায় উহা যতই পাড়িয়া লইতে পারা যায় তত অধিক ফলন পাওয়া যায়। নারিকেলের ফুল ধরিবার পর হইতে ফলের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে প্রায় এক বৎসর লাগে। নারিকেলকে ঝুনা করিয়া পোষণ করিতে বৃক্ষের অনেক শক্তি ব্যয় হইয়া যায়, সুতরাং অধিক ফলোৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হয়, কিন্তু ডাব অবস্থায় পাড়িয়া লইলে তাহার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, এজন্য অধিক সংখ্যক ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয়। নারিকেল গাছে ফল ধরিতে বিলম্ব হইলে অফলা গাছের কাণ্ডের ২।৩ স্থান কাটিয়া অল্প ছিদ্র করিয়া দিলে কিংবা নারিকেল গাছের অল্প সংখ্যক শিকড় কাটিয়া দিলে গাছের অধিক তেজ হ্রাস হইয়া ফল ধারণের ক্ষমতা জন্মে। কথায় বলে "গুয়ায় গোবর বাঁশে মাটি, অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি।"

নারিকেল গাছে মোচা (ফুলের কাঁদি) ধরিলেই প্রথম বৎসর তাহা কাটিয়া দিতে হয়। প্রথমাবস্থায় কয়েকবার এরূপ করিলেই ভবিষ্যতে ঐ গাছের ফলন অধিক হয়।

নারিকেলের প্রতি গাছ পিছু সবসময় নিম্নলিখিত মত সার প্রয়োজন হয় ঃ—

নাইট্রোজেন		২৫২ গ্রামিও অথবা	০'৫৫৪ পাউণ্ড
পটাশ	(K_2O)	৩২০ „ „	০·৭ „
ফস্ফরিক এ্যাসিড্	(P_2O_5)	৫৭ „ „	০'১২৫ „
ক্যালসিয়াম	(Cas)	৭৬ „ „	০'১৬৭ „
ম্যাগনেসিয়া	(Mgo)	৬২ „ „	০·১৩৬ „

নিম্নের তালিকাদ্বয় দেখিলে জানা যাইবে যে প্রতি বৎসর প্রতি গাছে যদি ১৬টা কাঁদি হয় ও প্রতি কাঁদিতে গড়ে ৮টা নারিকেল ফলে, তাহা হইলে প্রতি কাঁদিতে কত সার ব্যয় হয় ও প্রতি গাছে কত শক্তি ক্ষয় হয়। এইরূপ হিসাবে গাছে সার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

যদি গাছপ্রতি ১২৮টা নারিকেল ফলে তাহা হইলে নিম্নলিখিত রূপ সার প্রতি গাছের জন্য ব্যয় হয় ঃ—

	প্রতি কাঁদিতে ব্যয়	
	খোসা ও মালাই	জল ও শাঁস
নাইট্রোজেন	১৩৬০	৪১'২৪
পটাশ (K_2O)	২৫·৭৬	১৩'৪৪
ফস্ফরিক এ্যাসিড্ (P_2O_3)	১'৫৬	৬৩৮
লাইম (Cas)	৮'৪৮	০'২৮
ম্যাগনেসিয়া (Mgo)	৪·৭৭	২'২৮

প্রতি বৎসর ব্যয়

	খোসা ও মালাই		জল ও শাঁস	
	গ্রামিও	পাউণ্ড	গ্রামিও	পাউণ্ড
নাইট্রোজেন	২১৭৬	০ ৪৮	৬৫৯·৮	১·৪৫
পটাশ	৪১২·১৬	০·৯	২১৫ ০	০·৪৭
ফস্ফরিক এ্যাসিড্	২৪·৯৬	০·০৫৫	১০২·১৪	০·১২৫
লাইম	১৩৫·৬২	০·১৯	৪·৪৮	০·০১
ম্যাগনেসিয়া	৭৬·২৯	০·০৭	৩৬·৪৮	০০·৮

স্থানভেদে পৃথিবীর নানাস্থানে নানাজাতীয় নারিকেল জন্মে এবং উহার বর্ণ, আকার ও গঠনের বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। বাংলায় সাধারণতঃ ৬।৭ বৎসরে নারিকেল ফলে কিন্তু একজাতীয় নারিকেল গাছ আছে যাহার ৩।৪ বৎসরে ফল হয় এবং এই গাছ পূর্ণ বয়সেও ১৪।১৫ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। এই জাতিকে 'কিং কোকোনাট' বলে। এই ফলের বর্ণ হরিদ্রাভ পীত, ফল মধ্যমাকার ও জল সুপেয়।

দাক্ষিণাত্যের মালাবার ও করোমণ্ডল উপকূলে বামন নামক একজাতীয় নারিকেল দৃষ্ট হয়, উহার ফলও খুব শীঘ্র জন্মে এবং গাছও অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হয়। এই বামন নারিকেল আবার বর্ণভেদে শ্বেত ও রক্ত বর্ণের দৃষ্ট হয়। শ্বেতের পীতাভ এবং রক্তের মধ্যে রক্তাভ পীত দুই প্রকার ভেদ আছে। ইহাদের জল সুস্বাদু এবং ফল শস্য কোমল ও মধুর। এদেশে শ্বেতাভ

পীত বামন নারিকেল দৃষ্ট হয়, অনেকে তাহাকে গঙ্গাজলী নারিকেল বলিয়া অভিহিত করে। শ্বেতাভ পীত বামন নারিকেলের জন্মস্থান মালাবার উপকূল ; উহার জল সুমিষ্ট, ফল শস্য সুখাদ্য। এ জাতীয় নারিকেল গাছের গুঁড়ি সরু, পাতা ছোট এবং ফলও ছোট ; ইহা অল্প সময়ে ফলে, ফলের শাঁসও পুরু নহে ; বামন নারিকেল গাছ ৩০।৩৫ বৎসর স্থায়ী হয়। এ জাতীয় নারিকেল নানা আকারের ও রংএর হইয়া থাকে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে বৃহদাকারের নারিকেল জন্মিয়া থাকে ; ফল অনেকটা গোলাকার। ইহার ফল শস্য ও জল সুমিষ্ট। আন্দামান নারিকেলের ছোব্‌ড়া ও বহিরাবরণ অত্যন্ত পুরু এবং ফল বৃহৎ। নিকোবর দ্বীপে যে নারিকেল জন্মে তাহার ফল অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু ছোব্‌ড়া ও বহিরাবরণ পাতলা।

আমাদের বাংলা দেশে সাদা ও লাল বর্ণের নারিকেল দৃষ্ট হয়, উহা শর্ম্মা নারিকেল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার অনেক সদ্‌গুণ থাকায় কবিরাজী ঔষধেও প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

ডোয়ার্ফ, অর্ণামেণ্টাল, লার্জ্জহেড, গোগুেন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় সিলনী নারিকেল আছে। উহাদের জন্মস্থান সিংহল। দক্ষিণ ভারতে কানাড়া প্রদেশে একপ্রকার মধ্যমাকৃতি গোলাকার নারিকেল দৃষ্ট হয় ; গাছ ২১।২২ ফিট্‌ উচ্চ হয়, জল সুমিষ্ট।

হাজারি নারিকেলের ফল ক্ষুদ্র কিন্তু এক এক কাঁদিতে বহুসংখ্যক ফল জন্মে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে হাজারি নারিকেল জন্মে। একসঙ্গে বহু ফলন হয় বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

জাহাজি—ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নারিকেল, ফলের আকার অনেকটা গোল। অনেকে ইহাকে হারিয়া নারিকেল বলিয়া থাকে; জন্মস্থান চট্টগ্রাম। বাংলাদেশে নোয়াখালি, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় এইজাতীয় নারিকেল দেখিতে পাওয়া যায়। এক-একটী ফলের ওজন ৪।৫ সের পর্য্যন্ত হয়।

সিঙ্গাপুরী—জন্মস্থান সিঙ্গাপুর; ফল বৃহৎ, শস্যপূর্ণ, জল মধুর ও সুস্বাদু। এক একটী নারিকেল ওজনে জাহাজির ন্যায়।

রেঙ্গুন—জন্মস্থান ব্রহ্মদেশ; ফলের আকার বড়, জল ও শস্য সুমধুর ও সুস্বাদু।

এতদ্ব্যতীত মালডিভ, শিয়ামিস, কোচিন, মরিসাস প্রভৃতি আরও কয়েক জাতীয় মধ্যমাকৃতি উৎকৃষ্ট নারিকেল আছে।

নারিকেল গাছের কোন অংশ ফেলা যায় না। ইহার শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া ফুল, ফল, পাতা, গুঁড়ি, ছোব্ড়া, মালা প্রভৃতি সমস্ত অংশই কাজে লাগে। নারিকেলের রস হইতে খেজুর ও তালের তাড়ির ন্যায় একপ্রকার তাড়ি প্রস্তুত হয়। এই তাড়ি সিলোন প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত হয়। ঝুনা নারিকেলের শাঁস কুরিয়া বাটিয়া তাহা চিনির সহিত পাক করিয়া চন্দ্রপুলি, লাড্ডু, সন্দেশ, রসকরা, মনোহরা প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

নারিকেলের দুগ্ধ অনেকাংশে গো-দুগ্ধের ন্যায় উপকারী। নারিকেলের দুগ্ধ হইতে মাখন, উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজকাল পাশ্চাত্ত্যদেশে, বিশেষতঃ ফ্রান্স, জার্ম্মানীতে

গো-মহিষাদি দুগ্ধের মাখনের ন্যায় নারিকেলের দুগ্ধের মাখন রুটীর সহিত ব্যবহারের প্রচলন দৃষ্ট হয়।

নারিকেলের শস্য টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহা ঘানিতে বা কলে পিষিয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। নারিকেলের শুষ্ক শস্যকে কোপ্‌রা (Copra) বলা হয়। উহাতে শতকরা ৩৫ হইতে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত তৈল পদার্থ থাকে। সাধারণতঃ অধিক সুপক্ক অপেক্ষা ন্যূন পক্ক নারিকেল হইতে তৈলের ভাগ অধিক পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মহিলাগণ কেশে নারিকেল তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহীশূর ও মাদ্রাজ অঞ্চলে নারিকেল তৈল পাককার্য্যে ও জ্বালানী তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মোমবাতি ও সাবান প্রস্তুত কার্য্যে নারিকেল তৈলের আবশ্যক হয়।

নারিকেল শস্য (Copra) হইতে তৈলভাগ বাহির করিয়া লইলে যে সমস্ত ছিব্‌ড়া অবশিষ্ট থাকে তাহাকে নারিকেল খইল বলে, ইহা গবাদি পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং জমির উৎকৃষ্ট সার মধ্যে পরিগণিত।

নারিকেল বৃক্ষের সমস্ত অংশ জ্বালানির কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমাদের দেশে হিন্দুদের হবিষ্যান্ন পাক করিতে নারিকেল পাতা ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল বৃক্ষের সমস্ত অংশ জ্বালানির কার্য্যে ব্যবহৃত না করিয় উহারা প্রত্যেক অংশ দ্বারা বিবিধ মূল্যবান ও আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। শুষ্ক নারিকেল ছোব্‌ড়া (Coir) হইতে পাপোষ বা

রসি, দড়ি, কাছি, গদি প্রভৃতি এবং পরিষ্কৃত আঁশ দ্বারা নানাপ্রকার বুরুষ, ঝুড়ি, ব্যাগ, বস্তা, আসন, ঘোড়ার সাজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেল পত্রে মাদুর, পত্রশিরা দ্বারা ঝাঁটা, পরদা, ঝুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। নারিকেল মালা দ্বারা হুঁকা, বৈষ্ণবদের করঙ্ক, নস্যাধার, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের মালার দ্বারা বাটির অভাব পূরণ করা যাইতে পারে।

নারিকেল গাছে ফল জন্মিতে সাধারণতঃ ৬।৭ বৎসর সময় লাগে, সুতরাং এতদিন উহার জমি ফেলিয়া না রাখিয়া নারিকেল চারা রোপণ করিয়া উহার মধ্যে মধ্যে কলাগাছ বসাইতে পারিলে মন্দ হয় না। কলাগাছ বসাইলে মাটি সরস থাকে এবং ইহার ছায়ায় নারিকেল চারা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং কলাগাছ রোপণে একদিকে গাছের উপকার হয়, অপরদিকে কলা বিক্রয় দ্বারা একটী আয়ের পথ হয়। নারিকেল বাগানে আদা, আমাদা, হলুদ প্রভৃতি গাছও জন্মাইতে পারা যায়।

নারিকেল, তাল, খেজুর প্রভৃতি দীর্ঘস্কন্ধ তরুও পোকা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্ব হইতে প্রতিকার না করিলে গাছের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

গোবরে বা ভোমরা জাতীয় কয়েকপ্রকার পোকা নারিকেল গাছ ছিদ্র করিয়া ভূয়া করিয়া ফেলে। গোবরে পোকা ও স্ত্রী প্রজাপতি নারিকেল বৃক্ষের নিকটস্থ কোন আবর্জ্জনা মধ্যে বহু ডিম্ব প্রসব করে, ঐ ডিম্ব ফুটিয়া কীড়া বাহির হয়। প্রথম

অবস্থায় কীড়াগুলি চারা গাছের মূলদেশ আক্রমণ করে এবং উপরে উঠিয়া যায়। বড় গাছে ডিম্ব প্রসব করিলে কীড়াগুলি বর্দ্ধিত হইয়া নারিকেল গাছের কুঞ্চিত মাঝের পাতা ভক্ষণ করিতে করিতে নীচের দিকে চলিয়া যায় এবং কাণ্ডের কোমল অংশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে। উহারা যখন গাছের মাঝ পত্রের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে তখন ঐ ছিদ্রের মুখ দিয়া পরিত্যক্ত গুঁড়া বাহির হয়। এই গুঁড়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ভ্রমর বা গোবরে পোকা কর্ত্তৃক গাছ আক্রান্ত হইয়াছে। এজন্য নারিকেল গাছের ডাল সমেত মরা শুষ্কপত্র (যাহা নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে) মধ্যে মধ্যে নারিকেল পাড়িবার সময় কাটিয়া দেওয়া এবং নারিকেল বৃক্ষের গোড়া পরিষ্কার রাখা উচিত। ঔষধ প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে; ৮।৯ হাত গুঁড়ি বিশিষ্ট একটি গাছে দুই পয়সার আফিং গাছের গোড়ায় ছিদ্র করিয়া সকালে প্রয়োগ করা হয়, পরদিন প্রায় ৫০টী মৃত কীড়া পোকা গাছের নীচে পতিত ছিল। ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। এখন সেই গাছ পুনরায় তাজা হইয়া ফল প্রসব করিতেছে।

বড় হইয়া গোবরে পোকা ভ্রমরাবস্থায় রাত্রিকালে এ-গাছে ও-গাছে উড়িয়া বেড়ায়, এজন্য রাত্রিকালে আলোর ফাঁদে এই পোকা বেশ ধরা যায়। নারিকেল বাগানে মধ্যে মধ্যে রাত্রে আগুন জ্বালিয়া রাখিলে ইহারা আগুনে আসিয়া পুড়িয়া মরে, অথবা জমির মধ্যে মধ্যে লণ্ঠন ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহার নিম্নে বড় গামলায় কেরোসিন মিশ্রিত জল রাখিয়া দিতে হয়, ইহাতে

ভ্রমরগুলি আলোর চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ গামলাস্থ জলে পড়িয়া মরিয়া যায়। লাল ভোমরা জাতীয় পোকা গাছের ফাটলে বাসা করে। এইজাতীয় পোকা বাসা করিলেই উক্ত ফাটলের মুখ বেশ করিয়া গোবর মাটির প্রলেপ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এই পোকা যেখানে বাসা করে, সেই স্থান হইতে একপ্রকার উগ্র গন্ধ বহির্গত হয়। দাক্ষিণাত্যে মনসা-সিজের আটা দিয়া ফাটল বন্ধ করিয়া দেয়। এই পোকা গাছের বিশেষ অনিষ্টকারী।

গণ্ডারে পোকা নামে আর একটী পোকা আছে, ইহারাও নারিকেল গাছের শত্রু। ইহারা গোবরেই থাকে। ইহাদের মাথায় ছোট খড়্গ থাকে, এই জন্যই ইহাদের গণ্ডারে পোকা বলে। ইহারা গাছের মাথা ফুটো করিয়া দেয়, তাহাতে গাছ আস্তে আস্তে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়। শতকরা ·০১ ভাগ "B. H. C." জলে গুলিয়া সার গাদা স্তূপ ও অন্যান্য যে সব জায়গায় এই পোকা বংশবৃদ্ধি করে সেখানে ছিটাইয়া দিলেই উহারা আর বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না। ইহা ছিটানোর পরেও ধাড়ী পোকা-গুলি ডিম পাড়িতে পারে, কিন্তু একবার ঔষধ লাগাইলে প্রায় ছয়মাস পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যকরী থাকে, তাই ইহারা মরিয়া যায়।

আমাদের দেশে প্রতি বৎসর নারিকেল বৃক্ষের মাথা পরিষ্কার করিয়া দিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। গাছ ঝাড়াইবার বা ছাঁটিয়া দিবার প্রথা প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি

বৎসর বর্ষার পর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছের নীচের দিকের পুরাতন ও অতিরিক্ত ডালগুলি এবং মস্তকস্থ সমুদায় শুষ্ক ও অপরিষ্কার পদার্থ সমূহ ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। এই সমস্ত পদার্থগুলির প্রত্যেকটী দেশ-ভেদে গ্রাম্য ভাষায় নানা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গাছের মস্তকস্থ আবর্জ্জনা প্রতি বৎসর পরিষ্কার করিয়া দিলে ইন্দূর, কাঠ-বিড়ালী ও পক্ষী আদি বাসা বাঁধিয়া গাছে জোতসত্ব বসাইতে পারে না এবং গাছের মস্তক ও শাখাদি পরিষ্কার করায় গাছ বেশ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, ইহাতে গাছের ফলন বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করা হয়। সাধারণতঃ গাছের গা ঘেঁষিয়া ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে ডালগুলি ১-১॥ হাত রাখিয়া ছাঁটিয়া দিলে গাছ চোট পায় না ও শীতকালে সমস্ত ডাল আপনা হইতে খসিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে মাথায় উঠিয়া ডাল চিরিয়া ফাঁক করিয়া দিতে হয়।

উইপোকার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট চারা নারিকেল গাছের শিকড় কাটিয়া উহার বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে, ইহাতে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এরূপ কীটাক্রান্ত হইলে গাছের গোড়ার চারিপাশ একটু খুঁড়িয়া লবণ মিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রতি মণ জলে প্রায় ১ পোয়া পরিমাণে তুঁতে গলাইয়া সেই জল গাছে ব্যবহার করিলে উইপোকা পলাইয়া যায়। নিমের খোল অথবা নিম

পাতা বাটিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে উইপোকার উপদ্রব কম হয়।

নারিকেলের চারা রোপণ করিবার পর ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত উহারা ছাতাধরা রোগাক্রান্ত হয়। নারিকেল গাছের কাণ্ডে ও পত্রে দদ্রু রোগের ন্যায় একপ্রকার রোগ জন্মে। ইহার গায়ে চাকা চাকা দাগ হয়। ঐ স্থানে আল্‌কাতরা লাগাইয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়। হলুদ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। পটাসিয়াম পার্‌মাঙ্গানেট ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা বেশ করিয়া পৃথকভাবে গুঁড়াইয়া কেরোসিন তৈলের সহিত মিশাইয়া উহা কীটাক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ন্যাশপাতী (Pear)

কঙ্করময় পার্ব্বত্য মৃত্তিকায় ইহা ভাল জন্মে। ন্যাশপাতী শীত-প্রধান দেশের ফল। সমতল জমি অপেক্ষা উচ্চতম পার্ব্বত্য জমিতে ইহা সুফল প্রদান করে। বাংলার জলহাওয়ায় ইহা ভাল ফলিতে দেখা যায় না। যথেষ্ট পরিচর্য্যা ও যত্ন করা সত্ত্বেও বাংলায় ইহার ফল কাল্‌চে ও ফলের স্বাদ কষা হইতে দেখা গিয়াছে। যে মৃত্তিকায় আপেল ভাল জন্মে তথায় ন্যাশ-পাতী উত্তম জন্মিয়া থাকে। আপেলের জমি ইহার পক্ষে

উপযোগী হইলেও আপেল অপেক্ষা ন্যাশপাতী অল্প-উষ্ণ-প্রধান স্থানে জন্মিতে ভালবাসে। সমতল জমিতে চাষ করিতে হইলে সারযুক্ত হালকা বেলে দোআঁশ জমি আবশ্যক। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সাহারাণপুর, পেশোয়ার, সিমলা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর ন্যাশপাতী জন্মিতে দেখা যায়।

জমিতে ১৪।১৫ হাত অন্তর পৃথকভাবে ইহার গাছ লাগান উচিত। গাছ লাগাইবার পূর্ব্বে জমিতে দুই হাত গোলাকার ভাবে ও দুই হাত গভীর করিয়া এক-একটী গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গোবর, সামান্য খইল চূর্ণ, কিছু কাঠের ছাই ও অল্প পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত গর্ত্তে প্রয়োগ করিতে হয় এবং নিয়মিত সময়ে প্রতি গর্ত্তে একটী করিয়া চারা লাগাইতে হয়। সাধারণতঃ বর্ষাকালে কলম লাগান হয় কিন্তু পৌষ-মাঘ মাসেই ইহার কলম লাগান উচিত। যে কোন সময়েই গাছ লাগান হউক না কেন, গাছ লাগাইবার একমাস পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাখিতে হয়। গাছ ভাল ভাবে বসিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত একটু সাবধানে রক্ষা করিতে হয়।

বিলাতী ন্যাশপাতী সমতল স্থানে ভালভাবে জন্মাইতে পারা যায় না, পার্ব্বত্য স্থানেই ইহা ভাল জন্মে। সমতল জমিতে যে কয় জাতীয় ন্যাশপাতী জন্মিতে পারে তাহাদের মধ্যে চায়না, কেফার, স্মিথ, লি কন্টি, সিনসিনসিস্ উৎকৃষ্ট মধ্যে গণ্য। কলিকাতার ২।১টি বড় বড় বাগানে ন্যাশপাতী গাছ দৃষ্ট হয় কিন্তু ক্বচিৎ ফল হইতে দেখা যায়।

অনুর্ব্বর জমিতে ইহার চাষে সাফল্য লাভ করা যায় না এবং বাংলার মাটিতে সখ পরিতৃপ্তি ব্যতীত ন্যাশপাতী গাছ দ্বারা অন্য কিছুই সম্পন্ন হয় না। নিম্ন বঙ্গে ইহা ভাল না জন্মিলেও ভারতের অনেক স্থানে ন্যাশপাতী জন্মিয়া থাকে। চীনের ন্যাশপাতী ৬ বৎসরে ফল ধরে এবং ইহা সমতল স্থানে জন্মান চলে। সাধারণতঃ কলমের গাছ লাগাইবার পর ৬ বৎসরের মধ্যে ফুল ধরে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে ফল ধরে এবং জাতি বিশেষে আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে ইহা পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে, ন্যাশপাতী ফল গাছে পাকে না।

গাছে ফুল ধরিবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিতে হয়। এ সময়ে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ৭।৮ দিন ঐ অবস্থায় রাখিয়া পরে কিছু গোবর সার, খইল চূর্ণ ও হাড়ের গুঁড়া মাটির সহিত মিশাইয়া ঐ গর্ত্তে দিতে হয়। ইহাতে অল্পদিনের মধ্যে গাছে নূতন শাখা-পল্লব বহির্গত হইয়া উহা দ্বিগুণ তেজে বর্দ্ধিত হয়। গাছে ফলের ছোট ছোট গুটি দেখা দিলে প্রচুর জলসেচন করা দরকার। গ্রীষ্মের সময় ও শীতকালে গাছে জলসেচন ও আবশ্যক মত গোড়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার আর অন্য কোন পাট নাই।

নোনা

(Bullock's heart—Sweet Sop)

ইহার জন্মস্থান এশিয়া। আজকাল ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র ইহা জন্মিতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে যে কোন জমিতে ইহা জন্মান চলে; তবে দোআঁশ মাটিতে ইহা ভাল হয়। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। Cutting হইতেও চারা হয়। জমিতে ১৪।১৫ হাত অন্তর এক-একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়, পরে বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে এক একটী করিয়া চারা লাগান চলে। চারা প্রায় এক বৎসরের বড় হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে লাগাইতে পারা যায়। মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত গাছে জলসেচন করা ও গাছের গোড়া নিড়াইয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া দরকার। গাছ লাগাইবার পর ৫।৬ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গাছে ফুল হয় এবং মাঘ-ফাল্গুন মাসে ফল পাকে। ইহার পক্ক ফল বেশ মিষ্ট, কিন্তু আতার ন্যায় কোমল ও মোলায়েম নহে।

বিলাতী নোনা (Sour Sop)

ইহা অতি দ্রুত বর্দ্ধনশীল গাছ, প্রায় ১২।১৪ হাত দীর্ঘ হয়। ইহার জন্মস্থান আমেরিকা।

ভারতবর্ষে এই গাছের চারা সাধারণতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আসামের গৌহাটি অঞ্চলে এইজাতীয় গাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ফল আকারে খুব বড় হয়। আমেরিকার উষ্ণপ্রধান স্থান সমূহে ইহার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে। হাল্‌কা ও সারযুক্ত দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মান চলে। বর্ষাকালে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায়। ইহার ফল আকারে বড় কিন্তু অম্লরস বিশিষ্ট, এজন্য ইহার তাদৃশ আদর নাই। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ইহার ফল পাকিতে আরম্ভ হয় এবং ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত গাছে ফল থাকে।

নোড়

(Star Gooseberry)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। গাছ প্রায় ১২।১৪ হাত উচ্চ হইয়া থাকে।

ইহার ফলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বীজ থাকে, উহা হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায়। বর্ষাকালে বীজ হইতে অতি সহজেই চারা জন্মাইয়া থাকে। চারা একটু বড় হইলে জমিতে লাগাইতে পারা যায়। বাংলাদেশে যে কোন জমিতে ইহা ভাল জন্মে। বর্ষাকালে থোবা থোবা ফল হয়। ইহার ফল অম্লরস বিশিষ্ট। ইহা হইতে মুখরোচক আচার বা চাট্‌নি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পানিফল বা শিঙ্গারা

[Trapa (bispiuosa) bieornis]

স্থান বিশেষে ইহারা শিঙ্গারাফল, পানিফল বা জলফল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জলে জন্মে বলিয়াই ইহা পানিফল বা জলফল নামে অভিহিত হয়। ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান বলিয়া অনুমিত হয়। ইউরোপেও একজাতীয় পানিফল আছে তাহা আকারে দেশী পানিফল অপেক্ষা কিছু বড়। ইংরাজীতে ইহা cattrops ও water chestnut নামে পরিচিত। ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান হইলেও ইহা পৃথিবীর নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আফ্রিকার মেগিয়ার হ্রদ এবং চীন দেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে ; ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মধ্যভারত, আগ্রা, আসামের মণিপুর এবং বাংলায় মালদহ, দিনাজপুর, হুগলী প্রভৃতি জেলায় ইহা অল্প-বিস্তর জন্মাইতে দেখা যায়। তবে কাশ্মীরে ইহার যেরূপ বিস্তৃতভাবে চাষ হইয়া থাকে, অন্য কোথাও সেরূপ হয় না।

সাধারণতঃ সমস্ত শস্য বা ফল স্থলে চাষ হইয়া থাকে এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা চাষে অবহেলা প্রযুক্ত ও কীটাদির আক্রমণে উহা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ইহার সেরূপ ভয় নাই। ইহা জলজ উদ্ভিদ। জলে ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। এদেশে কত খাল, বিল, ডোবা, পুষ্করিণী, জলা প্রভৃতি

অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে কিন্তু তাহাতে একটু যত্নপূর্ব্বক পানিফলের চাষ করিলে যে একটা বিশেষ আয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। আজকাল যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহার চাষ নিবদ্ধ তাহাদিগকে খটিক বলে। কর্দ্দমবহুল বা পঙ্কিল জলাশয়ে ও যেখানে বারমাস জল থাকে এরূপ স্থানে পানিফলের চাষ করা চলে। পানিফলের পক্ক বীজ সংগ্রহ করিয়া ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অল্প জলযুক্ত জলাশয়ে পাঁকের মধ্যে পায়ের চাপে এক-একটি করিয়া সুস্পষ্ট বীজ পুঁতিতে হয়। প্রায় এক মাসের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। ৫।৬ ফিট্ জলের মধ্যেও ইহা জন্মে, তবে কম জলে ফলন বেশী পাওয়া যায়। বীজ অঙ্কুরিত হইবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই জলের উপরে গাছ দৃষ্ট হয়। পৌষ-মাঘ মাসে ইহার ফল সংগ্রহ করিবার সময় অতিরিক্ত বা ঘন গাছ উঠাইয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়। ইহার মূল হইতেই গাছ জন্মাইতে পারা যায়। এই গাছ খুব দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যেই জলাশয়ের সমস্ত স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

পানিফল কাঁচা খাওয়া হয় এবং ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে। শটি বা ক্যাশোয়ার পালো অপেক্ষা ইহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে বরং শ্রেষ্ঠ। পালো প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার উপরকার খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়, পরে পরিষ্কার জলে ইহা উত্তমরূপে ধুইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া উহা কোন পরিষ্কার নূতন কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়।

এইভাবে ছাঁকিলে সূক্ষ্ম চূর্ণ পাত্রান্তরে পতিত হইয়া কাপড়ের মধ্যে ছিব্‌ড়া অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। কোন প্রশস্ত জলপূর্ণ পাত্রে এই চূর্ণ পদার্থ প্রক্ষেপ করিলে উপরে একরূপ কালবর্ণের উদ্ভিদ্‌কণা ভাসিয়া উঠে এবং শ্বেতসার বা পালো পাত্র বা আধারে সঞ্চিত হয়। এই উদ্ভিদ্‌কণা জলপাত্র হইতে অপসারিত করিলেই পরিষ্কার পালো প্রস্তুত হইল। ব্যবসায় হিসাবে পালো করিতে হইলে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত করাই শ্রেয়ঃ।

ছোট লাল রঙের যে পোকা কুমড়া, শশা প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া অনিষ্ট করে, সেই রকমের একজাতীয় পোকা পানিফলের পাতা খায় ও পাতার উপরে হল্‌দে রঙের ক্ষুদ্রাকৃতি ডিম পাড়ে। ঐ ডিম হইতে কীট জন্মিয়া উহারাও কচি কচি পাতা খাইতে আরম্ভ করে। এই পোকা সংখ্যায় অধিক হইলে প্রায় সমস্ত পাতা খাইয়া বিশেষ অনিষ্ট করে। এজন্য প্রথমাবস্থায় সাবধান হইলে ইহারা অধিক বিস্তৃত হইতে পারে না। পাতার উপর হরিদ্রাবর্ণের পদার্থ দেখিলেই উহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়।

পানিয়ালা (Panyala)

এই গাছ প্রায় ১৫।২০ হাত দীর্ঘ হয়। ভারতের নানা-স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। গাছ কাঁটাযুক্ত, ফল ক্ষুদ্রাকৃতি এবং টক্। ইহা হইতে আচার, চাট্‌নি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহা যে কোন মৃত্তিকায় জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে ৮।১০ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি সার প্রয়োগ করিয়া বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে একটী চারা লাগাইতে হয়।

বর্ষাকালে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইতে হয়। ইহার ফেঁকড়ি বা দাবা-কলম হইতেও চারা জন্মাইতে পারা যায়। চারা গাছ এক বৎসরের বড় না হইলে উহা জমিতে বসান উচিত নয়। জমিতে আবশ্যক মত জলসেচন ও গাছের গোড়া নিড়াইয়া আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে ফুল ধরে এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

প্যাশান ফ্রুট (Passion Fruit)

ইহা বহুবর্ষজীবী লতা গাছ, জন্মস্থান ব্রেজিল (আমেরিকা)। ইহা প্যাসিফ্লোরার এক জাতি বিশেষ। ইহার ফল ক্ষুদ্রাকৃতি মুরগীর ডিমের ন্যায়। খাদ্য হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হালকা দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। এই গাছ লতানে, এজন্য ইহা প্রাচীরগাত্রে বা কোন গাছে বা জাফরিতে উঠাইয়া দিতে হয়। ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার গাছ জমিতে রাখা চলে, পরে পুনরায় নূতন গাছ লাগাইতে হয়। ইহার বীজ হইতে বর্ষাকালে চারা জন্মাইতে হয়। চারাগুলি ১০।১২ ইঞ্চি বড় হইলে জমিতে স্থায়ী ভাবে লাগাইতে পারা যায়। গাছ লাগাইবার পূর্ব্বে জমিতে গোময়াদি সার উত্তমরূপে মিশাইয়া মাটি কর্ষণ পূর্ব্বক জমির পাট সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। গাছ লাগাইবার পর জমিতে জলসেচন করিতে হয়। ইহা বৎসরে দুইবার ফল প্রদান করে, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে যে ফল পাকে উহাই প্রধান ফলন। বাংলাদেশে চেষ্টা করিলে ইহা জন্মাইতে পারা যায়।

পীচ (Peach)

ইহার জন্মস্থান চীনদেশ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সমতল এবং পার্ব্বত্য উভয় স্থানেই ইহা জন্মান চলে। বাংলা দেশে ইহার সেরূপ প্রচলন নাই কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এবং সাহারাণপুর অঞ্চলে ইহার যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে।

সারযুক্ত হালকা দোআঁশ জমি ইহার চাষের জন্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। জমিতে ১৪।১৫ হাত অন্তর লাইন দিয়া ঐরূপ ব্যবধানে দুই হাত গভীর ও আড়াই হাত গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। গাছ লাগাইবার পূর্ব্বেই এই কাজ সমাধা করিয়া রাখা উচিত। পরে পৌষ-মাঘ মাসে প্রতি গর্ত্তে এক একটি করিয়া চারা লাগাইতে হয়। বর্ষাকালেও ইহার চারা লাগান চলে।

ইহার বীজ হইতে এবং জোড়-কলম, চোক-কলম ও চোঙ-কলম দ্বারা চারা উৎপাদন করা চলে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বীজ হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায়। ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতে প্রায় ৫।৬ মাস সময় লাগে। চোঙ-কলম ও জোড়-কলম জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে প্রস্তুত করা চলে। কিন্তু জোড়-কলমের প্রচলন এদেশে দেখা যায় না। পীচের চারা প্রস্তুত করিয়া তাহার গায়ে চোক বসান হয়। এক বৎসরের চারাগাছে চোক-কলম করা চলে। কলম প্রস্তুত হইলে উহা সদ্য সদ্য জমিতে লাগান

উচিত নয়। ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোরে প্রস্তুত করিয়া তথায় কলমগুলি লাগাইতে হয়। কলমের গাছ দুই বৎসরের পুরাতন হইলে উহা জমিতে স্থায়ীভাবে লাগান চলে। চারা লাগাইবার পর গাছে জলসেচন করা দরকার ও মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় মাটি নিড়াইয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়।

কলম লাগাইবার পর ৪।৫ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। ফল ধরিবার কিছু পূর্ব্বে গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছের আকার, বৃদ্ধি, তেজ এবং ফলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ডাল ছাঁটা দরকার।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়ার শিকড়গুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—এরূপ ভাবে গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ২।৩ সপ্তাহকাল ফেলিয়া রাখিয়া গাছের শিকড়ে রৌদ্র বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হয়, পরে নিয়মিত গাছের ডাল ছাঁটিয়া গাছের গোড়ায় গোবর, খইল ও অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত সার মাটি প্রয়োগ করিতে হয়। গাছের পাতা ঝরিয়া গেলে এরূপ ভাবে ডাল ছাঁটিতে হয় যাহাতে গাছের কোন অনিষ্ট না হয়; গাছের পাতা ঝরিতে বিলম্ব হইলে অথবা না করিলে উহাদের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া ফেলিতে হয় এবং কার্ত্তিক হইতে পৌষ-মাঘ মাস পর্য্যন্ত জলসেচন বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রথমে গাছের রুগ্ন বা শুষ্ক ডালগুলি ছাঁটিয়া, পরে গাছের বৃদ্ধি অনুসারে এক-তৃতীয়াংশ ভাগ ছাঁটিতে পারা যায়। সমতল স্থানে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে এবং

পার্ব্বত্য অঞ্চলে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ডাল ছাঁটিতে পারা যায়। গাছের গোড়ায় নূতন মাটি প্রয়োগ করিবার পর প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে হয়।

মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে। অতিরিক্ত পাকিয়া গেলে ফলের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য সম্পূর্ণ পক্ক হইবার পূর্ব্বেই উহা সংগ্রহ করিতে হয়। পীচের বহু বিভিন্ন জাতি আছে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শীঘ্র পাকে আবার কতকগুলি বিলম্বে পাকে এবং কতকগুলি সমতল স্থানের ও কতকগুলি পার্ব্বত্য স্থানের উপযোগী।

পেয়ারা (Guava)

ইহার জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। এই গাছ প্রায় ২০।২৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। সমতল স্থানে ইহা ভাল হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে ক্বচিৎ ইহা জন্মিতে দেখা যায়।

বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর পেয়ারা গাছ দৃষ্ট হয়; কিন্তু কাশী, গয়া, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইহা যেরূপ উৎকৃষ্ট ও বড় হয়, এখানে সেরূপ হয় না। বাংলাদেশে যে কোন জমিতে ইহা জন্মান চলে। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে বর্ত্তমানে (commercial) হিসাবে পেয়ারা চাষ হইতেছে।

জমিতে ১২।১৪ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। পরে বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে এক একটী করিয়া চারা বা কলম লাগাইতে হয়। ইহার বীজ হইতে এবং গুল বা গুটি-কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত করা চলে। বাংলায় বীজের গাছে ফল বিলম্বে ধরে কিন্তু কলমের গাছে ২।৩ বৎসরে ফল ধরে। বর্ষাকালে গুটি-কলম বাঁধিয়া চারা প্রস্তুত করা সহজসাধ্য। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ইহার ফুল হয় এবং আষাঢ় মাস হইতে প্রায় ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত ফল পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ইহার আর এক দফা ফুল হয় এবং পৌষ-মাঘ মাসে ফল পাকে।

গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে পৌষ-মাঘ মাসে গাছের গোড়ার চারিদিক খুঁড়িয়া শিকড়ে রৌদ্র খাওয়াইয়া ৩।৫ দিন ঐ অবস্থায় রাখিবার পর মাটির সহিত সার মিশ্রিত করিয়া ঐ গর্ত্তে প্রয়োগ করিতে হয়। এ সময় গাছে প্রচুর জলসেচন করা দরকার।

ফলের ভিতরের বর্ণ অনুসারে ইহাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; যথা—সাদা ও লাল। লাল অপেক্ষা সাদা পেয়ারা অধিক মিষ্ট ও সুস্বাদু হয়। যে পেয়ারার দানা অল্প, খোসা পাতলা এবং শাঁস বেশী ও সুমিষ্ট—উহাই উৎকৃষ্ট।

পেয়ারার বহু বিভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে কাশী, এলাহাবাদ, ভবনগরী, কাফ্রী প্রভৃতি জাতিগুলি অধিক

প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত ক্যাটেলের, চীনের প্রভৃতি জাতি দৃষ্ট হয়, উহা দ্বারা জেলি, জ্যাম প্রস্তুত হয়।

ক্যাটেলের পেয়ারার গাত্র কাল রঙের, ইহার পাতা দেখিতে অনেকটা ক্যামেরিয়া ফুলের পাতার ন্যায়; ফল ছোট, ঈষৎ অম্লরস বিশিষ্ট ও ফলের গন্ধ অনেকটা ষ্ট্রবেরির মত।

পেঁপে (Papaya)

দক্ষিণ আমেরিকা অথবা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান। এখান হইতে ইহা সিংহল, সিঙ্গাপুর, পিনাং, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয় এবং এই সমস্ত স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে উহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে পেঁপে আকারে বড় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মহীশূর রাজ্যে ও আসামের গৌহাটি অঞ্চলে এবং চট্টগ্রামে যে পেঁপে জন্মে তাহা বেশ উল্লেখযোগ্য। ব্যাঙ্গালোর ও চট্টগ্রামের এক একটী পেঁপে নারিকেলের ন্যায় বৃহদাকার ও ওজনে প্রায় ৬।৭ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

ইহার বীজ রৌদ্রে না শুকাইয়া কোন শুষ্ক পাত্রের উপর রাখিয়া হাওয়ায় শুকাইয়া লইতে হয়। পেঁপের বোঁটার দিকের বীজে যে গাছ হয় তাহার অধিকাংশতেই ফল ধরে, কিন্তু ফলের

নিম্নাংশের বীজের অধিকাংশ পুরুষ গাছ জন্মে। ইহার বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত কম। সেজন্য খুব টাট্‌কা বীজ বপন না করিলে সুফল লাভ অনিশ্চিত হয়। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত পেঁপে বীজ বপন করিতে পারা যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে চারা উৎপন্ন করিলে সময়ে সুফল পাওয়া যায় এবং ফলনও শীঘ্র হয়।

সাধারণত পেঁপে গাছে পুং ও স্ত্রী এই দুই জাতীয় ফুল ধরিয়া থাকে, সুতরাং যতদিন না গাছ পুষ্পিত হয় ততদিন পুরুষ ও স্ত্রী গাছ ঠিক চিনিতে পারা যায় না। পুং গাছে দীর্ঘ কাঁদি নামিয়া থাকে এবং ইহাতে বহু পুষ্প জন্মে; পুষ্প অনেকটা স্বর্ণ যুঁই-এর ন্যায়। এই পুষ্পের পাপড়ী বেষ্টন করিয়া পরাগ কেশর অবস্থিত। কখনও কখনও যে পুং পুষ্প ধরে তাহাতেও ফল জন্মে, কিন্তু সে ফলের আকার তেমন বড় হয় না। কোন কোন পেঁপে গাছে একই বৃক্ষে স্ত্রী ও পুং উভয় জাতীয় ফুল জন্মে, আবার কোন কোন গাছে একই ফুলের মধ্যে পুং কেশর ও গর্ভাশয় উভয়ই বিদ্যমান থাকে। পেঁপে চাষ করিতে হইলে ইহার জমির মধ্যে একটী পুং জাতীয় গাছ প্রতি ২৫।৩০ স্ত্রী জাতীয় গাছের জন্য রাখা প্রয়োজন। জমিতে যদি কেবল স্ত্রী গাছ থাকে তাহা হইলে ফলে বীজ জন্মায় না ও পেঁপে হাল্‌কা হয়।

ফলগুলি স্থায়ী ও পরিপুষ্ট করিতে হইলে জমিতে পুং

জাতীয় গাছ রাখা আবশ্যক। পুং পুষ্প না থাকিলে স্ত্রী পুষ্পের গর্ভসঞ্চার ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। আবশ্যক হইলে কৃত্রিম উপায়ে পুং ও স্ত্রী কেশরের পরস্পর সংযোগে গর্ভসঞ্চার ক্রিয়া সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। পুং কেশরের অগ্রভাগে স্থালীর আকারের একপ্রকার পদার্থ আছে তাহার মধ্যে রেণু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ রেণু পরিপুষ্টাবস্থায় স্থালী বিদীর্ণ করিয়া বাহির হয়। পুং কেশরের অগ্রভাগে যেমন রেণু থাকে, স্ত্রী কেশরের অগ্রভাগেও সেইরূপ আটার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে। পুং কেশরস্থিত রেণু স্ত্রী কেশরাগ্রভাগ আনীত হইয়া সংযোজিত হইলে ঐ রেণু স্ত্রী কেশরে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। পরে ঐ রেণু হইতে সূত্রবহ নালী বহির্গত হইয়া স্ত্রী কেশর বিদীর্ণ করিয়া বীজকোষ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইলেই পুষ্পের গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চার ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই পুষ্পদল ও পুং কেশরগুলি খসিয়া পড়ে। স্ত্রী কেশর ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ফলের আকার ধারণ করে।

নাতি-উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলে পেঁপে গাছ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চট্টগ্রামে, আসামের গৌহাটী, রাঁচি, ডুমকা, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত স্থানে সুন্দর পেঁপে জন্মে। বীজ হইতে গাছ জন্মাইতে হইলে বড় ও উৎকৃষ্ট জাতীয় পেঁপের বীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক চাষ করা উচিত।

অল্প ছায়াযুক্ত স্থান বীজতলার জন্য মনোনীত করা আবশ্যক, কারণ অঙ্কুরিত ক্ষুদ্র চারাগুলি প্রখর রৌদ্রের তেজ সহ্য করিতে

পারে না। যে স্থানে বীজতলা প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই স্থানের মাটি ধূলার ন্যায় নরম ও ঝুরা করিতে হইবে। পরে খড় লতা পাতাদি পচা সার, ছাই. গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। বীজতলা প্রস্তুত হইলে বীজগুলি ছাড়ছাড়ভাবে ছড়াইয়া বপন করিতে পারা যায়। বীজগুলি মাটির উপর জাগিয়া থাকিলে পিপীলিকাদি কীটপতঙ্গ, ও পক্ষীরা উহা খাইয়া ফেলে এবং চারাগুলি জন্মিলে লম্বা হইয়া উঠে। এজন্য বীজ ছড়াইবার পর বীজের আকার অনুযায়ী উঁচু করিয়া মাটি চাপা দিয়া পরে একখণ্ড সমতল তক্তা দ্বারা মাটি অল্প চাপিয়া দিতে হইবে। এই সময়ে বীজতলায় অল্প অল্প জলসেচন করা আবশ্যক। জলসেচন কালে বীজতলার নরম মাটি চাপিয়া যাইবার সম্ভাবনা, ইহাতে চারা জন্মিবার ব্যাঘাত ঘটে; সুতরাং বীজতলার উপর সামান্য পুরু করিয়া পলখড় বিস্তৃত করিয়া ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত ঝারির সাহায্যে জলসেচন করা যুক্তিসঙ্গত। এই প্রণালী দ্বারা আর একটি কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয় যে, খড়ের গরমে এবং জল পাইয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোৎপাদন হয়। এ সময় আর খড় চাপা দিয়া রাখিবার আবশ্যক করে না।

চারাগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি আন্দাজ বড় হইলে বীজতলা হইতে নাড়াইয়া হাপোরে রোপণ করিতে পারা যায়। ইহাতে চারাগুলি তেজাল ও শীঘ্র বর্দ্ধনশীল হয়। বীজতলা হইতে চারা তুলিবার সময় গোড়ার মাটি সমেত চারা উঠাইতে হয়। হাপোরের মাটিও বীজতলার মাটির ন্যায় নরম ঝুরা হওয়া

আবশ্যক। চারাগুলি হাপোরে রোপণ করিবার সময় গাছের উপরিভাগের ডগা সমেত কচি পাতাগুলি বাছাই রাখিয়া নিম্নের পাতাগুলি কাটিয়া দিতে পারা যায়। হাপোরে চারাগুলি আধ হাত অন্তর বসাইতে হয়। আবশ্যক মত অল্প অল্প জল-সেচন করিতে পারিলে ভাল হয়। প্রখর রৌদ্রের সময় ইহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা এবং রৌদ্রের তেজ কমিলে আবরণ খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। চারাগুলি ৯-১০ অঙ্গুলি বড় হইলে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের মধ্যে উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট জমিতে স্থায়ীভাবে ৬।৭ হাত অন্তর অন্তর পৃথকভাবে লাইন দিয়া রোপণ করা আবশ্যক। ইতিমধ্যে ২´×২´×২´ গর্ত্ত করিয়া কিছুদিন রৌদ্র লাগাইয়া ২ ঝুড়ি গোবর সার, ১ মুঠা চূণ ও সাধারণ মাটি মিশাইয়া গর্ত্ত ভরাট রাখিতে হইবে, চারা রোপণ কার্য্য অপরাহ্ণ কালেই সম্পাদন করা বিধেয়। যেদিন চারা তুলিতে হইবে সেই দিন প্রাতঃকালে অথবা পূর্ব্বদিন বৈকালে হাপোরে উত্তমরূপে জলসেচন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে গাছের গোড়ার মাটি নরম ও ভিজা থাকে এবং শিকড় সমেত উহাদিগকে উঠাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

পেঁপের জমি ঈষৎ উচ্চ ও ঢালু হইলে ভাল হয়। বর্ষার জল যাহাতে ইহার জমিতে মোটেই দাঁড়াইতে না পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। জমি সমতল হইলে ড্রেন বা নালা রাখিতে হয়; দোআঁশ, বেলে অথবা লাল মাটি ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

গাছের গোড়ায় হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে ফল মিষ্ট ও বড় হয়। জমিতে চারা রোপণের পর ৫।৬ মাসের মধ্যেই গাছে ফুল ও ফল ধরে। ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত পেঁপে গাছের ফল উৎপাদনের ক্ষমতা প্রবল থাকে এবং ফল উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু ৩।৪ বৎসর পর উহা নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই গাছে প্রায় বার মাস ফুল ও ফল ধরে। সাধারণ বেলে দোআঁশ জমিতে চাষ হওয়ায় ইহার সারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেজন্য বাড়ীর আবর্জ্জনা, ছাই, গোবর প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণভাবে পেঁপে বাগানে অন্যান্য ফসল জন্মান চলে, তাহাতে জমিতে আগাছা হয় না। পেঁপে অন্যান্য ফলবাগানের মধ্যেও করা যায়। বিঘা প্রতি ৫ তোলা বীজ লাগে।

গাছে অধিক শাখা জন্মিলে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। গাছ সাধারণতঃ পত্র বৃদ্ধির সহায়তা করে, সুতরাং গাছে অধিক পাতা থাকিলে ফল বড় হইতে পারে না। পেঁপে গাছে কাণ্ডের উপরিভাগে পত্রগুচ্ছের মধ্যে ফল জন্মে। এক একটী গাছে শতাধিক ফল ধরে। ফলগুলি ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায় বৃদ্ধির পথে অন্তরায় ঘটে, এজন্য গাছে কতকগুলি সুপুষ্ট ফল রাখিয়া মধ্য হইতে কিছু কিছু ফল ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। ইহাতে ফলগুলি অধিক বড় হইবার সুবিধা পায়। ফলগুলি পরিপক্ক অবস্থায় পক্ষাদির হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য চট বা থোলের দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে।

বীজ অঙ্কুরিত হইলে চারাগুলির ক্ষুদ্রাবস্থায় একপ্রকার

লাল রঙের পিঁপড়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ গাছের গোড়া কাটিয়া দেয় ও পাতা খাইয়া ফেলে। এই সমস্ত কীটাদির উপদ্রব নিবারণের জন্য ঘুঁটের ছাই বা কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া উক্ত গুঁড়া ছাই কীটগ্রস্ত গাছে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পেঁপে কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই খাওয়া হয়, বাজারে কাঁচা পেঁপের চাহিদাও নিতান্ত অল্প নয়। কাঁচা পেঁপে হইতে অনেক উৎকৃষ্ট তরকারী ও মুখরোচক চাট্‌নি, আচার, জাম, জেলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পাকা পেঁপে এক একটী ছোট বড় হিসাবে এক আনা হইতে আট আনা দরে বিক্রয় হয়। এক একটী গাছে ১৪।১৫টী ফল রাখিলে উহা খুব বড় হয়। এক বিঘা জমিতে সমচতুর্ভুজ অনুসারে প্রায় ১৭০টী গাছ লাগান যায়। তাহা হইলে ১৭০টী গাছে ১৪টী হিসাবে ফল ধরিলে মোট ২৩৮০টী বড় আকারের ফল পাওয়া যায়। এক একটী ফল ।০ আনা হিসাবে ধরিলেও ৫৯৫৲ টাকা পাওয়া যায়। পেঁপের জমিতে গাছের মধ্যে আদা, হলুদ প্রভৃতি গাছ লাগান চলে। ইহার মূল্য হইতে খরচা উঠিয়া যায়।

পেঁপে যে কেবল আহারার্থেই আমাদের উপকারে লাগে তাহা নয়। অনেক রোগে ঔষধ হিসাবেও ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। কাঁচা পেঁপের বোঁটা ও গাত্র হইতে একপ্রকার শ্বেতাভ পদার্থ নির্গত হয় তাহা আমাদের বহু উপকারে আসে। এই শ্বেতরস মাংসে মাখাইয়া সিদ্ধ করিলে অল্পায়াসে শীঘ্রই মাংস সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগীকে এই আটা ২।১ গ্রেণ

আহারের পর চিনি কিংবা দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কাঁচা পেঁপের আটা ১।৩ ফোঁটা পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম রোগের উপশম হয় অথবা ছোট চামচের এক চামচ শুকনা আটার সহিত সেই পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন তিনবার করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে প্লীহা সারিয়া যায়। কাঁচা পেঁপের আটা অতিসার ও ডিপথিরিয়ার পক্ষে উপকারী। আঁচিল, ব্রণ, জিহ্বাক্ষত প্রভৃতিতে কাঁচা পেঁপের আটা লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কৃমি রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে Pepsin নামক একপ্রকার ঔষধের উল্লেখ আছে যাহা সদ্যহত শূকরের যকৃৎ হইতে প্রস্তুত হয়। আজকাল Papain নামক একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা Pepsinএর সমগুণ বিশিষ্ট। ধর্ম্মগত আপত্তি থাকায় যাঁহারা Pepsin ব্যবহার করিতে চান না তাঁহাদের Papain ব্যবহারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এই Papain কাঁচা পেঁপের আটা ছাড়া আর কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশুদ্ধভাবে কাঁচা পেঁপের আটা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন Papain কোন কোন শিল্পের কাজে লাগিতেছে। Papain এর ব্যবহারের যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে ফল হিসাবে পেঁপে ও Papainএর সহিত লাভ লোকসানের হিসাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিবে।

ফলসা (Grewia asiatica)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। হিমালয়ের পশ্চিম প্রদেশে পাঞ্জাব অঞ্চলে এবং ডেরাডুন, রোহিলখন্দ, বুন্দেলখন্দ প্রভৃতি স্থানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার ফল অতিশয় ক্ষুদ্র, অধিকন্তু ইহার শাঁস অল্প এবং বীজ ফলের তুলনায় বড়।

ইহার গাছ ১০।১৫ হাত দীর্ঘ হয়। বাংলাদেশে যে কোন জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। জমিতে দেড় হাত গোলাকার ভাবে এক একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। বর্ষাকালে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া চারাগুলি এক বৎসরের বড় হইলে প্রতি গর্ত্তে একটি করিয়া লাগাইতে হয়। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাছে ফুল হয় এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল পাকে ; ৭।৮ বৎসরে গাছে ফল ধরে। ফলের স্বাদ অম্ল-মধুর। ইহার ফল ক্ষুদ্র এবং বীজ বড় বলিয়া আদর নাই। ফলে সরবৎ হয়।

ফিগ (Fig) ডুমুর

ইহার আদি জন্মস্থান তুরস্ক ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ প্রদেশ সমূহ। কাশ্মীর, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি স্থানে ইহার সমধিক চাষ দৃষ্ট হয়। সমতলস্থানে এবং পার্ব্বত্য জমিতেও ইহা জন্মাইতে পারা যায়।

সারযুক্ত বেলে দোআঁশ জমিতে ও আদ্র‍্যযুক্ত স্থানে ইহা উত্তম জন্মে। জমিতে ১৫।১৬ হাত অন্তর ব্যবধানে ইহার গাছ লাগান দরকার। ২ হাত গভীর ও ২ হাত গোলাকারভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে খইল, গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা ও অল্প হাড়ের গুঁড়া মাটির সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। পরে প্রতি গর্ত্তের মধ্যস্থলে এক একটি করিয়া চারা লাগাইতে হয়। বর্ষাকালই চারা লাগাইবার উপযুক্ত সময়। শীতকালেও চারা লাগাইতে পারা যায়। গাছ লাগাইবার অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে জমির পাট সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। নিম্ন বা জলা জমিতে ইহা জন্মান চলে না।

বীজ, শাখা-কলম, দাবা-কলম প্রভৃতি হইতে ইহার গাছ জন্মান চলে। শাখা-কলমে মাঘ-ফাল্গুন মাসে এবং বীজ ও দাবা-কলম হইতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারা উঠাইতে হয়। চারা দুই বৎসরের বড় হইলে জমিতে লাগাইতে পারা যায়। গাছ বসাইবার পর ৩ বৎসরের মধ্যে ইহাতে ফল ধরে।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছের গোড়ার চারিদিক খুঁড়িয়া কিছুদিন রৌদ্র লাগাইয়া উহার ডাল ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং কিছু পচা গোবর সার ও অস্থিচূর্ণ মাটির সহিত মিশাইয়া গাছের গর্ত্ত পূরণ করিয়া দিতে হয়। গাছের আবশ্যক অনুযায়ী পরিমিত ভাবে জল দেওয়া দরকার। ফল পক্ক হইবার সময় জল প্রদান করা বিশেষ অহিতকর। ইহাতে ফল নষ্ট হয় এবং ফলের আস্বাদ বিকৃত হইয়া থাকে।

ফিগের কয়েকটি জাতি আছে, তন্মধ্যে সিলেশ্চিয়াল (Celestial), ব্রাউন টার্কি (Brown Turkey), আডাম (Adam), ব্ল্যাক ইসচিয়া (Black Ischia) উৎকৃষ্ট জাতি। চেরিস, ব্যাঙ্গালোর, লক্ষ্ণৌ, কাবুল প্রভৃতি কয়েকটি দেশী জাতীয় ফিগও মন্দ নহে।

ফুটি (Melon)

ইহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ্, জমির উপর লতাইয়া ফল প্রসব করে। নদীর চর বা বেলে জমিতে ফুটি ভাল জন্মে। এঁটেল জমিতেও ইহা লাগান চলে। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারী ও পক্ক অবস্থায় ফল হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জমিতে ৩।৪ হাত অন্তর এক একটী মাদা করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৭।৮ তোলা বীজ লাগে। গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

ইঁচ

(Flacourtia romonclid)

ইহার গাছ ৩।৪ হাত দীর্ঘ ঝোপ বিশিষ্ট হয়। ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। বাংলাদেশে অনেক স্থানে ইহা বন্য ভাবে

জন্মিয়া থাকে। ইহার ফল ক্ষুদ্র এবং ছোট ছোট বীজে পূর্ণ। পাকিলে ইহার ফল মিষ্ট এবং উহার বর্ণ কৃষ্ণাভ হয়। ফলের বাগানে ইহার স্থান পাইবার উপযোগী নয়। জমির ধারে ধারে ইহা লাগাইতে পারা যায় ; কারণ এই গাছের গায়ে কাঁটা থাকায় বেড়া দিবার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহার ফল পাকে। ফল্‌সার ন্যায় উহার সরবৎ করিতে পারা যায়। যত্ন ও পরিচর্য্যা করিলে ইহার কিছু উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। ইহা সর্ব্বপ্রকার জমিতেই জন্মিয়া থাকে। বীজ হইতে চারা জন্মে।

বাতাবী লেবু (Pumelo)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। পার্ব্বত্য ও অতিরিক্ত বেলে জমি ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সমস্ত মাটিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ রসা এঁটেল মাটিতে গাছ খুব ভাল হয়।

ইহার শাঁসের বর্ণ ও আকার ভেদে কয়েক প্রকারের দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ইহার বর্ণ—সাদা, গোলাপী, ফিকে লাল, লাল এবং আকার গোল, ঈষৎ চ্যাপ্টা, কলমে ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কতকগুলির খোসা পুরু, আবার কতকগুলির খোসা পাতলা ও মোলায়েম তাহারাই উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া গণ্য।

কাঁচা অবস্থায় উপরকার গাত্রের বর্ণ ঘন সবুজ থাকে এবং সুপক্ক অবস্থার হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গুল-কলম, দাবা-কলম, চোক-কলম প্রভৃতি দ্বারা ইহার গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ গুল-কলম দ্বারা চারা উৎপাদনের প্রথা অধিক প্রচলিত। বীজ হইতেও চারা জন্মান চলে, কিন্তু বীজের গাছ অপেক্ষা কলমের গাছ শীঘ্র ফলে এবং কলমের গাছের ফল বীজের গাছ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বীজের গাছের ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। লিচুর যে ভাবে গুটি বা গুল-কলম প্রস্তুত করা হয় ইহারও সেইভাবে কলম প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সারযুক্ত দোআঁশ অথবা এঁটেল মৃত্তিকায় ইহা ভাল জন্মে। জমিতে ১৩।১৪ হাত অন্তর ইহাদের চারা বা কলম লাগাইতে হয়। জমি প্রস্তুত করিবার সময় বিঘা প্রতি ২০।২৫ সের চুণ প্রয়োগ করিয়া উহা মাটির সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া লইতে হয়। পরে ১০।১২ হাত অন্তর লাইন দিয়া দেড় হাত গভীর এবং দুই হাত পরিধি বিশিষ্ট এক একটি গর্ত্ত করিয়া গোবর ও গোয়ালের পচা আবর্জ্জনা—১ ঝুড়ি, কাঠের ছাই—৫ সের ও অস্থিচূর্ণ—/১॥ সের মাটির সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। বর্ষাকালে ইহার গাছ লাগাইতে হয়। কলমের গাছ ৩।৪ বৎসরে ফল ধারণের উপযোগী হইয়া থাকে এবং উহা ৩০।৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ফল প্রদান করে। সাধারণতঃ মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল ধরে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে।

কোন কোন বাতাবী লেবু বৎসরে দুইবারও ফলিতে দেখা যায়। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কিছুদিন রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইয়া গোড়ায় সার প্রয়োগ করা উচিত। গাছ পুষ্পিত হইবার পর ফলের গুটি দেখা দিলে জলসেচন এবং গাছের ফলন শেষ হইলে ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার। ইহার চাষে বিশেষ কোন পরিচর্য্যার আবশ্যক করে না এবং এই গাছ খুব কমই রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। বাতাবী লেবুর ফুল শুভ্র এবং অতি সুগন্ধযুক্ত। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অন্য ফুল বড় একটা পাওয়া যায় না, এজন্য তখন বাতাবী লেবুর ফুল বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। সাহেবেরাও এই ফুল বিশেষ পছন্দ করেন।

বাতাবী লেবু আকারে বেশ বড় হইয়া থাকে। ইহার রস বিশেষ উপকারী, বাতাবী লেবুর রস পানে যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি হয়। এজন্য ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। এক একটি লেবু আকার অনুযায়ী * /০ আনা হইতে ৵০ আনা মূল্যেও বিক্রয় হইয়া থাকে, যত্ন ও পরিচর্য্যা করিলে এক একটি গাছ হইতে ১০০।১৫০ পর্য্যন্ত বড় আকারের লেবু পাওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে ৩৪।৩৫টী বাতাবী লেবু গাছ লাগান চলে, তাহা হইলে এক বিঘা জমি হইতে শতকরা ৬।০ দরে প্রায় ৩১৮৲ টাকা পাওয়া যায়। খরচ বাবদ ৭০৲ টাকা বাদ দিলে প্রায় ২৪৮৲ টাকা লাভ থাকে।

---

* যুদ্ধ পূর্ব্বোল্লিখিত দর।

বাদাম কাশ্মিরী

(Kashmir Almond)

ইহার আদি জন্মস্থান উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনর। পীচ গাছের ন্যায় ইহা ১৫।১৬ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। উষ্ণ-প্রধান স্থানে ইহা ভাল জন্মে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, কাশ্মীর, আফগানিস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ইহা অতি সহজে জন্মে। সারযুক্ত দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়।

জমিতে দেড় হাত গভীর ও ততোধিক গোলাকার ভাবে এক একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে গোময়াদি আবর্জ্জনা প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয় পরে উপযুক্ত সময়ে প্রতি গর্ত্তে এক একটী চারা লাগাইতে হয়। জমিতে ১৫।১৬ হাত অন্তর ইহার চারা লাগাইতে পারা যায়। শীত ও বর্ষা উভয় ঋতুতেই চারা লাগান চলে। বীজ হইতে এবং জোড় ও চোক-কলমে ইহার গাছ প্রস্তুত করা চলে। পৌষ-মাঘ মাসে বীজ হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায়। বীজ হইতে গাছ জন্মিতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগে। জোড়-কলমে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে চারা প্রস্তুত করা যায়। পীচ, আলুচা বা আলুবখরার সহিত ইহার জোড় বাঁধা চলে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল হয় এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে।

এই বাদামের দুইটি জাতি আছে একটি মিষ্টযুক্ত এবং অন্যটি

অল্প তিক্ত আস্বাদ যুক্ত। মিষ্ট জাতির মধ্যে আবার দুইটি পৃথক জাতি দৃষ্ট হয়, একটীর খোলা পুরু এবং অন্যটীর খোলা পাতলা। সমতল স্থানে ফসল কম হয়। পার্ব্বত্য স্থানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ফলিয়া থাকে। বীজের গাছে ফল ধরিতে প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগে।

বাদাম দেশী (India Almond)

ইহা ৩৫।৩৬ হাত দীর্ঘ হয় ও বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া পার্শ্বদেশে প্রসারিত হয়। ইহার জন্মস্থান মালয়। বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র ইহা জন্মাইতে পারা যায়। অযত্নে রক্ষিত ভাবে ইহা অনেকস্থানে জন্মিতে দেখা যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। বীজের গাছ ৪।৫ বৎসরে ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। দেশী বাদাম বৎসরে দুইবার ফল ধারণ করে; একবার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয়বারে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। ফল ধরিবার পর ইহার পাতা ঝরিয়া পড়ে। ইহার জন্য বিশেষ কোন পরিচর্য্যার আবশ্যক হয় না।

বাদাম কাজু বা হিজ্‌লী

(Cashew Nut)

কাজু বা হিজ্‌লী আমাদের দেশে উৎপন্ন না হইলেও ইহা একটি সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীনে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্মে। বাংলাদেশের খুব অল্প স্থানেই ইহার চাষ হইয়া থাকে। আমরা যদি ইহার চাষের জন্য যত্নবান হই তাহা হইলে ইহার দ্বারা লাভবান হইতে পারি। আমাদের এই বাংলাদেশে হিজ্‌লী বাদাম এত অল্প পরিমাণে জন্মায় যে অনেকেই ইহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। বাংলাদেশের মধ্যে দু' একটী স্থানে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম জেলায় ইহা অধিক পরিমাণে জন্মায়। ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে এই বাদাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্মায়।

হিজ্‌লী প্রদেশে হয় বলিয়া ইহার নাম হিজ্‌লী বাদাম। বেলে মাটিতে ইহা অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। উহার একটী বৈজ্ঞানিক নাম আছে সেটীর নাম 'Anacardium occidental' Cashew বাংলায় ইহার নাম কাজু বা হিজ্‌লী। ইহার বীজ প্রথমে বিদেশ হইতেই এদেশে আসে। ইহা এদেশের প্রাচীন ফল নয়। প্রথমে পর্ত্তুগীজগণ ইহার চাষ করে গোয়া অঞ্চলে। তাহার পর ক্রমশঃ ইহার চাষ এদেশে আসে ও সহজেই উহার চাষপ্রণালী বিবৃত হয়। ইহার গাছ রোপণ করিবার পর ইহার জন্য বেগ পাইতে হয় না।

ইহার বীজ বপন করিবার প্রধান সময় হইতেছে বর্ষার প্রারম্ভ-কাল। ঐ সময় ইহার বীজ বপন করিয়া সহজেই উহার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। ইহার ফলটি কিন্তু এক অদ্ভুত রকমের। কারণ, ফলের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া একটি বীজ বাহির হয় এবং তাহা বহিরাবরণেই থাকে। ইহাই ইহার উৎকৃষ্ট বীজ।

হিজ্‌লী বাদামের গাছের জন্য বিশেষ বৃষ্টির আবশ্যক নাই কারণ অধিক বৃষ্টিতে ইহার উপকারও হয় আবার বৃষ্টি না হইলে উহার কোনরূপ অপকার নাই। সেইরূপ হিজ্‌লী বাদামের পত্রে ও বৃক্ষের দেহে একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ লাগিয়া থাকে যাহার জন্য গাছের চারা অবস্থায় কোনরূপ ক্ষতি হয় না; সুতরাং ইহা নির্ভয়ে চাষ করা যাইতে পারে। ইহার গাছ ২০।২২ হাত লম্বা হয়। আমের সহিত এই বাদামের তুলনা করা যাইতে পারে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে উহা পাকিয়া থাকে এবং নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। ফলগুলির দৈর্ঘ্য ৪।৫ ইঞ্চি এবং বাহিরে যে অংশ থাকে তাহার পরিমাণ ১ ইঞ্চি (অর্থাৎ বীজটীর পরিমাণ)। বাদামগুলি পাকিবার সময় উহা নানারূপ বর্ণে মন আমোদিত করিয়া তুলে। কোনটী লালরঙ্গের হয়, কোনটী পীতবর্ণের হয়, কোনটী মিশ্রিত বর্ণ হইয়া উঠে। যাহা হউক, সে সময় ইহার বর্ণ মনোমুগ্ধকারক। তবে একটি কথা—উহার উপরের অংশ তৈলাক্ত বলিয়া উহা কটু, তিক্ত ও কষায়। উহার দ্বারা মনে হয় যে যদি কোন প্রকারে উহার ঐ অংশের প্রতিকার করা যায় তাহা হইলে

আমাদের একটি মূল্যবান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই ফল পক্ক অবস্থায় দুই দিনের বেশী রাখিয়া দিলে পচিয়া উঠে। কিন্তু আসল খাদ্য উহার বীজটী (যাহা ফলের বাহিরে থাকে) এক অদ্ভুত প্রকারের। কারণ, এমন ফল আর আছে বলিয়া মনে হয় না। বীজটীতে এত তৈলাক্ত পদার্থ থাকে যে, উহাও কাঁচা অবস্থায় স্বাদে কষায় ও আহার করিলে গলা যেন একটু চুলকাইতে থাকে কিন্তু কষায় দোষ ব্যতীত উহার আর কোন দোষ নাই। সেই কারণেই উহার বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে উহা ভাজিয়া খাওয়া উচিত। কাঁঠালবীচির ন্যায় উহা ভাজিতে হয় এবং সেই ভাজা অবস্থায় উহার স্বাদ অতি চমৎকার। উহার বীচিও অতি চমৎকার। যাহাতে উহার বীচি হইতে আমরা সহজে বীজ পাই তাহার ব্যবস্থা করা উচিত অর্থাৎ উহার চাষ অধিক পরিমাণে করা দরকার।

উহার বীজ হইতে আমরা কয়েকটী জিনিষ পাই—তৈল, শাঁস ও খোলা।

প্রথমে বীজগুলি খোলাশুদ্ধ লইয়া একটী মাটির পাত্রে করিয়া কিছুক্ষণ জ্বাল দিবার পর উহা হইতে একপ্রকার তৈল নির্গত হয়, তাহা আমাদের পরম উপকারী, কারণ ঐ তৈল লইয়া কড়ি, বরগা প্রভৃতিতে লাগাইলে আলকাতরার ন্যায় কাজ করে।

বীজের ভিতরে শাঁস থাকে। তাহার ভিতরে যে সাদা

পদার্থটী থাকে তাহার সাহায্যেও উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সে তৈল আমরা রন্ধনকার্য্যেও ব্যবহার করিতে পারি এবং উহার শাঁস তৈল দিয়া ভাজিয়া খাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য রূপে পরিগণিত হয়। যাহা হউক, এই বাদামের চাষ করিয়াও লাভবান হওয়া যায়। এই উৎকৃষ্ট জিনিষটীর সাহায্যে আমরা মুখ বদলাইতে পারি।

বিলম্বী

(Averrhoa bilimbi)

ইহার আদি জন্মস্থান মালাক্কাস দ্বীপপুঞ্জ। পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও দাক্ষিণাত্যে ইহার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে। এই গাছ প্রায় ১৮।২০ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

ইহা উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য স্থান ব্যতীত অন্য কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে জন্মিতে দেখা যায় না। বাংলাদেশে ইহার গাছ সেরূপ দৃষ্ট হয় না। সমতল স্থানে সাধারণতঃ দোআঁশ জমিতে জন্মান চলে। জমিতে ১০।১২ হাত অন্তর ব্যবধানে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে আবর্জ্জনাদি প্রয়োগ করিয়া রাখিয়া বর্ষায় প্রতি গর্ত্তে এক একটী করিয়া চারা লাগাইতে

হয়। বর্ষাকালে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে। ইহার বীজ অত্যন্ত রোগা এবং মৃদু বর্দ্ধনশীল, এজন্য চারা গাছ প্রায় দুই বৎসরের বড় না হইলে জমিতে লাগান উচিত নয়। ইহার ফল দেখিতে অনেকটা শশার ন্যায়, তবে শশা অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট এবং বর্ণ ফিকে সবুজ অনেকটা কামরঙ্গার মত। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ফল পাকে। ইহার গাছে থোলো থোলো ফল ধরে। কাঁচা অবস্থায় ফল টক এবং পক্ক অবস্থায় ফল নরম অম্লমধুর স্বাদ বিশিষ্ট হয়। ইহা হইতে সুন্দর আচার বা চাট্‌নি হইয়া থাকে।

বেল

(Aegle marmelos)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বেলগাছ হিন্দুদিগের নিকট অতি পবিত্র—দেবতা জ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিতেছে। ইহার আর এক নাম শ্রীফল। ইহা সমতল স্থানে ও ৪০০০ ফিট্ উচ্চ পার্ব্বত্য স্থানে ভাল জন্মে। এই গাছ প্রায় ৩০।৩৫ হাত দীর্ঘ ও বহুল শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকায় ইহা জন্মিয়া থাকে তবে

উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল হয় না। ১৪।১৫ হাত অন্তর দুই হাত গভীর ও ঐরূপ গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা পচা সার প্রয়োগ করিতে হয় পরে বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে এক একটী করিয়া চারা লাগাইতে হয়। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মান চলে এবং গাছের গোড়ায় যে ফেঁকড়ি জন্মে তাহা চারা হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বীজ হইতে বর্ষাকালে চারা উৎপন্ন করিয়া চারাগুলি প্রায় এক বৎসরের বড় হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে লাগান যাইতে পারে। বেল গাছ ৭ বৎসরে ফল প্রসব করে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল হয় এবং পরবর্ত্তী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ফল পাকে।

ফলের আকার অনুযায়ী বড় ছোট হিসাবে ইহার দুইটি জাতি দৃষ্ট হয়। যে ফলের খোলা পাতলা, শাঁস অধিক এবং বীজ ও আঁটির ভাগ কম তাহাই উৎকৃষ্ট জাতীয়। বেলফল এক একটী ওজনে /৴৹ পোয়া হইতে /৩-/৪ সের হইয়া থাকে। বেল ফল ও ঔষধ উভয় হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেলের মোরব্বা আমাশয় ও পেটের অসুখের পক্ষে অতি উপকারক। গ্রীষ্মকালে বেলের পানা বা সরবৎ অতিশয় স্নিগ্ধ ও উপাদেয় হইয়া থাকে।

মনেষ্টেরা (Ceriman)

ম্যাক্সিকো দেশ ইহার জন্মভূমি। এই গাছ কতকটা লতানিয়া ভাবাপন্ন। ইহার পাতা দেখিতে মনোহর। উত্তর ভারতে ইহার চাষ দৃষ্ট হয়, নিম্ন বাংলায় ইহা জন্মে না। সাধারণতঃ কোন বড় গাছের গোড়ায় ইহাদের লাগাইতে হয় কিন্তু লতানিয়া ভাবাপন্ন হইলেও ইহারা কাহারও অবলম্বন গ্রহণ করে না। বড় গাছের নীচে জন্মান হয় বলিয়া সূর্য্যতাপ এবং তুষারপাত হইতে গাছ রক্ষা পাইয়া থাকে। ছায়াযুক্ত এবং আর্দ্র বায়ুযুক্ত স্থানে ইহা জন্মিতে ভালবাসে।

বর্ষাকালে ইহার গাছ লাগাইতে হয়। ইহার কোঁক (Sucker) হইতে এবং কাটিং দ্বারা গাছ জন্মান চলে। কোন বড় গাছের গোড়ায় দেড় হাত দুই হাত আন্দাজ গভীর ও তদনুযায়ী গোলাকার ভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনাদি সার প্রয়োগ করিয়া গর্ত্ত পূরণ করিয়া রাখিতে হয়, পরে উপযুক্ত সময়ে প্রতি গর্ত্তে এক একটি করিয়া চারা লাগাইতে হয়। গ্রীষ্মকালে গাছের গোড়ায় রীতিমত জল সেচন করিতে হয়। অন্য গাছের ন্যায় ইহার ডাল ছাঁটিবার আবশ্যক করে না। গাছ লাগাইবার পর ৫।৬ বৎসরের মধ্যে গাছে ফল ধরে। ইহার পক্ক ফলের মধ্যে কতকটা আনারস ও পক্ক কদলীর ন্যায় সুগন্ধ অনুভূত হয়। ফলশস্য অম্লমধুর স্বাদ বিশিষ্ট, বিস্তর ফলে এবং অনেক দিন ধরিয়া থাকে।

মহুয়া

(Bassia latifolia)

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। গাছ খুব বড় হয় এবং বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। শুষ্ক কাঁকরময় জমি ইহার পক্ষে উপযোগী। রঁাচি, হাজারীবাগ সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে এই গাছ বন্যভাবে জন্মিয়া থাকে।

বর্ষাকালে ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ইহার ফুল হয়। ফুল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয় এবং বীজ হইতে এক প্রকার জ্বালানি তৈল তৈয়ারী হয়। ইহার কাষ্ঠ খুব মজবুত এবং বহু প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

মামী আপেল

(Mammee Apple)

ইহার গাছ প্রায় ৩০।৩২ হাত দীর্ঘ ও বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। আমেরিকার উষ্ণ-প্রধান দেশ ইহার জন্মস্থান।

ইহার গাছ কঠিনজীবী কিন্তু মৃদুবর্দ্ধনশীল। দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মান চলে। ইহার বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া এক বৎসরের বড় হইলে ১৫।১৬ হাত অন্তর লাগাইতে

হয়। গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ এবং আবশ্যক অনুযায়ী জলসেচন করা দরকার। বর্ষাকালে চারা লাগাইতে পারা যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে ফুল এবং শ্রাবণ মাসে ফল পাকে। সুমিষ্ট ফল এক একটি আকারে ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। ফলের বর্ণ হরিদ্রাভ এবং উহা খাইতে খোবানীর ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট হয়।

ম্যাঙ্গোষ্টিন (Mangosteen)

মালয় দ্বীপপুঞ্জ ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান বলিয়া কথিত। গাছ তাদৃশ বড় হয় না এবং গাছের বৃদ্ধি অতি ধীর। দুই বৎসর বয়স্ক বীজের গাছ ১২।১৪ ইঞ্চির অধিক উচ্চ হয় না। প্রায় ১৫০০ ফিট উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং অপেক্ষাকৃত আর্দ্র জল-হাওয়ায় ইহা ভাল জন্মে। বাংলার জলবায়ু ইহার পক্ষে অনুকূল না হইলেও এদেশে ইহা ফলপ্রসূ হইতে দেখা যায়।

জমিতে ১২।১৪ হাত অন্তর ইহার চারা লাগাইতে হয়। বীজ হইতে এবং গুঁটি বা দাবা-কলমে ইহার চারা প্রস্তুত হয়। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিলে ও উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে গাছ সুশ্রী ও সু-ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

রাসবেরী (Raspberry)

ইহা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ ; সমতল প্রদেশে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা জন্মাইতে পারা যায়।

উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মান চলে। মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উহাতে গোময়াদি সার মিশাইয়া লইতে হয়। বর্ষাকালে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ইহার চারা লাগান চলে। ইহার বীজ এবং দাবা-কলম ও কোঁক হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায়। চারা লাগাইবার পর প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে হয়। গাছ এক বৎসরের হইলে ফল ধরে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে ফুল ধরে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ফল পাকে। ইহার ফল ঈষৎ অম্লাক্ত। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট আচার ও মোরব্বা প্রস্তুত হয়। ইহার কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতি আছে; তন্মধ্যে মরিসাস্ এবং মহীশূর জাতি বাংলায় জন্মাইতে পারা যায়।

রুটীফল

(Bread Fruit)

রুটীফল বলিয়া কোন ফলের নাম বাংলায় নাই। ইহা ইংরাজী Bread fruit এরই নামান্তর মাত্র। কাঁঠালের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। ইহার স্বাভাবিক উৎপত্তিস্থান জাভা এবং প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহ। ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, মালাক্কা ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ দৃষ্ট হয়। এই গাছ ৩০।৩৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। গাছের পাতা খুব বড় প্রায় একফুট দেড় ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। শীত প্রধান পার্ব্বত্য স্থানে ইহা জন্মে না। সমুদ্রতীরবর্ত্তী লবণাক্ত ভূমিতে ইহা ভাল জন্মে, প্রায় ১৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে জন্মাইতে পারা যায়। যে সমস্ত স্থানে নারিকেল বৃক্ষ খুব ভাল জন্মে তথায় ইহা জন্মান চলে। বীজ, গুটী-কলম, দাবা-কলম এবং ফোঁকড়া হইতে গাছ জন্মান চলে।

ব্রেডফ্রুটের কয়েকটি জাতি আছে। এই গাছ অতি দ্রুত বর্দ্ধনশীল। ৫।৬ বৎসরের গাছ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ফলের আকৃতি বা গাত্র অনেকটা কাঁঠালের ন্যায়। ফল ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪।৫ ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে। রুটীফলের বর্ণ অনেকটা সবুজ এবং ফলের মধ্যভাগ পাঁউরুটীর মত এক প্রকার শ্বেতবর্ণের নরম ও মাংসল পদার্থে পূর্ণ থাকে। এই ফল পোড়াইয়া খাইলে অনেকটা রুটীর মত স্বাদ বিশিষ্ট হয়। ফলের

মধ্যভাগস্থ শাঁসাল পদার্থ পাঁউরুটির মত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাজিলে চেষ্ট-নাট ফলের স্থায় আস্বাদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল মাদ্রাজ, মহীশূর, দাক্ষিণাত্য এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ইহার চাষ অল্প-বিস্তর প্রচলিত হইয়াছে।

লকেট (Loquat)

ইহার প্রাচীন উৎপত্তি স্থান চীন ও জাপান। ইহার গাছ ২৫।৩০ হাত দীর্ঘ হয়। ইহার পাতা বড় ও খস্‌খসে। বাংলা-দেশে নানা স্থানে লকেট্‌ সহজে জন্মাইতে দেখা যায় তবে পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের ফল আকারে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও বড় হয় এখানে সেরূপ হয় না।

হালকা বেলে দোআঁশ জমিতে ভাল জন্মে। জমিতে ১৫।১৬ হাত অন্তর এক একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনাদি সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়, পরে উপযুক্ত সময়ে প্রতি গর্ত্তে এক একটি করিয়া চারা লাগাইতে পারা যায়। বর্ষাকালে চারা লাগান যুক্তিসঙ্গত। ইহার বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া চারাগুলি প্রায় এক বৎসরের বড় হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে লাগাইতে পারা যায়, কিন্তু বীজের গাছে ফল ধরিতে কিছু বিলম্ব হয় এবং

উহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে কৌন নিশ্চয়তা থাকে না। ইহার চারা বর্ষাকালে বসান হয়। গুল-কলম দ্বারাও বর্ষাকালে কলম উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

বীজের চারায় ৮।১০ বৎসরের এবং কলমের চারায় ২।৩ বৎসরের মধ্যে ফল ধরে। ইহার গাছ বৎসরে দুইবার পুষ্পিত হয়। একবার আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অন্যবার অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পুষ্পিত হইলেও এ সময়ে ফল ধরে না, ফুল ঝরিয়া পড়ে। চৈত্র মাসে ফল পক্ক হয়। যুক্ত প্রদেশে কোন কোন স্থানে বৎসরে তিন বার ফল ধরে বলিয়া শোনা যায়।

এদেশে সাধারণতঃ ইহার একটি জাতি দৃষ্ট হইলেও ফলের আকার, বর্ণ ও স্বাদ হিসাবে ইহাদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। জলবায়ু, আবহাওয়া ও মাটির তারতম্য অনুসারে ফলের আকৃতি ও স্বাদের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ইহার ফল অম্লমধুর আস্বাদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে গাছ মুকুলিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ষাশেষে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়ার চারিদিকে এক হাত বাদ দিয়া মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে ফেলিতে হয়। পরে ঐ অবস্থায় ২ সপ্তাহ কাল ফেলিয়া রাখিয়া গাছের রুগ্ন ও অতিরিক্ত শাখা কাটিয়া দিতে হয়, পরে নূতন মাটির সহিত সার মিশাইয়া গোড়ায় প্রয়োগ করিতে হয়। এই সময়ে গাছে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে হয়। গাছে ফুল

ধরিবার সময়ে কিছুদিনের জন্য জলসেচন বন্ধ রাখিয়া গাছে ফল দেখা দিলে পুনরায় জলসেচন করা দরকার। এ সময় জল দিলে ফলের আকার বড় হয় এবং ফল কোমল, রসাল ও সুস্বাদু হয়।

লিচু

(Nephelium litchi)

ইহা আমের ন্যায় বৃহৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ্। ভারতবর্ষ ইহার আদি জন্মস্থান নহে। কাহারও কাহারও মতে পর্ত্তুগীজ বণিক-গণ কর্ত্তৃক চীন দেশ হইতে ইহা আনীত হইয়াছে। চীনদেশে ইহা লিচি নামে পরিচিত এবং সেই অনুসারে এদেশে ইহাকে লিচি ও লিচু নামে অভিহিত করা হয়।

শীতপ্রধান অঞ্চল ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র ইহা জন্মিতে দেখা যায়। মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ত্রিহুত, বঙ্গদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে উৎকৃষ্ট লিচু জন্মিয়া থাকে। বাংলার বেলে দোআঁশ মাটিতে ইহা বেশ ভাল জন্মে। গুটি বা গুল্ম-কলম দ্বারা লিচুর বংশ বৃদ্ধি করা হয়। বীজ হইতেও ইহার গাছ জন্মান যায় কিন্তু বীজের গাছের ফল সম্বন্ধে অনেকটা অনিশ্চয়তা থাকে এবং বীজের গাছ অনেক বিলম্বে ফলে, এজন্য অনেকে ইহার

পক্ষপাতী নহে। লিচুর গুল বা গুটি-কলম প্রস্তুত করিতে হইলে বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে করা আবশ্যক। যে শাখা দুই একবার ফুল ফল ধারণ করিয়াছে সেইরূপ শাখায় কলম বাঁধিতে হয়। গাছের নীচের দিকের ডাল অপেক্ষা উপরের শাখায় কলম বাঁধিলে শীঘ্র ফল ধরে। যে ডালে কলম বাঁধা হইবে তাহা যেন অধিক মোটা না হয় এবং সুস্থ ও সরল ডালে কলম বাঁধিতে হয়। নির্ব্বাচিত শাখার গোড়ার দিকে দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থানের ছাল তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা আস্তে আস্তে চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে। এই অবস্থায় ১২।১৪ দিন রাখিয়া দিলে রস শুকাইয়া কর্ত্তিত বাকলশূন্য স্থানের দুইদিকে গাঁইটের মত হয়। ঐ স্থানে সার মিশ্রিত মাটি লেপিয়া দিয়া নারিকেল ছোব্ড়া ও ছেঁড়া চট দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়। অর্দ্ধেক আটাল মাটি সমপরিমাণ শুষ্ক গোবর, পচা খইল, এবং পচা মাছ একত্র মিশ্রিত করিয়া সার মাটি প্রস্তুত করিতে হয়। বৃষ্টির জল নিয়মিত ভাবে পাইলে এক মাসের মধ্যেই ঐ গুল বাঁধা স্থান হইতে শিকড় বাহির হয়। বৃষ্টির জল না পাইলে কোন জল-পূর্ণ ছিদ্র হাঁড়ি বা কলসী উহার উপর বাঁধিয়া দিতে হয় এবং যাহাতে ঐ স্থান সর্ব্বদা সরস থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমবার শিকড় বাহির হইলেও আরও কিছুদিন এই অবস্থায় রাখিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয়বার ঐ স্থান ফুঁড়িয়া শিকড় বাহির হইলে কলম নামাইবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, বাদলা দিন দেখিয়া কলম কাটিয়া নামাইতে হয় এবং

ঐ সমস্ত কলম ছায়াযুক্ত শীতল ও আর্দ্র মাটিতে হাপোরে রোপণ করিতে হয়। ৫।৬ মাস পরে এবং এক বৎসরের মধ্যে গাছগুলি হাপোর হইতে উঠাইয়া লইয়া জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে পারা যায়।

লিচুর আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ না হইলেও উহা এ দেশের জলবায়ু সহনীয় হইয়া গিয়াছে এবং উহার চাষ এ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুবিধার জন্য নিম্নে কয়েক জাতীয় লিচুর বিবরণ প্রদত্ত হইল।

গোলাপগন্ধ :—ইহাও উৎপন্ন সঙ্কর জাতি। গাছ ২০।২৫ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার জন্মস্থান সম্ভবতঃ মজঃফরপুর অথবা দ্বারভাঙ্গা। ফল পাকিলে অনেক বেগুনে রঙের হয় এবং ফলের মধ্যে গোলাপ জলের গন্ধ অনুভূত হয়। ফলন কম ফলের আকার অনেকাংশে মজঃফরপুরের অনুরূপ এবং এক সময়েই পাকে।

দ্বারভাঙ্গা :—ইহাও দ্বারভাঙ্গা জেলায় উৎপন্ন সঙ্কর জাতি। গাছ মজঃফরপুর জাতির ন্যায় দীর্ঘ হয় এবং ফলও তুলনায় মজঃফরপুর জাতিরই অনুরূপ।

দেশী :—ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাষ হয়। গাছ সাধারণতঃ ৩০।৩৫ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। এদেশে উৎপন্ন সঙ্কর জাতির মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরাতন জাতি। ফল ঈষৎ লম্বা এবং মধ্যমাকৃতি, অন্য জাতি অপেক্ষা আঁটি একটু বড়।

বেদানা ঃ—লিচুর মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গাছ ১৫।২০ হাত উচ্চ হয়। কাঁচা অবস্থায় ইহার ফল সবুজ এবং পক্কাবস্থায় ঈষৎ লালাভ হয়। ফল ঈষৎ গোলাকার এবং বীজ অতি ক্ষুদ্র। ফল পাকিতে আরম্ভ হইলে অল্পদিনেই সব পাকিয়া যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে। অন্য জাতি হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহার ফলের গাত্র বা উপরিভাগ কণ্টকযুক্ত হয় না বরং অনেকটা মসৃণ হইয়া থাকে।

বোম্বাই ঃ—ইহাও সঙ্কর জাতি দ্বারা উৎপন্ন, কিন্তু মজঃফরপুর বা হাজিপুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। গাছ মজঃফরপুর জাতির ন্যায় দীর্ঘ হয়, কিন্তু ফল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বিস্তর ফলে এবং গাছে অনেক দিন স্থায়ী হয়। ফল একটু বিলম্বে পাকে। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতেই ফল পাকিতে আরম্ভ করে।

মজঃফরপুর ঃ—ইহা দেশী ও চীনা লিচু হইতে উৎপন্ন সঙ্কর জাতি। দেশী লিচুর মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট এবং প্রথমস্থানীয়। গাছ ১৫।২০ হাত উচ্চ হয়। সাধারণতঃ বেদানা লিচু অপেক্ষা ইহা অধিক ফলে এবং অনেকদিন গাছে স্থায়ী হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে। অন্য দেশী লিচু অপেক্ষা ফল বড় এবং ফলশস্য মধুর ও বীজ ছোট। সাধারণতঃ অন্য লিচু অপেক্ষা এই জাতীয় লিচু চাষ লাভজনক। মজঃফরপুর জেলায় উৎপন্ন হওয়ায় এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

মাদ্রাজী :—ইহা মাদ্রাজ অঞ্চলের উৎপন্ন সঙ্কর জাতি। ১২।১৪ হাত দীর্ঘ হয়। কিন্তু বর্দ্ধিত হইতে সময় লাগে। ইহার ফল বড়, অনেকাংশে গোলাকার এবং সুমিষ্ট ও বীজ ছোট মজঃফরপুর বা বোম্বাই লিচু অপেক্ষা কম ফলে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

মুড়াগাছা :—ইহাও উৎপন্ন সঙ্কর জাতি। গাছ সাধারণতঃ ২০।২৫ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং সহজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফল বড় এবং নিম্নাংশ ঈষৎ লম্বাকৃতি। ফলশস্য মধুর, আঁটি মজঃফরপুর জাতি অপেক্ষা বড়। ফল জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে।

সবুজ :—ইহাও উৎপন্ন সঙ্কর জাতি এবং বোম্বাই জাতির অন্তর্ভূক্ত। গাছ ২০।২৫ হাত দীর্ঘ হয়। ফল মধ্যমাকৃতি। ইহার বিশেষত্ব এই যে ফল গাছে পাকিলেও উহার রং সবুজবর্ণ থাকে, সুতরাং ফল পাকিয়াছে কিনা সহজে বুঝা যায় না। ফল অম্লমধুর স্বাদ বিশিষ্ট।

হাজিপুর :—ইহাও সঙ্কর জাতি। গাছ ১৫।২০ হাত উচ্চ হয়। হাজিপুর জেলায় উৎপন্ন হওয়ায় ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ফল অনেকাংশে মজঃফরপুর জাতির সমকক্ষ।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে স্থানের মাটিতে চূণের ভাগ অধিক থাকে সেই স্থানের ফল অধিক সুমিষ্ট হইয়া থাকে।

সুতরাং যে স্থানের মাটিতে চূণের ভাগ খুব কম থাকে তথায় বিঘা প্রতি ১৪।১৫ সের গুঁড়া চূণ প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। জমি প্রস্তুত করিবার সময়েই চূণ প্রয়োগ করিতে হয়। নিম্ন বা জলবসা জমিতে ইহার চাষে সুফল লাভ করা যায় না, সুতরাং ইহার জন্য উচ্চ জমি নির্ব্বাচিত করিতে হয়। নির্ব্বাচিত জমিতে ১৪।১৫ হাত অন্তর লাইন দিয়া দেড় কি দুই হাত গোলাকার এবং ঐরূপ গভীর করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে এক একটী গর্ত্ত করিয়া পূর্ব্ব হইতে তাহাতে পচা গোবর, খইল, ছাই ও হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিতে হয়, পরে উপযুক্ত সময়ে লিচুর চারা বা কলম রোপণ করা যাইতে পারে। সচরাচর বর্ষাকালেই আম, লিচু প্রভৃতির কলম রোপণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টির সময় বা কর্দ্দমাক্ত মাটিতে ইহা রোপণ করা উচিত নয়। বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কলম রোপণ করা যাইতে পারে। মেঘমুক্ত পরিষ্কার দিন দেখিয়া 'জো' বুঝিয়া কলম বসাইতে হয়, নতুবা অধিক বৃষ্টির সময় কলম বসাইলে উহা সহজে বর্দ্ধিত হয় না এবং অনেক সময় গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা যায়। মাটি অত্যধিক শুষ্ক বা নীরস হইলে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় জলসেচন করা দরকার। বৃষ্টির চাপে গাছের গোড়ার মাটি জমাট বাঁধিয়া যায়, এজন্য আলগা করিয়া দিতে হয়, নতুবা উহারা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে গাছের গোড়ায়-সার প্রয়োগ করিতে হয় এবং গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গাছের

গোড়া কোপাইয়া দিবার সময় গাছের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় কাটা পড়ে, ইহাতে গাছের উপকারই হইয়া থাকে, কারণ ইহাতে গাছের শিকড় ছাঁটাই কার্য্য সম্পন্ন হয়। গাছ ফল ধারণের উপযুক্ত হইলে উহাদের গোড়ার চারিদিক খুঁড়িয়া ফেলিয়া ৭।৮ দিন ধরিয়া শিকড়ে রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হয়, পরে গাছের আকার হিসাবে কিছু পুরাতন গোবর সার, পচা খইল, কাঠের ছাই ও অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণতঃ কলমের গাছ রোপণের দুই বৎসর পরে সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বড় গাছের জন্য প্রতি বৎসর—

পুরাতন গোবর—/৫ সের
খইল চূর্ণ—/২ সের
অস্থি চূর্ণ—/২ সের
ছাই—/৫ সের

প্রয়োগ করিতে পারা যায়। গাছের আকার হিসাবে সার কম-বেশী প্রয়োগ করিতে হয়। গাছের শাখা-প্রশাখা যতদূর পার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়, ইহার রস-শোষণকারী শিকড়ও মাটির মধ্যে পার্শ্ব-দেশে ততদূর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেজন্য গাছের ঠিক গোড়ায় সার বা জল প্রদান না করিয়া পূর্ণবয়স্ক গাছের গোড়া হইতে অন্ততঃ ৬।৮ হাত দূরে দুই হাত প্রস্থ এবং এক হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া সার প্রয়োগ করিয়া মাটি চাপা দিতে হয়। জলসেচনের জন্য গাছের গোড়ার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আইল বা আলবাল করিয়া দিলে ভাল হয়। লিচু গাছের কাণ্ডের নিম্নভাগের যে

সমস্ত শাখাগুলি মাটির দিকে ঝুলিয়া থাকে সেগুলি কাটিয়া দেওয়া এবং যাহাতে গাছের গোড়া রৌদ্র ও আলো পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সাধারণতঃ আম ও লিচুর এই একই প্রকার পরিচর্য্যা আবশ্যক।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে লিচু গাছ মুকুলিত হয়। এ সময়ে গাছে জলসেচন করা উচিত নয়। সাধারণতঃ অনেক সময় দেখা যায় যে মুকুল ধরিবার সময় নূতন পত্র উদ্গত হইলে আর সে বৎসর গাছে ভালভাবে মুকুল আসে না। ফল দেখা দিলেই সে সময় যাহাতে গাছের রসের অভাব না ঘটে তাহা দেখা দরকার কারণ এ সময় মাটি সরস না থাকিলে উক্ত ফলগুলিই ছোট অবস্থায় ঝড়িয়া পড়ে, এজন্য এসময় আবশ্যক মত উপযুক্ত পরিমাণে গাছে জলসেচন করা দরকার। আঁটির বা বীজের গাছ অধিক বিলম্বে ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১২।১৪ বৎসরের কম বয়সে বীজের গাছে ফল ধারণ করিতে দেখা যায় না। কলমের গাছ রোপণের পর ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ফল ধারণ করে। কলমের গাছ ৩।৪ হাত দীর্ঘ হইলে উহার ফল গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসেই লিচু ফল পাকিয়া থাকে।

ব্যবসার জন্য চাষ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট জাতীয় লিচুর চাষ করা দরকার। যত্ন ও পরিচর্য্যা করিলে এক একটী গাছ হইতে ৪।৫ হাজার লিচু পাওয়া যায়। যদি প্রতি গাছের ফলন ৫ হাজার ধরা হয় এবং এক বিঘা জমিতে ৩৫।৩৬টী গাছ থাকে

তাহা হইলে প্রতি বিঘায় ১৮০০০ হাজার পাওয়া যায়। ভাল জাতীয় লিচু বাজারে ॥০ আনা হইতে ॥৵০ আনা শ' বিক্রয় হয়। খুব কম পক্ষে ।০ আনা শ' দর ধরিলে এক বিঘা জমি হইতে ৪৫০৲ পাওয়া যায়। খরচা ১৫০৲ ধরা যায় তাহা হইলেও ৩০০৲ টাকা লাভ পাওয়া যায়।

লিচুর ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে সমস্ত গাছগুলি জাল দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হয়, নতুবা বানর, বাদুড়, কাক প্রভৃতি পক্ষীতে উহা নষ্ট করিয়া ফেলে। লিচু পাকিতে আরম্ভ হইলে বাগানে পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়, নতুবা ঐ সময় পশু-পক্ষীদের উপদ্রব নিবারণ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। ফাটা বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত ঠক্‌ঠকি ও ভাঙ্গা টিনের শব্দ করিলে এবং সময় সময় বন্দুকের আওয়াজ করিলে ঐ সমস্ত পশু-পক্ষীরা ভয়ে পলাইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত লিচু গাছের অন্যান্য অনেক শত্রু আছে। নানাপ্রকার কীট দ্বারাও গাছ আক্রান্ত হইয়া থাকে। লিচু গাাছর পাতার নিম্নভাগে সময় সময় একপ্রকার ঈষৎ লাল গুঁড়ার মত পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই রোগাক্রান্ত হইলে গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া যায় এজন্য ইহাকে লিচু পাতার কোঁকড়া রোগ বলা হয়। Arcnida acarina নামক একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র কীটাণুই এই রোগের উদ্ভবকারী। পতঙ্গ অবস্থায় এই কীটাণু পত্রের নিম্নভাগে ডিম পাড়ে। কীটগুলি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া যায়। অবিলম্বে প্রতিকার না করিলে ইহা সমস্ত

গাছে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তখন ইহাদের উপদ্রব নিবারণ করা একরূপ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই রোগাক্রান্ত হইলে গাছ দুর্ব্বল হয়, ফলনের হ্রাস ঘটে এবং ফলেও রোগ জন্মে। পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য রাখিলে সহজেই প্রতিকার করা চলে। এইরূপ কীট দ্বারা আক্রান্ত পাতাগুলি ডাল সমেত সংগ্রহ করিয়া তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া ফেলা এবং গাছের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে ধোঁয়া দেওয়া উচিত। একপ্রকার কীট সময় সময় গাছের কাণ্ডে ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং গাছটিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। ছিদ্রমুখে গুঁড়াবৎ এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত হইতে দেখিলেই এই পোকা দ্বারা গাছ আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঐ ছিদ্র পথে ক্রুড অয়েল ইমালসান বা ফিনাইল জল গাছের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে পোকা মারা পড়ে। পরে ছিদ্রমুখ মোম অথবা ঐরূপ পদার্থ দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

লিচুর ফলের মধ্যেও একপ্রকার পোকা সময় সময় দৃষ্ট হয়। খোসা ছাড়াইলে ফলের মুখে শাঁসের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি সূতলী পোকা দৃষ্ট হয়। এইরূপ কীটাক্রান্ত ফলগুলি আহারের অযোগ্য হইয়া থাকে। ফল সংগ্রহ করিবার অনেকসময় দেখা যায় কোন ফল কীটাক্রান্ত দৃষ্ট হইলে তাহা গাছের তলায় ফেলিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে গাছের বিশেষ অনিষ্ট করা হইয়া থাকে। গাছের যে কোন অংশ কীটাক্রান্ত দৃষ্ট হইবে অথবা কীটাক্রান্ত ফল ঐ ভাবে ফেলিয়া না দিয়া পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া

ফেলিবার ব্যবস্থা করা উচিত, নতুবা ঐ সমস্ত কীটপতঙ্গ পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ডিম পাড়িয়া তাহাদের বংশ বিস্তার করিতে যত্নবান হয় এবং এইভাবে অলক্ষিতে উহারা সমস্ত গাছে বিস্তৃত হইয়া বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

লিচু ফল পরিপক্ক হইয়াছে বুঝিলেই অবিলম্বে ফল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কারণ উহা পরিপক্ক অবস্থায় অধিক দিন থাকে না, শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। লিচুর ফল সংগ্রহকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল সমেত থোলাগুলি ভাঙ্গিয়া লইতে হয় এবং গাছের যে দিকের ফল প্রথমে পাকিয়াছে দেখা যাইবে সেই দিক হইতেই প্রথমে ফল সংগ্রহ করিতে হয়, অর্থাৎ শাখার এক-দিকের ফল ভাঙ্গিয়া লওয়া শেষ হইলে অন্যদিকের ফল সংগ্রহ করা উচিত এবং অধিক পরিপক্ক হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ফল সংগ্রহ করা কর্তব্য। ফলের গাত্র ঈষৎ লালাভ ধারণ করিলেই 'বাত্তি' (পুষ্ট) হইয়াছে বা পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ফল সংগ্রহকালে উহা যাহাতে মাটিতে পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ ফলে আঘাত লাগিলে শীঘ্রই পচ ধরে। পক্ক অবস্থার সময় সময় ফল ফাটিয়া যাইতে দেখা যায়, এরূপ হইলে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া উহাতে রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হয়। গাছের গোড়ায় অত্যধিক আর্দ্রতা প্রযুক্ত এইরূপ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে লিচুর বীজগুলি অনর্থক নষ্ট হইয়া থাকে। এই বীজে তৈল ভাগ আছে। কলে পিষিয়া উহা হইতে তৈল

বাহির করিয়া লইলে হে খইল ভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা গবাদি পশুর খাদ্য অথবা গাছের সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ঐ তৈল প্রদীপ ইত্যাদি জ্বালাইবার কার্য্যে ব্যবহার করা চলে।

লেবু

(Lime and Lemon)

লেবুর মধ্যে বহু বিভিন্ন জাতি আছে। তন্মধ্যে পাতি, কাগজী, সরবতী, গোঁড়া প্রভৃতি কয়েকটি জাতির ব্যবহার প্রচলিত আছে। কমলা, বাতাবী প্রভৃতি লেবুর অন্তর্ভূক্ত হইলেও ইহারা এক একটি বিশিষ্ট জাতির মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শরীরের পক্ষে লেবু বিশেষ হিতকর। লেবুর মধ্যে এরূপ অনেক পদার্থ আছে যাহা দ্বারা শরীরের অনেক অভাব পূরণ হইয়া থাকে। এজন্য সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকগণ (Sailor) ইহার রস প্রায়ই পান করিয়া থাকেন। লেবু হইতে এসেন্স, সিরাপ, আচার, মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপক্ক লেবু ফলের ত্বক ও পত্র চুয়াইয়া কোন বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা dalitgrin ও varlimette নামক সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়। লেবু বিশেষ উপকারক দ্রব্য, এজন্য দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই ইহার যথেষ্ট আদর ও চাহিদা আছে। নিম্নে কয়েক জাতীয় লেবুর বিবরণ প্রদত্ত হইল।

লেবু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে শতকরা ৩.২২ ছাই, ৪৫.৩৩ পটাসিয়াম, ২.৭৩ সোডিয়াম, ৩০.২৪ ক্যাল-সিয়াম, ৫.১৫ ম্যাগ্নেসিয়াম, ০.৭৭ আয়রণ অক্সাইড, ১৩.৬২ ফস্ফরিক এ্যাসিড, ৩.০৮ সালফিউরিক এ্যাসিড, ০.৪৮ ক্লোরিণ। এতদ্ব্যতীত প্রোটীন আছে ১.২%, ফ্যাট ০.৭%, কার্ব্বোহাইড্রেট আছে ৮৫%।

এলাচি—সাধারণতঃ লেবুতে এলাচের গন্ধ অনুভূত হয় বলিয়া ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহার দুইটি জাতি আছে—যে জাতির ফল বড় তাহাই উৎকৃষ্ট ও অপর জাতির ফল এবং পাতা অতি ছোট তাহা তত উৎকৃষ্ট নহে। বর্ষাকালে চারা লাগাইতে হয়।

কলম্বা—ইহার গাছ পাতি বা কাগজী লেবুর ন্যায়। জমিতে ৫ হাত অন্তর লাগান চলে। ফলের আকৃতি দেশী কাগ্জী অপেক্ষা বড় এবং সুগন্ধযুক্ত ও রস খুব বেশী। পাতি বা কাগ্জী লেবুর ন্যায় ইহার তত অধিক ব্যবহার প্রচলিত নাই।

কাগ্জী—কাগ্জী লেবু তিন প্রকারের আছে, যথা—দেশী, চীনের ও বীজশূন্য। দেশী অপেক্ষা চীনের কাগ্জীর ফল বড় এবং সুগন্ধযুক্ত ও দেখিতে লম্বাকৃতি। গুটি বা গুল-কলম দ্বারা গাছ জন্মাইতে হয়। কলমের গাছে সঙ্গে সঙ্গে ফল ধরে বীজ হইতেও চারা জন্মান চলে। ৫ হাত অন্তর অন্তর ইহাদের গাছ লাগাইতে হয়। জমিতে অন্য কোন বেড়ার বীজ বা গাছ

লাগান অপেক্ষা ধারে ধারে পাতি ও কাগ্‌জী লেবুর গাছ লাগান ভাল। চেষ্টা করিলে কাগ্‌জী লেবু বার মাস ফলাইতে পারা যায়। বর্ষাকালে চারা লাগাইতে হয়।

কামকোয়াট—ইহা চীন দেশ হইতে আনীত লেবু জাতীয় ফল। ইহার গাছ সাধারণতঃ ৩।৪ হাত উচ্চ হয়, এজন্য টবে ইহার গাছ জন্মান চলে। ফল কমলালেবুর ন্যায়, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র এবং অম্লাক্ত। বিস্তর ছোট ছোট লাল ফলে গাছ ভরিয়া থাকে। ফল অপেক্ষা শোভাবর্দ্ধক হিসাবে ইহার আদর অধিক। ফলের আকার অনুযায়ী ২।৩টী জাতি আছে।

গোঁড়া—ইহাও কাগ্‌জী লেবু জাতীয় গাছ কিন্তু কাগ্‌জী বা পাতি লেবুর ন্যায় ইহার সেরূপ চলন নাই। ফলের আকার গোল এবং রস তীব্র টক। গোঁড়া লেবু অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

জাম্বীর—ইহা কোন কোন স্থানে জাম্বীর নামে অভিহিত। ইহার রস হইতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। সিসিলি দ্বীপে ইহার অধিক চাষ হয়। বীজ, গুল ও চোক-কলম হইতে চারা জন্মান চলে।

টাবা—ইহা অনেকটা গোঁড়া লেবুর মত কিন্তু ফলের আকার উহা অপেক্ষা বড় এবং গাছের বর্ণ কাল। বর্ষাকালে চারা লাগাইতে হয়।

নারিকেলী—ইহা অনেকটা নারিকেলের আকৃতি বিশিষ্ট

বলিয়া ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই লেবুর খোসা পুরু এবং ফলে বিশেষ রস হয় না।

পাতি—ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। এক প্রকার ঈষৎ লম্বাকৃতি এবং অন্যপ্রকার গোল। ৬।৭ হাত অন্তর ইহার গাছ লাগাইতে পারা যায়। অল্প ছায়াযুক্ত জমিতে ইহা ভাল জন্মে। গোয়ালের পচা আবর্জ্জনা, কাঠ বা ঘুঁটের ছাই এবং অস্থিচূর্ণ জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ফলন শেষ হইলে প্রতিবৎসর ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার। গুল-কলমে চারা জন্মান হয়। বীজেও গাছ হয় কিন্তু ফলিতে খুব বিলম্ব হয়। কলমের গাছ এক বৎসরের মধ্যেই ফলনের উপযোগী হয়।

সরবতী—ইহার ফল দেখিতে অনেকটা কমলালেবুর মত কিন্তু আকারে ছোট এবং পক্ক অবস্থায় ঘোর পীতবর্ণযুক্ত। কমলালেবুর যেমন কোয়া থাকে ইহারও সেইরূপ কোয়া থাকে। গুল ও চোক-কলম দ্বারা ইহার চারা উৎপন্ন করা হয়। বর্ষাকালে গাছ লাগাইতে হয়। এই লেবুতে যথেষ্ট রস থাকে এবং উহা খুব মিষ্ট না হইলেও টক নহে। এই লেবুর রসে ভাল সরবৎ প্রস্তুত হইতে পারে, এজন্য উহার এরূপ নাম হইয়াছে।

লেবু গাছেও পোকা জন্মে। পোকা আক্রমণের প্রথম অবস্থায় কীড়া বা ডিম্ব নষ্ট করিতে পারিলে আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। লেবু গাছের কোন ডাল হঠাৎ শুষ্ক হইয়া গেলে উহার যে স্থান শুষ্ক হইয়াছে সেই স্থান হইতে কাটিয়া পুড়াইয়া

ফেলা উচিত। লণ্ডন পার্পল বা লেড আর্সিনিয়েট পিচকারী দ্বারা গাছে ছিটাইলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা বিষাক্ত ঔষধ।

লেবু চাষ

লেবু চাষে বর্ত্তমানে সিসিলি দ্বীপই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। লেবু পাতি বা কাগজীর বীজের গাছে ফল ধরিতে ছ বৎসর সময় নেয়, তাই চারার চেয়ে কলমের গাছ বসানই ভাল, ইহাতে ফলন বেশী হয়, এবং খুব অল্প বয়সেই ফল দেয়। বাংলা দেশে যে অনুপাতে লেবু জন্মে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। আমাদের দেশে গাছের যত্ন অভাবেই ফলন কম হয়। লেবুর চাষে দোয়াশ মাটী প্রয়োজন। ক্ষেত্রটী এমন জায়গায় হওয়া দরকার যে যেখানে জল দাড়াতে পারে না, অথচ বৃষ্টিপাত বৎসরে কমপক্ষে ৮০ ইঞ্চির কম না হয় ও উত্তাপ ৮০ডিগ্রীর কম না হয়। প্রতি চারা ১২।১৪ ফুট ব্যবধানে রাখা চলে. জমীতে উপযুক্ত ভাবে জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার। লেবু জমীতে ২।১ বৎসর অন্তর অন্তর কিছু কিছু সবুজ সার দেওয়া দরকার। ভালভাবে চাষ করিতে পারিলে একটী গাছে একাদিক্রমে ২৫।৩০ বৎসর ফল পাওয়া যাইবে। লেবুগাছের শিকড় মাটীর নীচে অধিকদূর যায় না। তাই সামান্য ঝড়েই ইহা উপড়াইয়া যায়, তাই গাছ বসাইবার সময় একটা খোটা দিয়া গাছ বাধিয়া দেওয়া উচিত। শীতকালে

লেবুগাছের গোড়ায় জল সেচন করিতে নাই, ঐ সময়ে গাছের গোড়া খানিকটা জায়গা খুঁড়িয়া মাটী আলগা করিয়া দিতে হয়।

লেবুর চাষে আয় মন্দ নহে। কাগ্জী পাতি প্রভৃতি লেবু জমির বেড়ার ধারে ধারে লাগাইলে বেড়া দেওয়ার কাজ হয় অথচ ইহার ফল হইতেও বেশ আয় হয়। ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলে। যত্ন করিলে ও সার দিতে পারিলে এক একটি সতেজ গাছে ৪।৫ শত লেবু পাওয়া যায়। ভাল বড় পাতি লেবু কলিকাতার বাজারে ৵০ আনা করিয়া জোড়া বিক্রয় হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় শতাধিক লেবু গাছ লাগান চলে। ৬।০ হাজার দরে লেবু বিক্রয় করিলে ১০০ লেবু গাছ হইতে ২৫০৲ টাকা পাওয়া যায়। খরচ-খরচা বাবদ ১০০৲ টাকা বাদ দিলে ১৫০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

শশা

(Cucumber)

ইহা লতাজাতীয় উদ্ভিদ্। শশা কচি অবস্থায় ফল এবং পক্ক অবস্থায় তরকারী হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বৎসরে তুইবার ইহার বীজ বপন করা চলে। পালা শশার বীজ বৈশাখ হইতে আষাঢ় এবং ভুঁয়ে শশার বীজ আশ্বিন-

কার্ত্তিক মাসে বপন করা হয়। ভুঁয়ে শশা মাটিতে লতাইয়া ফল প্রসব করে। পালা শশা বর্ষাকালে হয় বলিয়া পালার বা মাচার আবশ্যক হয়।

দোআঁশ জমিতে শশা ভাল হয়। বেলে অথবা এঁটেল জমিতে ইহা জন্মান চলে। জমিতে ৩।৪ হাত অন্তর এক-একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি সার জমি প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োগ করিতে হয়। পরে উপযুক্ত সময়ে প্রতি গর্ত্তে ২।৩টি করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। চারা জন্মিলে সবল চারা রাখিয়া বাকীগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। বিঘা-প্রতি ৮।১০ তোলা বীজ লাগে।

শাঁকালু

(White Potato)

ইহা মূলজ উদ্ভিদ্ ; গাছ লতাইয়া যায় এজন্য উহা পালায় তুলিয়া দিতে হয়। দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। জমি প্রস্তুত করিবার সময় গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি সার ব্যবহার করা চলে। জমিতে ২-২॥ হাত অন্তর ইহার বীজ বপন করিতে হয়। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। বিঘা-প্রতি প্রায় /২ সের বীজ লাগে। শাঁকালু মাটির মধ্যে জন্মে এবং ৯।১০ মাসে উহা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

জমিতে অধিক কাল রাখিয়া দিলে উহা বড় হয়। ইহার গাছের উপরে সীমের ন্যায় শুঁটী ধরে, উহা বিষাক্ত।

ষ্ট্রবেরী

(Straw-berry)

ইহা গুল্ম-জাতীয় লতানিয়া স্বভাব-বিশিষ্ট বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, কিন্তু সাধারণতঃ বার্ষিক শ্রেণীর উদ্ভিদ্ হিসাবে ইহার চাষ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এবং মিরাট, লক্ষ্ণৌ, সাহারানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা ভালরূপ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার কয়েকটি বিশিষ্ট জাতি আছে, কিন্তু বাংলার নিম্ন প্রদেশে ইহা জন্মে না।

সমতল স্থানে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলেও ইহা ভাল জন্মে। উচ্চ ও মুক্ত, হালকা দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। ইহার মাটি সুকর্ষিত এবং উত্তমরূপে চূর্ণিত হওয়া দরকার। জমিতে গোময় ও গোয়ালের আবর্জ্জনাদি পচা সার প্রয়োগ করিয়া উহা মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া প্রায় ১৫ ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ষণ করা প্রয়োজন। ইহার বীজ ও গ্রন্থি লতা হইতে চারা জন্মাইতে পারা যায়, কিন্তু বীজের গাছে প্রথম বৎসর ফল ধরে না। সমতল স্থানে আশ্বিন মাস হইতে

অগ্রহায়ণ মাস এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভাদ্র-আশ্বিন এবং মাঘ-ফাল্গুন মাসে চারা লাগাইতে পারা যায়।

চারা লাগাইবার পর জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচন করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। শীত ও গ্রীষ্মকালে নিয়মিতভাবে গাছে জলসেচন করা আবশ্যক। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে।

সপেটা (Sapodilla)

ইহার জন্মস্থান জ্যামাইকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ। এই গাছ প্রায় ২৫।২৬ হাত দীর্ঘ হয়। সমতল স্থানে ইহা ভাল জন্মে।

বাংলার জল-হাওয়ায় এই গাছ বেশ ভালই হয়। জমিতে ১০।১২ হাত অন্তর এক-একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনা, পচা সার প্রয়োগ করিতে হয়। পরে বর্ষাকালে প্রতি গর্ত্তে এক-একটি করিয়া চারা বা কলম লাগাইতে পারা যায়৷ ইহার পরিপুষ্ট ডাল এবং ক্ষীরণী চারার সহিত জোড়-কলম দ্বারা চারা উৎপন্ন করা যায়। বীজের গাছে ফল ফলিতে কিছু বিলম্ব হয়। কলমের গাছে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ইহার সাধারণতঃ দুইটি জাতি আছে, এক জাতির ফল বড় ও অপর জাতির ফল ছোট। ছোট জাতির ফল বৎসরে দুইবার হয়—শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। ফল মিষ্ট ও সুপক্ক হইলে খাইতে হয়।

সুপারি

(Betel-nut)

এশিয়া মহাদেশ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ ইহার জন্মভূমি। ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে একেবারে গাছপাকা সুপারিকেই বীজরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং পরে ছায়াযুক্ত স্থানে বীজতলা নির্দ্ধারণ করিয়া সেখানে ঐ বীজ রোপন করিতে হইবে, চারা ১।১॥০ বৎসর পর্য্যন্ত বীজতলাতেই রাখা উচিত, পরে উহাকে নির্দ্ধারিত বাগানে বসান উচিত। সুপারি বাগানে মাদার গাছ লাগান উচিত, কেননা ইহার পাতার সার সুপারি গাছের বিশেষ উপকারী। উচ্চ জমিতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এবং নিম্ন জমিতে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ইহার চারা শ্রেণীবদ্ধভাবে ৭।৮ হাত অন্তর লাগান উচিত। অনেকে ৪।৫ হাত অন্তরও লাগাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যেই পাকা সুপারি পাওয়া যায়। চারা লাগাইবার পর ৭।৮ বৎসরের মধ্যে গাছ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। প্রধানত সুপারি মগাই, টাটী, ঝিল ও লাটা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। প্রথমে মগেরা এদেশে সুপারির কারবার করিত, পরে চীনারা ও আরও পরে বাঙ্গালীরা এই ব্যবসা আরম্ভ করে।

বাংলাদেশের অনেক স্থানে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে সুপারির চাষ হয়। ব্রহ্ম দেশের টঙ্গু জেলায় এবং আসামের অনেক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে সুপারি জন্মিয়া থাকে। চারা অবস্থায় ইহাদের ছায়ায় পালন করিতে হয়।

অধিক রৌদ্রের তেজে চারা শুকাইয়া যায়। পাঁকমাটি ইহার উত্তম সার। ইহার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হয় না। কলের জমির চারিপাশে লাগাইলে বিনা যত্নে একটা ফসল ফাউ হিসাবে পাওয়া যায়।

ক্ষীরণী

(**Mimusops kauki**)

ইহা খুব দীর্ঘপ্রসারী গাছ, ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মিতে দেখা যায়। পাঞ্জাব প্রদেশে অনেক স্থানে ইহার প্রচুর পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। ভারতের সমতল স্থানে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা জন্মে না।

ভারতে যে কোন মৃত্তিকায় ইহা জন্মাইতে পারা যায়, তবে দোআঁশ মৃত্তিকায় ভাল জন্মে। জমিতে ১৫।১৬ হাত অন্তর চারা লাগাইতে হয়। বর্ষাকালই চারা লাগাইবার উপযুক্ত সময়। জমিতে ১৫।১৬ হাত ব্যবধানে ১॥ হাত গভীর ও ২ হাত গোলাকার ভাবে এক-একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়, পরে উপযুক্ত সময়ে প্রতি গর্ত্তে এক-একটি করিয়া চারা লাগাইতে হয়।

ইহার বীজ হইতে চারা জন্মাইতে হয়। বীজ পুরাতন হইলে তাহা হইতে চারা জন্মে না, এজন্য টাট্‌কা সতেজ বীজই

লাগান প্রশস্ত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ ফেলিয়া চারা জন্মাইতে হয়, বীজতলার মাটি উত্তমরূপে চূর্ণিত হওয়া দরকার। বীজ হইতে চারা বাহির হইতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। চারাগুলি এক হাত বড় না হওয়া পর্য্যন্ত উহা জমিতে স্থানান্তরিত করা উচিত নয়। গাছ খুব আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া উহা জমিতে নাড়িয়া বসাইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে।

গাছ লাগাইবার পরই জলসেচন করা দরকার। বর্ষাকালে গাছ লাগান হয় বলিয়া গাছে অধিক জলসেচনের আবশ্যক করে না। গাছ ১৫।১৬ বৎসরের হইলে উহাতে ফল ধরে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পক্ক হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফলের গুণাগুণ

বানর ও বনমানুষের দেহের সহিত আমাদের শরীরের অবয়ব ও দন্তের গঠনের অনেক সাদৃশ্য আছে দেখিয়া অনেকে মনে করেন ফলমূলই আমাদের প্রধান খাদ্য এবং আমরা ফল-মূলভোজী হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি। ফল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারক। ফল মুখরোচক, বলকারক, কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারক এবং শোণিতবর্দ্ধক। কোন কোন ফলের মধ্যে প্রোটীন, অম্ল ও লবণ জাতীয় পদার্থ অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ফলের মধ্যে 'সি' ভাইটামিন অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, ইহা স্কার্ভি রোগের উপশমকারক। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ ফলাহার করিয়াই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন। এদেশে ফলের যত অধিক ব্যবহার ও প্রচলন হয় ততই মঙ্গল।

ফলের মধ্যে আম, কমলা, পেঁপে, আনারস, কালজাম, গোলাপজাম, কলা, বাতাবী, পাতি ও কাগজী লেবু, ডাব, আঙ্গুর, ন্যাশপাতি, আপেল, ডালিম, বেদানা, আতা, পীচ প্রভৃতি ফল উৎকৃষ্ট এবং ঝুনা নারিকেল, কাঁঠাল, লিচু, ফুটি, তরমুজ, শশা প্রভৃতি দুষ্পাচ্য। ফল টাট্‌কা খাওয়া উপকারক। কাঁচা,

অধিক পক্ক ও পচা ফল অজীর্ণকর। ফল উত্তমরূপে ধুইয়া খাওয়া উচিত। ফল ভক্ষণে শ্বেতসার নামক খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে, এজন্য আহারের অব্যবহিত পরেই ফল ভক্ষণ প্রশস্ত। আমাদের দেশে রাত্রিকালেও ফলাহার প্রচলিত আছে; কিন্তু সাহেবেরা প্রাতে ও মধ্যাহ্নকালে ফল ভক্ষণ করা প্রশস্ত মনে করেন। রাত্রে তাঁহাদের মতে ফল ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

বিভিন্ন ফলের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদিক ও রাসায়নিক খাদ্যগুণ কিরূপ ও উহা কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

আম

পক্ক আম্র :—মধুর-রস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, বলকর, বাতহর, ক্লান্তিকর, ধাতুবর্দ্ধক এবং তৃষ্ণা ও শ্রান্তির শান্তিকারক।

কচি আম :—কষায়-রস, অগ্নি ও পিত্তবর্দ্ধক এবং কণ্ঠরোগ, মেহ, ব্রণ ও কফ-পিত্তের উপশমকারক। কাঁচা আম অম্লরস রোচক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফজনক।

কাঁঠাল

পক্ক কাঁঠাল :—মধুর-রস, শীতল, শীতবীর্য্য, রুচিকর এবং বলবীর্য্য ও শুক্রবর্দ্ধক।

এঁচোড় :—কষায়-মধুর-রস, রুচিকর, বলকর, গুরুপাক দাহজনক এবং বল ও বায়ুরোগের বৃদ্ধিকারক, ইহার বীজ

ঈষৎ কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, মলরোধক, মূত্র নিঃসারক এবং শুক্র ও বায়ুবর্দ্ধক।

কলা

পক্ক কলা ঃ—স্বাদু রস, শীতবীর্য্য, শুক্র, মাংস ও বলবর্দ্ধক, মলকারক, রুচিজনক এবং তৃষ্ণা, কৃমি ও পিত্তের শান্তিকারক।

কচি কলা ঃ—কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক এবং বলবর্দ্ধক। চাঁপা ও মর্ত্তমান কলা ঈষৎ অম্লস্বাদ বিশিষ্ট।

কালজাম

ইহা মধুর-অম্ল-কষায়-রস, শীতল, রুচিকর এবং বাত, কফ ও অজীর্ণ-নাশক।

কমলা লেবু

ইহা ঈষৎ অম্ল-মধুর-রস, সুস্বাদু, রুচিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শ্রান্তিহারক এবং ক্রিমি, শূল ও বায়ুরোগে উপকারক।

বাতাবী লেবু

সুপক্ক ও মিষ্ট বাতাবী লেবু কমলার ন্যায় গুণ-সম্পন্ন। অজীর্ণ রোগে ইহা বিশেষ হিতকর।

পাতি ও কাগজী লেবু

ইহা কটু-অম্ল-রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বমন নিবারক এবং অজীর্ণ, বিসূচিকা, উদর, কাস ও তৃষ্ণার

উপশমকারক। লেবুর রস গ্রহণ করিলে শরীরের বিষাক্ত ইউরিক এ্যাসিড নষ্ট হয়।

আনারস

ইহা অম্ল-মধুর-রস, সুস্বাদু, রুচিকারক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কৃমি ও অজীর্ণ রোগে হিতকর।

পেঁপে

পাকা পেঁপে :—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পক্ক, সারক, রুচিকর এবং অজীর্ণ, বায়ু, অর্শ, গুল্ম ও প্লীহা রোগে হিতকর।

নারিকেল

কচি ডাবের জল :—মধুর-রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক এবং পিত্ত, অম্লপিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণাশান্তিকারক।

পাকা নারিকেলের জল :—গুরুপাক, মলভেদক, বলকারক এবং অগ্নি ও শুক্রবর্দ্ধক।

নারিকেল দুগ্ধ :—মধুর-রস, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক এবং কাস, বায়ু, শ্লেষ্মা ও গুল্ম রোগের উপকারক।

নারিকেল :—মধুর-রস, বলকারক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভকারক এবং বায়ু, পিত্ত, অম্লপিত্ত ও দাহ রোগে হিতকর।

পেয়ারা

ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং রক্তপিত্ত ও বায়ু রোগে শান্তিকারক।

সপেটা

ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও চক্ষুর পক্ষে হিতকর।

আঙ্গুর

ইহা ঈষৎ কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, সারক, পুষ্টিকর, কফ-পিত্তনাশক, মূত্রনিঃসারক এবং দাহ, তৃষ্ণা, বাত, বাত-রক্ত, শোষ, শ্বাস এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও চক্ষুরোগে হিতকর।

আপেল

ইহা কষায়-মধুর-রস, রুচিকারক, সুস্বাদু, বলকারক ও প্রীতিদায়ক।

ন্যাশপাতি

ইহা অম্ল-মধুর-রস, বায়ুনাশক, বলবর্দ্ধক, রুচিকারক ও শুক্রজনক।

পীচ

ইহা অম্ল-মধুর-রস, রুচিকর ও বলবর্দ্ধক।

বেল

কচি বেল ফল :—তিক্ত-কষায়-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মল-রোধক, উগ্রবীর্য্য, বায়ু ও কফ-নাশক এবং অতিসার রোগে হিতকর।

পাকা বেল :—মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্য-

জনক, ত্রিদোষবর্দ্ধক। পক্ব অপেক্ষা অপক্ব কচি ফলই অধিক উপকারক।

বেদানা

ইহা মধুর-রস, তৃপ্তিকর, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর ও হৃদ্‌রোগনাশক।

তুঁত

ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং বায়ু ও পিত্তের পক্ষে হিতকর।

আখরোট

ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বলকারক, মল-ভেদক এবং বাত, পিত্ত ও রক্তদোষনিবারক।

আতা

ইহা মধুর-রস, শীতল, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, বাত, পিত্ত ও পিপাসা নাশক, রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাজনক এবং দাহ, বমন ও বায়ুরোগ নিবারক।

ইক্ষু

ইহা মধুর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রজনক এবং কৃমি, কফ, বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষে উপকারক।

খর্জ্জূর (পিণ্ড খর্জ্জূর)

ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকর, এবং দাহ, পিত্ত, শ্বাস, শ্রান্তি ও বিষদোষের উপশমকারক।

রাসায়নিক উপাদান

নাম	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়
আম কাঁচা	৯০ ৬৯	'৫৯	—	৩'৩৮	'২৭
আম পাকা	৭৫ ৫	'৫৯	'৭৬	১৭'৫৮	১'২
কাঁঠাল	৮০'৮২	১'১৬	'৪৩	১৮'৫৮	'৯৬
কাঁঠাল বীজ	৪৬'৪৬	১৩'১৪	১'৯৮	৩১'২০	২'২৭
এঁচোড়	৬৩ ৪১	৮'৫২	'৯৪	১৬'২৮	১'৯৫
কাঁঠালী কলা	৬৭ ৬৮	১'৩৫	'০৫	১৬ ১৩	'৭৭
কাঁচকলা	৭১'৪৭	১'৮০	'১৩	১৪'১৫	'৯৭
চাটিম কলা	৭৩ ৩২	১'৫০	—	১৭'০৮	'৭৩
কমলা লেবু	৮৮'২৫	০'৪৪	'২৭	৬'৬২	'৬
আনারস	৯০'২৬	'৪৬	'২০	৮'১৩	১'৬৮
পেঁপে	—	০'৭৫	—	০'৩৫	—
ডাবের জল	৯৫'৫২	১'৪১	'৪০	২'৩৯	'৬৩
ঝুনা নারিকেলের শাঁস	১৯'০৩	৫'৯৪	৫৩'১৪	৫'৪৬	১'৯
পেয়ারা (কাশীর)	৮০'০৪	—	'১২	১১'২২	'৬৬
ঐ (দেশী)	৯১'২৩	—	'২৬	৬'৪২	'৭২
আঙ্গুর	৭৪'৫২	'৫৯	—	২৪'৩৬	'৫৩
আপেল	৮৩'৫	'৩৯	—	৭'৭৩	'৩১
ন্যাশপাতি	৮০'০৩	'৩৬	—	৮'২৬	'৩১
পীচ	৮০'০১	'৬৫	—	৪'৪৮	'৬৯

নাম	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়
বেল	৭৮'৭৬	·৬৬	'৭২	১৬'১৪	১'১৬
বেদানা	—	·৯৩	—	৭'৬	—
ডালিম	—	'৬১	—	৬'৫	২'৩
তুঁত	৮৪'৭১	'৩৬	—	৯'১	'৬৬
ষ্ট্রবেরী	৭৭'১৬	১'০৭	—	৬·২৮	৮'১
র‍্যাসবেরী	৮৬'২১	'৫৩	—	৩'৯৩	'৪৯
গুজবেরী	৮৪·৭৪	·৪৭	—	৭'০৩	'৪২
আখরোট	৪'৬	১৫'৬	৬২'৬	৭'৪	২'০
ইক্ষু	—	১'৫	০'৫৭	২২·১৪	—

নাম	জল	শ্বেতসার ও শর্করা	প্রোটীন	তৈল	ভস্ম
খর্জ্জুর	১৩'৮	৭০ ৬	১'৯	১২'৫	১'২

ভাইটামিন

শরীর রক্ষার জন্য আজকাল ভাইটামিন (vitamin) বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে, খাদ্যের মধ্যে ছানা, মাখন, শর্করা, লবণ ও জল এই পাঁচ প্রকার পুষ্টিকর পদার্থের সমাবেশ থাকিলে শরীর পোষণ এবং দেহ ও স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ; কিন্তু এই ধারণা আজকাল পরিববর্ত্তন হইয়াছে। উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় পুষ্টিকর পদার্থের অবস্থান থাকিলেও খাদ্যের মধ্যে এমন এক জাতীয় পদার্থ থাকা বিশেষ আবশ্যক যাহা ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং রিকেট্, স্কার্ভি ও বেরিবেরি প্রভৃতি রোগ জন্মে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, শাকসব্জী এবং ফলমূলে স্বাভাবিক অবস্থায় ভাইটামিন বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কৃত্রিম প্রস্তুত খাদ্যে ভাইটা-মিনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এ পর্য্যন্ত "A", "B", "C", "D" ও "E" এই পাঁচ জাতীয় ভাইটামিনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার টাট্‌কা ও কৃত্রিম ফলমূল, শাকসব্জী, দুগ্ধ, মাখন, ছানা, ডিম, যব, গম, চাউল, ডাইল প্রভৃতি খাদ্যশস্য, কড্‌লিভার অয়েল এবং রৌদ্রালোকে ইহা বিদ্যমান থাকে।

বিভিন্ন প্রকার ফলমূলের মধ্যে "C" ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এতদ্ভিন্ন "A" ও "B" জাতীয় ভাই-

টামিন অল্প মাত্রায় থাকে। "C" ভাইটামিনের অভাবে স্কার্ভি (Scurvy) রোগ হয়। পূর্ব্বে সমুদ্রযাত্রী নাবিকদের মধ্যে এই রোগ প্রায় দেখা যাইত। টাট্‌কা তরিতরকারী ও ফল-মূলের অভাবেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে টাট্‌কা ফলমূল ব্যবহার করায় এই রোগের আক্রমণ হইতে আর দেখা যায় না। বিভিন্ন প্রকার লেবু—যথা পাতি, কাগজী লিমন, কমলা এবং টমেটো ও আপেলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে "C" ভাইটামিন বিদ্যমান থাকে। ইহা স্কার্ভি রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

নিম্নে বিভিন্ন জাতীয় ফলের মধ্যে কোন্‌টিতে কি ভাইটামিন বিদ্যমান আছে, তাহা দেখান হইল।

নাম	ভাইটামিন "A"	ভাইটামিন "B"	ভাইটামিন "C"	ভাইটামিন "D"	ভাইটামিন "E"
আপেল	+	+	+		
আখরোট	+	++			
আনারস			++		
আঙ্গুর		++	++		
আখ		+	+		
আম	+		++		
খেজুর (আরব)		+			
কলা	+	+	+		
কমলা লেবু	+	++	+++		
কিসমিস		+	+		
তেঁতুল		+	+		
নারিকেল		+			
ঝুনা নারিকেল	+	++			
বেদানা		+	+		

+ এই চিহ্ন দ্বারা ভাইটামিনের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, + + এইরূপ দুইটি চিহ্ন দ্বারা অধিক পরিমাণ এবং + + + এইরূপ তিনটি চিহ্ন থাকিলে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে বুঝিতে হইবে।